মহাযুদ্ধের পরে ইউরোপ

শ্রীসুশোভনচন্দ্র সরকার

অধ্যাপক প্রেসিডেন্সী কলেজ ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

133-

UNIVERSITY OF CALCUTTA
ADVANCEMENT OF LEARNING

GRANTHAGAR • VIGNAN
ESTD. 1907

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত

১৯৩৯

Printed in India.
Printed by P. C. Ray at Sri Gouranga Press,
5, Chintamani Das Lane, Calcutta.

সূচী

	বিষয়			পৃষ্ঠা
১	মহাযুদ্ধের অবসান	...	...	১
২	সন্ধিসভা ও সন্ধিপত্র	...	...	১০
৩	ভের্সায়ির ব্যবস্থা	...	...	১৮
৪	দমননীতির ব্যর্থতা	...	...	২৬
৫	শান্তির সম্ভাবনা	...	...	৩৪
৬	বহির্জগৎ	...	...	৪২
৭	বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ	...	...	৫১
৮	মার্ক্স এঙ্গেল্‌স্ ও লেনিন্	...	...	৬৩
৯	রুষবিপ্লব ও সোভিয়েট্-ইউনিয়ান্	...	...	৭৫
১০	মুসোলীনি ও ইল্ ফাশিস্‌মো	...	...	৮৭
১১	আর্থিক সঙ্কট	...	...	৯৬
১২	হ্বাইমার্-আমলের শেষ	...	...	১০৭
১৩	রাষ্ট্রিক অশান্তির পুনরাগমন	...	...	১১৮
১৪	ইটালির অভিযান	...	...	১২৮
১৫	হিট্‌লার্ ও নাৎসি-প্রকোপ	...	...	১৪২
১৬	ট্রট্‌স্কি ও স্টালিন্	...	...	১৫৫
১৭	সমরোন্মুখ ইউরোপ	...	...	১৬৯
	পরিশিষ্ট (১)	...	...	/০
	পরিশিষ্ট (২)	...	...	॥০
	পরিশিষ্ট (৩)	...	...	৸/০

মানচিত্র

করল—যদিও নূতন বন্ধুত্ব'টির সঙ্গে ইটালির কখনও আন্তরিক সহযোগ হ'ল না। বিস্‌মার্কের আর এক লক্ষ্য ছিল জার্মানি ও রাশিয়ার মধ্যে সদ্ভাবের সাহায্যে ফ্রান্স্‌কে একক অবস্থায় পঙ্গু করে' রাখা। তাঁর পরবর্ত্তীরা এ-নীতি বজায় রাখতে পারেন নি—সম্ভবতঃ জার্মানির পক্ষে একই কালে অস্ট্রিয়া ও রাশিয়া উভয়ের সঙ্গে সখ্য অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। এই সুযোগে, ১৮৯১ থেকে ১৮৯৫ এর মধ্যে, ফ্রান্স্‌ ও রাশিয়া মিত্রভাবে পরস্পরের সাহায্য অঙ্গীকার করল। একদিকে জার্মানি ও অস্ট্রিয়া, অন্যদিকে ফ্রান্স্‌ ও রাশিয়া, ইউরোপ্‌কে এইভাবে দ্বিধাবিভক্ত করলে, ইটালি যেমন প্রথমদলে যোগ দিয়েছিল, ইংল্যাণ্ড্‌কেও তেমনি খানিকটা ভারসাম্যের খাতিরে অন্য দিকে ঝুঁকতে হ'ল। ফ্রান্স্‌ ও রাশিয়ার সঙ্গে ব্রিটিশ-জাতির অনেক ব্যাপারে প্রতিদ্বন্দ্বিতা থাকলেও, বৃহত্তর বিপদের সামনে সে-বৈরীতা হ্রাস পাওয়াই স্বাভাবিক। ইংল্যাণ্ডের দিক থেকে তখন প্রধান বিপদ ছিল জার্মানির শক্তিবৃদ্ধি। অতি দ্রুতগতিতে জার্মান্ পণ্যোৎপাদন ও বাণিজ্য ইংরাজদের ছাড়িয়ে যায়। জার্মান্‌দের বিরাট ঔপনিবেশিক-সাম্রাজ্য গঠনের সংকল্পে ইংল্যাণ্ডেরই ক্ষতির সম্ভাবনা ছিল। তুরস্কের মধ্য দিয়ে বোগ্‌দাদ্‌-রেলপথ নির্ম্মাণের জার্মান্-পরিকল্পনা ইংরাজদের আতঙ্কের অন্যতম কারণ। তারপর একশত বৎসরের অধিক ব্রিটানিয়া নির্ব্বিবাদে সমুদ্রশাসন করে' আসবার পর যখন জার্মান্ নৌবহর ইংরাজদের প্রায় সমকক্ষ হ'য়ে উঠ্‌ল, তখন্ ইংল্যাণ্ডের অপরপক্ষে যোগদান ছাড়া উপায় রইল না। ১৯০৪এ ফ্রান্স্‌ এবং ১৯০৭এ রাশিয়াকে ইংল্যাণ্ড্‌ তাই বন্ধুভাবে গ্রহণ করে।

কিন্তু এরূপ দল-গঠনের অতি স্বাভাবিক ফল মহাযুদ্ধের আগমন। আজকের দিনে এর অনুরূপ দল ইউরোপে আবার গড়ে’ ওঠাতে শান্তির সম্ভাবনা ক্ষীণতর হচ্ছে। দলগঠনের সঙ্গে সঙ্গে এল অস্ত্রবৃদ্ধি। শান্তিবাদীদের শত চেষ্টা সত্ত্বেও সমর-সজ্জার আয়োজন চল্‌ল পূরোমাত্রায়। মিত্রদের মধ্যে যুদ্ধ-ব্যবস্থার গোপন পরামর্শ চল্‌তে লাগ্‌ল। ফরাসী ও ইংরাজ রণনায়কদের তখনকার গুপ্ত আলোচনা এখন প্রকাশ পেয়েছে। জার্মান্‌দের যুদ্ধায়োজন সম্পর্কে শ্লিফেন্-প্ল্যানের একটি গুপ্ত ব্যবস্থা ছিল—১৮৩৯-এর অঙ্গীকার ভঙ্গ করে’ চিরনিরপেক্ষ বেল্‌জিয়াম্‌কে অতর্কিতে আক্রমণ ও তার মধ্য দিয়ে ফ্রান্সে দ্রুত সৈন্যচালনা। অস্ত্রসজ্জার প্রস্তুতির সঙ্গে সঙ্গে সংবাদপত্রাদির সাহায্যে প্রতি দেশে শত্রুজাতির বিরুদ্ধে এখনকার মতনই জনমত উত্তেজিত করবার প্রচেষ্টা চল্‌ল। জার্মান্ বিশেষজ্ঞ রণশাস্ত্রবিদ্ ফন্ ক্লস্‌উইট্‌স্-এর মতে বিদেশীদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের মনে ঈর্ষা ও সন্দেহের উদ্রেক যুদ্ধজয়ের অন্যতম উপায়।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এই ছিল ইউরোপের অবস্থা। সামান্য যে-কোন কারণে সমরানল প্রজ্বলিত হবার সম্ভাবনা চিন্তাশীল লোককে আজকের মতন তখনও পীড়া দিত। তখনকার দিনে সদাসর্ব্বদা যুদ্ধারম্ভের আতঙ্ক প্রবীণ সংবাদপত্র-পাঠকের এখনও মনে থাকতে পারে। ১৯০৫, ১৯০৮ ও ১৯১১ সালে মরক্কো দেশে ফরাসী-জার্মান্ সঙ্ঘর্ষের ফলে যুদ্ধ প্রায় বেধে উঠেছিল। অবশেষে যে-স্ফুলিঙ্গ থেকে দাবানল এল, মহাযুদ্ধের কারণ নির্ণয়ে সে-ঘটনা আকস্মিক উপলক্ষ্য মাত্র। ১৯১৪র ২৮শে জুন্, স্বদেশে সেরাজেভো

নগরে, অস্ট্রিয়ার যুবরাজ দক্ষিণস্লাভ্‌জাতীয় আততায়ীর হাতে প্রাণ হারান। সার্বিয়ার উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারীরা এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত থাকায়, অস্ট্রিয়ার কর্ত্তৃপক্ষেরা এই সুযোগে সার্বিয়ার উচ্ছেদসাধনে কৃতসংকল্প হলেন। জার্মান্ কাইজারের উপর নির্ভর করে' তাঁরা ২৩শে জুলাই সার্বিয়ার কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে এমন কয়েকটি দাবী জানান যেগুলিতে সম্মত হওয়া স্বাধীন রাষ্ট্রমাত্রের পক্ষে অত্যন্ত অপমানের কথা। ২৮শে জুলাই অস্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার মধ্যে যুদ্ধ বাধে, তারপরদিনই হঠাৎ রাশিয়ায় সৈন্য-সমাবেশের আদেশ দেওয়া হ'ল। শেষমুহূর্ত্তে যুদ্ধ থামাবার চেষ্টা সত্ত্বেও সঙ্কটের প্রথমাবস্থায় অস্ট্রিয়াকে এতদূর অগ্রসর হ'তে দেবার দায়িত্ব থেকে ইতিহাসের বিচারে জার্মানি অবশ্য মুক্তি পাবে না। রুষরাষ্ট্রের সহসা সৈন্য-সম্মেলনই কিন্তু শান্তির শেষ আশাকে ব্যর্থ করল। এরপর জার্মানিকে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করতে হয়, রাশিয়ার সাহায্যের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ ফ্রান্স্ যুদ্ধে নামে, ফ্রান্স্-আক্রমণ উদ্দেশ্যে জার্মানেরা বেল্‌জিয়ামে উপস্থিত হওয়া মাত্র ইংল্যাণ্ড্ও তখন যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। এতদিন ইংরাজ কর্ত্তৃপক্ষেরা লোকমতের ভয়ে ফ্রান্স্‌কে সাহায্য করবার সুনির্দ্দিষ্ট অঙ্গীকার এড়িয়ে এসেছিলেন; কিন্তু ক্ষুদ্র বেল্‌জিয়াম্ আক্রান্ত হওয়াতে ব্রিটিশ্-জনগণকে এখন সহজেই জার্মানির বিরুদ্ধে উত্তেজিত করা গেল। ৪ঠা অগাস্টের মধ্যে ইউরোপে এইভাবে পূর্ব্বতন যুগের অবসান হয়।

জার্মানির আশা ছিল, ১৮৭০-এর মতন এবারও কয়েক সপ্তাহেই ফ্রান্স্ পরাস্ত হবে। বেল্‌জিয়ামে জার্মান্

অগ্রগতির পথে অপ্রত্যাশিত বাধা, ফরাসী-সৈন্যের দৃঢ়তা ও যুদ্ধে কৃতিত্ব এবং ইংরাজ রণমন্ত্রী হল্‌ডেনের দূরদর্শিতা-প্রসূত পূর্ব্ব-ব্যবস্থার ফলে ফ্রান্স্‌কে সময়োচিত ব্রিটিশ্‌-সাহায্য পাঠানো জার্মান্‌-প্রত্যাশা ব্যর্থ করল। মার্ণ্‌-সংগ্রামের পর মহাসমর উভয়পক্ষের সহ্যশক্তি ও ধৈর্য্যপরীক্ষায় পর্য্যবসিত হয়। অষ্ট্রিয়া, বুল্‌গেরিয়া ও তুরষ্ক জার্মানির দিকে থাকলেও অধিকাংশ রাজ্য অপরপক্ষভুক্ত হ'ল। ১৯১৫ সালে গুপ্ত লণ্ডন্‌-চুক্তির ফলে টিরল্‌-অঞ্চল, আড্রিয়াটিক্‌-উপকূল এবং লেভাণ্টের দ্বীপমালায় কর্ত্তৃত্বের প্রতিশ্রুতি লাভ করে', ইটালি পূর্ব্বমিত্রদের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করল। জার্মানির শত্রুদের এসময় মিত্রশক্তিবর্গ আখ্যা দেওয়া হয়। ইংরাজ নৌবল জার্মান্‌ রণতরীগুলিকে স্বদেশের কূলে আটকে রাখতে সমর্থ হবার ফলে, বহির্জগতের সঙ্গে জার্মানির সম্পর্ক অনেকখানি লোপ পেল। সাগরপারের বহুরাজ্য তখন একে একে মিত্রশক্তিদের দলবৃদ্ধি করে। ইউরোপের বাইরে মহাশক্তিদের মধ্যে জাপান ১৯০২ থেকে ইংল্যাণ্ডের মিত্র ছিল; যুদ্ধারম্ভ মাত্র চীনে ও প্রশান্ত-মহাসাগরে জার্মান্‌ ক্ষমতার উচ্ছেদ-সাধনে তাই জাপানের সহযোগ পাওয়া যায়। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র প্রথমে নিরপেক্ষ-নীতিতে অটল থাকবার চেষ্টা করে; কিন্তু অবরুদ্ধ জার্মানি যখন সাব্‌মেরিন্‌ দিয়ে শত্রুবন্দরাভিমুখী সকল জাহাজ নির্ব্বিচারে ডোবাতে আরম্ভ করল, তখন বাণিজ্যরক্ষার খাতিরে প্রতিবাদ হিসাবে প্রেসিডেণ্ট্‌ উইল্‌সন্‌ প্রথমে জার্মানির সঙ্গে রাষ্ট্রিক যোগ ছিন্ন করলেন। তারপর ১৯১৭-র মার্চ্চে জারের পতনে রাশিয়া দুর্ব্বল হ'য়ে পড়াতে মিত্রশক্তিদের অবশ্য বিপদ বাড়ে। কিন্তু তখনই (এপ্রিল্‌,

১৯১৭) আমেরিকা তাদের আকস্মিক পরাজয় ঠেকাবার জন্য জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করল। ফ্রান্সে মূল সংগ্রামে এতদিন কোন মীমাংসা হয় নি। এখন আমেরিকার অফুরন্ত সৈন্যপ্রবাহের সামনে জার্মান্‌দের জয়ের আশা লোপ পেল। বল্‌শেভিক্‌-বিপ্লবের পর রাশিয়া জার্মানির সঙ্গে ব্রেস্ট্‌-লিটভ্‌স্কে পৃথক সন্ধি করে বটে (মার্চ্চ্‌, ১৯১৮), কিন্তু ততদিনে জার্মানিও সহ্যশক্তির সীমা পার হ'য়ে গিয়েছিল। সেপ্টেম্বরে বুল্‌গেরিয়া ও অক্টোবরে তুরস্ক আত্মসমর্পণ করে; সেই সময়েই অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্য খণ্ড খণ্ড রাজ্যে চূর্ণ হ'য়ে গেল। পশ্চিম রণক্ষেত্রে জার্মান্‌ সৈন্যের সমূহ পরাজয়ের পর আভ্যন্তরিক অসন্তোষ সহসা কাইজারের শাসনযন্ত্রকে বিকল করে' ফেলে। অক্টোবরের শেষে কিয়েল্‌ বন্দরে জার্মান্‌ নাবিকেরা বিদ্রোহের সূচনা করল। জার্মানিতে সাধারণতন্ত্র ঘোষণা এবং সম্রাটের পলায়নের সঙ্গে সঙ্গে তারপর মহাযুদ্ধের অবসান হয়। জার্মানির নূতন কর্ত্তৃপক্ষেরা যুদ্ধবিরতির আবেদন করলে, সে-প্রস্তাব ১১ই নভেম্বর্‌ গৃহীত হ'ল। চার বৎসর সমান সংগ্রামের পর একপক্ষের এইভাবে সম্পূর্ণ পরাজয় হয়।

২

সন্ধিসভা ও সন্ধিপত্র

প্রতিদেশেই জনসাধারণ প্রথমে মহাযুদ্ধকে সানন্দে বরণ করেছিল; শত্রুস্থানীয়দের ঘৃণা করা এবং সংগ্রামের প্রারম্ভে রণোন্মাদনা বর্ত্তমানে একটা সাধারণ সত্যে দাঁড়িয়েছে। উভয় দলই স্বতঃসিদ্ধ ভাবে মেনে নিল যে দোষ সম্পূর্ণরূপে অন্যপক্ষের, ন্যায়ধর্ম্ম নিজেদেরই দিকে এবং স্বদেশের যুদ্ধে যোগ দেবার কারণ উচ্চ আদর্শ, ক্ষুদ্র স্বার্থসন্ধান নয়। যে-সোশ্যাল্-ডেমক্রাটেরা তাদের আন্তর্জ্জাতিক-প্রতিষ্ঠানের প্রতি বৈঠকে ঘোষণা করত যে তারা কখনই যুদ্ধ করবে না, তারা পর্য্যন্ত এখন নিজ নিজ রাষ্ট্রের পূর্ণ সমর্থনে পরাঙ্মুখ হ'ল না। স্বল্পসংখ্যক যুদ্ধবিরোধীদের প্রভাব তখন ছিল অতি সামান্য। প্রতি দেশে শাসকেরা সযত্নে প্রচার করলেন যে সমরকালীন বর্ব্বরতা এবং সকল অনাচার কেবলমাত্র শত্রুদের কুকীর্ত্তি। মহাযুদ্ধের সময় মিথ্যা কথার প্রচার সম্বন্ধে তাই পন্‌সন্‌বি পরে একটি বিখ্যাত পুস্তিকা লেখেন।

মিত্রশক্তিপুঞ্জের প্রোপাগাণ্ডা-ই পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে' জার্মান্ প্রচারকার্য্যের চেয়ে প্রবলতর প্রতিপন্ন হ'ল। তার অনেক কথাই আজ শুধু হাস্যোদ্রেক করবে। দুর্ব্বল জাতিদের রক্ষা নাকি মিত্রশক্তিবর্গের অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, অথচ বেল্‌জিয়াম্ ও সার্বিয়া আক্রান্ত হবার অনেক আগেই ইংল্যাণ্ড্ ফ্রান্স্ ও রাশিয়ার সঙ্গে জড়িয়ে পড়ে এবং এদের

দিক থেকে ক্ষুদ্র বুল্‌গেরিয়া বা তুরস্ককে ধ্বংস করবার চেষ্টারও ত্রুটি হয়নি। তাদের আর একটি তথাকথিত লক্ষ্য সর্ব্বজাতির আত্মকর্ত্তৃত্ব-স্থাপন—কিন্তু ঘোর সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে এ-দাবী অসার শ্লাঘা মাত্র। গণতন্ত্র-প্রসারের আদর্শ মিথ্যা প্রতিপন্ন হ'ল স্বেচ্ছাচারী জারের সঙ্গে মিত্রশক্তিদের সদ্ভাবে। অস্ত্রসজ্জার উচ্ছেদ কিম্বা পৃথিবী থেকে সমর-ব্যবস্থার উৎপাটন যে প্রকৃত লক্ষ্য ছিল না, তা' প্রমাণ করল সমরোত্তর ঘটনামালা। আর আন্তর্জ্জাতিক বিধিব্যবস্থা রক্ষার জন্য যে অস্ত্রধারণ করা হয় নি সে-কথা বলা বাহুল্য, কেন না যুদ্ধকালে মিত্রশক্তিরাও সুবিধামত সকল বিধি লঙ্ঘন করেছিল।

প্রথম উচ্ছ্বাস কাটবার পর ও দ্রুত-বিজয়ের সম্ভাবনা ম্লান হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের আপোষে নিষ্পত্তির কথা ওঠা স্বাভাবিক। বিভিন্ন দেশে সাবধানী নেতারা তাই তখন সন্ধির কথা তুলেছিলেন। স্টক্‌হল্‌মে আন্তর্জ্জাতিক সোশ্যালিস্ট্-বৈঠকে শান্তির প্রস্তাব হয়। রাষ্ট্রপতি উইল্‌সন্ আমেরিকার অভিলাষ ব্যক্ত করলেন (জানুয়ারি, ১৯১৭) যে কোন পক্ষই বিজয়ীর অধিকার না চেয়ে সন্ধি হ'লেই সকলের মঙ্গল। ক্যাথলিক্ ধর্ম্মগুরু পোপ্ (অগাস্ট্, ১৯১৭) সন্ধির ভিত্তি-স্বরূপ কয়েকটি প্রস্তাব করেন। কিন্তু পূর্ণজয় লাভের প্রবলতর স্পৃহা ইংল্যাণ্ডে লয়েড্-জর্জ্, ফ্রান্সে ক্লেমাসো প্রভৃতি শক্তিশালী নেতাদের মধ্যে মূর্ত্তি নিল। নিরপেক্ষদের শান্তিস্থাপন চেষ্টাও তাই সফল হ'ল না। আমেরিকা যুদ্ধে নামার ফলেই জার্মানির সম্পূর্ণ পরাজয়ের সম্ভাবনা প্রথম প্রবল হ'ল। এই পরিবর্ত্তিত অবস্থায় ব্রেস্ট্-লিটভ্‌স্ক্-এর

বৈঠকে বল্‌শেভিক্‌দের সর্ব্বব্যাপী শান্তির প্রস্তাবে (ডিসেম্বর্‌, ১৯১৭) তাই কোন সাড়া পাওয়া গেল না। তবুও এ-উদ্যম উল্লেখযোগ্য। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল নির্ব্বিচারে সকল জাতির আত্মকর্ত্তৃত্বের অধিকার স্বীকার এবং রাজ্যজয় বা ক্ষতিপূরণের সর্ব্ববিধ দাবীর সম্পূর্ণ বর্জ্জন।

মিত্রশক্তিদের নেতৃস্থানীয় প্রেসিডেণ্ট্‌ উইল্‌সন্‌ এই সুযোগে (জানুয়ারি, ১৯১৮) ন্যায়সঙ্গত সন্ধির নির্দ্দেশক হিসাবে চোদ্দটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। মূলসূত্র হিসাবে এদের ছয়ভাগে সাজানো যায়। প্রথমতঃ, বেল্‌জিয়াম্‌, সার্বিয়া, মন্টিনিগ্রো, রোমানিয়া প্রভৃতি আক্রান্ত ও বিধ্বস্ত রাজ্যগুলিকে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনা। সেই সঙ্গে আল্‌সাস্‌-লোরেনের উপর ফ্রান্সের দাবীও স্বীকৃত হ'ল। দ্বিতীয় মূলসূত্র, আত্মকর্ত্তৃত্বের অধিকার স্বীকার। আঠারো শতকে ধ্বংসপ্রাপ্ত পোল্যাণ্ড্‌-এর পুনরুজ্জীবন এর অন্তর্গত। কিন্তু উইল্‌সন্‌ এ-প্রসঙ্গে অস্ট্রিয়া ও তুরস্কের পদানত প্রজাদের মুক্তির উল্লেখ করলেও মিত্রশক্তিদের কাছ থেকে অনুরূপ দাবী সম্বন্ধে নীরব রইলেন। তৃতীয়তঃ, উপনিবেশগুলিতে আত্মকর্ত্তৃত্ব স্বীকৃত না হ'লেও নিরপেক্ষভাবে তাদের ভাগ্য-নির্দ্ধারণ এবং অধিবাসীদের স্বার্থরক্ষার প্রতিশ্রুতি ঘোষণা-পত্রে স্থান পেল। চতুর্থতঃ, উইল্‌সন্‌ ভবিষ্যৎ শান্তিরক্ষার জন্য একটি বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ গঠনের প্রস্তাব করলেন। তাঁর আরও দু'টি নির্দ্দেশ ছিল। একটিকে নিরস্ত্রীকরণ, অর্থাৎ অস্ত্রসজ্জার সম্পূর্ণ পরিত্যাগ আখ্যা দেওয়া হয়। অপরটি বহুকাল যাবৎ আমেরিকার আদর্শ হিসাবে গণ্য হয়েছে— সমুদ্রপথে সর্ব্বদেশীয় বণিকদের যুদ্ধের সময় পর্য্যন্ত অবাধ-

বাণিজ্যের স্বাধীনতা। ইংল্যাণ্ড্ এতে বরাবর আপত্তি জানিয়েছে—কারণ এ-ব্যবস্থায় নৌবলের সাহায্যে শত্রু-অবরোধ অনেকখানি ব্যাহত হবে। শেষ প্রস্তাবটি তাই শেষ পর্য্যন্ত বর্জ্জিত হ'ল। তার বদলে ইংল্যাণ্ড্ ও ফ্রান্স্ অন্য এক দাবী উপস্থিত করে—মিত্রপক্ষীয় নিরপরাধ প্রজাসাধারণের উপর অত্যাচারের জন্য জার্মানিকে ক্ষতিপূরণ করতে হবে। যুদ্ধবিরতির অব্যবহিত পূর্ব্বে এইভাবে উইল্‌সনের চোদ্দ প্রস্তাব আংশিক পরিবর্ত্তিত হয়েছিল। কিন্তু কাগজে কলমে শেষ পর্য্যন্ত উইল্‌সনের সন্ধির আদর্শ রইল ন্যায়ধর্ম্মের অনুযায়ী বিধিব্যবস্থা এবং পরাজিতের উপর অত্যাচারের লোভ সম্বরণ।

দ্রুত-মীমাংসার আশা ব্যর্থ হওয়া মাত্র জার্মানির পূর্ণবিজয়ের সম্ভাবনা ক্ষীণ হ'য়ে পড়ে। সমুদ্রপথে দীর্ঘ অবরোধের ফলে এল জার্মানির নিস্তেজতা, যদিও কৃতী বৈজ্ঞানিকদের উদ্ভাবনী-ক্ষমতায় অনেক অভাব মোচন হয়েছিল। তারপর আমেরিকার অজস্র ধনজনবল জার্মানির পরাজয় অবশ্যম্ভাবী করে' তোলে। নানা জাতির বিদ্রোহে অষ্ট্রিয়ার এসময় ধ্বংসপ্রাপ্তি জার্মানির আশু পতনের অগ্রদূত হ'য়েই দেখা দিল। শুধু আভ্যন্তরিক বিপ্লবের জন্য জার্মানি পরাস্ত হয়, যুদ্ধান্তের এই জার্মান্ কাহিনী সর্ব্বৈব মিথ্যা। মহাসমরে জার্মানির পরাজয় অবিসম্বাদিত সত্য রূপে স্বীকৃত হওয়াই উচিত। জার্মানির নূতন শাসকেরা অবশ্য উইল্‌সনের সংশোধিত প্রস্তাবগুলি সন্ধির ভিত্তি হবে এই আশ্বাসে আত্মসমর্পণ করলেন। কিন্তু বস্তুতঃ সংগ্রাম চালাবার সামর্থ্য তাঁদের নিঃশেষ হ'য়ে গিয়েছিল। তাই যুদ্ধক্ষান্তির নিদর্শন

স্বরূপ তাঁরা মিত্রপক্ষের সকল সাময়িক দাবীই মেনে নিলেন। ফলে জার্মানির এমন উপায় পর্য্যন্ত রইল না যার সাহায্যে, সন্ধির খসড়া অন্যায় মনে হ'লে, যুদ্ধ আবার আরম্ভ করা যেত। এই দুরবস্থার সুযোগ নিয়ে বিজয়ীরা এমন এক সন্ধিপত্র রচনা করল যার প্রতি ব্যবস্থা উইল্‌সনী-প্রস্তাব থেকে আক্ষরিক চ্যুতি না হ'লেও তার মূলনীতির সম্পূর্ণ বিরোধী। অধ্যাপক কেন্‌স্‌ এক প্রসিদ্ধ গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে ভের্সায়ির সন্ধিপত্র বিজেতাদের অঙ্গীকার-ভঙ্গের নিঃসন্দেহ নিদর্শন।

প্যারিসে সন্ধিসভার আবাহনেই এর আভাষ পাওয়া গেল। পরাজিতেরা সে-বৈঠকে স্থান পর্য্যন্ত পায় নি। প্রকাশ্য সভায় সন্ধির আলোচনার কথা উইল্‌সনের ঘোষণাপত্রে ছিল বটে, কিন্তু গোলযোগের ভয়ে চিরাচরিত গুপ্তমন্ত্রণাই শেষ পর্য্যন্ত তার স্থান নিল। স্বপক্ষের ক্ষুদ্র রাষ্ট্রগুলিকে পর্য্যন্ত অবহেলা করে' সকল সিদ্ধান্তের ভার নিলেন বিজয়ী চার মহাশক্তির প্রতিনিধিরা। ইটালি মাঝে সভা ত্যাগ করাতে, প্রকৃতপক্ষে উইল্‌সন্‌, লয়েড্‌-জর্জ্‌ ও ক্লেমাসো এবং তাঁদের মন্ত্রণাদাতারাই সন্ধির খসড়া প্রস্তুত করেছিলেন।

ন্যায়ের আদর্শ নিয়ে উইল্‌সন্‌ স্বয়ং প্যারিসে উপস্থিত হয়েছিলেন; তাঁর পিছনে ছিল তাঁর দেশের প্রচুর শক্তি ও প্রবল প্রতাপ। কিন্তু শান্তিসভায় ইংরাজ বা ফরাসী নেতারাও স্বদেশের সুবিধাসিদ্ধির জন্য বদ্ধপরিকর ছিলেন। উইল্‌সনী-নীতির মৌখিক সমর্থনের আড়ালে তাই চলল কূটবুদ্ধির খেলা, সে-খেলায় প্রবীণ রাজনীতিজ্ঞদের হাতে

উইল্‌সন্ শিশু প্রতিপন্ন হলেন। তাঁর অক্ষমতার শ্রেষ্ঠ প্রমাণএই যে শেষ পর্য্যন্ত তাঁর বিশ্বাস ছিল যে ভের্সায়ির ব্যবস্থা আদর্শ থেকে চ্যুত হয় নি।

ইংরাজ বা ফরাসীদের তখনকার মনের অবস্থা বোঝা বেশী শক্ত নয়। আমেরিকার পক্ষে ন্যায়ের দোহাই দেওয়া সহজ ছিল ; চার বৎসরের ধ্বংসলীলার উপদ্রব তাকে বইতে হয় নি, ইউরোপে বাণিজ্য ব্যতীত তার অন্য স্বার্থও ছিল না। কিন্তু ফ্রান্স্ তার উত্তরপূর্ব্ব-অঞ্চলের সর্ব্বনাশ ভুল্‌তে পারে নি। লোক ও বাণিজ্যক্ষয়ের জন্য ইংল্যাণ্ডে তখন জার্মান্-বিদ্বেষ এত বেশী যে যুদ্ধক্ষান্তির পর সাধারণ নির্ব্বাচনের সময় সর্ব্বত্র রব উঠল যে কাইজার্‌কে যুদ্ধ ঘটাবার অপরাধে দণ্ড দিতে হবে ; আর এই প্রতিশ্রুতির সাহায্যেই চতুর লয়েড্-জর্জ্ পার্লামেণ্ট্ নিজের অনুচর দিয়ে ভরিয়ে ফেলতে পারলেন। যুদ্ধচালনার সময় আবার দলবৃদ্ধির জন্য জাপান ও ইটালিকে অনেক গোপন অঙ্গীকার করা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এ-সকলের সঙ্গে উইল্‌সনী আদর্শের খাপ খাওয়ানো দুরূহ হ'ল। ঘটনাচক্রে জার্মানির জয় হ'লে যে মিত্রশক্তিদের অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করতে হ'ত তারও সন্দেহ নেই। ব্রেস্ট্-লিটভ্‌স্কের সন্ধিতে অসহায় রাশিয়ার প্রতি জার্মানির ব্যবহার তার প্রমাণ। তাই শত্রু যখন পদানত, তখন ন্যায়ের অনুসরণ করবার প্রবৃত্তি বিজয়ীদের মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত দেখা গেল না। মহাযুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ যে সাম্রাজ্যবাদের স্বাভাবিক সংঘর্ষ, একদিকে ব্রেস্ট্-লিটভ্‌স্ক্, অন্যদিকে প্যারিসের সন্ধিগুলি তার প্রকৃষ্ট পরিচয়।

শান্তিবৈঠকে সবচেয়ে শক্তিশালী পুরুষ ক্লেমাসোর কয়েকটি বদ্ধ ধারণা ছিল। ফ্রান্সের তুলনায় জার্মানির অন্তর্নিহিত শক্তির শ্রেষ্ঠতায় ফ্রান্সের ব্যাঘ্রাখ্য বৃদ্ধ নেতার ছিল অশেষ উদ্বেগ। তিনি কোনক্রমেই জার্মান্‌দের বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিলেন না। রাষ্ট্রসঙ্ঘের উপর নির্ভর করাও তিনি মূর্খতা বিবেচনা করলেন। তাই তাঁর লক্ষ্য দাঁড়াল সন্ধিপত্রের সাহায্যেই জার্মান্‌-কণ্টকের মূলোৎপাটন। রোম্‌ যেমন বৈরী কার্থেজ্‌কে আমূলে বিনষ্ট করেছিল, জার্মানির প্রতি যথাসাধ্য তদনুরূপ ব্যবহারই ক্লেমাসোর কাছে ফ্রান্সের কর্ত্তব্য হ'য়ে দাঁড়াল।

কিন্তু এ-নীতির সোজাসুজি অনুসরণ তখন অসম্ভব। ফরাসী-প্রতিহিংসা চরিতার্থ করার প্রচেষ্টায় আমেরিকার উৎসাহ না থাকবারই কথা। ফরাসীদের তখন লক্ষ্য হ'ল লয়েড্‌-জর্জের কূটবুদ্ধির সাহায্যে বড় কথার আড়ালে কার্য্যোদ্ধারের ব্যবস্থা। উইল্‌সনের মূলসূত্র তখন সর্ব্ব-স্বীকৃত, কিন্তু তার প্রয়োগের সময় দেখা গেল যে কোন প্রসঙ্গেই উইল্‌সনের সুচিন্তিত সুনির্দ্দিষ্ট প্রস্তাব নেই। ইউরোপ্‌ সম্বন্ধে তাঁর জ্ঞান ছিল অত্যল্প, বিশেষতঃ আর্থিক ব্যবস্থার ফলাফল হৃদয়ঙ্গম করবার সামর্থ্য তাঁর একেবারেই ছিল না। শান্তিসভায় অন্যদের তুলনায় উইল্‌সনের বুদ্ধির প্রখরতার অভাব দেখা গেল; ভের্সায়ি-ব্যবস্থার অন্যায়ের গুরুত্ব তিনি ঠিক উপলব্ধি করেছিলেন কিনা সন্দেহ; কিম্বা তিনি হয়ত ভেবেছিলেন যে যখন রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছে, তখন পরিণামে তার মধ্য দিয়েই সন্ধির সকল ত্রুটি সংশোধিত হবে। কিন্তু ক্লেমাসো ও লয়েড্‌-

জর্জের সাফল্যের প্রকৃত কারণ উইল্‌সনের ব্যক্তিগত দুর্ব্বলতা নয়। ইউরোপে বিশেষ স্বার্থের অভাবে সন্ধিপত্রের অনেক ধারা সম্বন্ধে আমেরিকার অটল ঔদাসীন্যই এর মূল। অন্য অনেক ক্ষেত্রে অবশ্য আমেরিকার এ-নিরাসক্তি মোটেই চোখে পড়ে না। ব্যক্তিত্বের উপর স্বার্থসন্ধানের শক্তি সহজেই জয়ী হ'য়ে উইল্‌সনের মূলনীতির অনুসরণকে তাই পণ্ডশ্রমে পরিণত করল।

প্যারিসের বৈঠকে পরাজিত শত্রুর প্রতিনিধিদের স্থান হয় নি। সন্ধিপত্রের খসড়া প্রস্তুত হ'লে তাদের ডাক পড়ল ভাগ্যলিপি জানবার জন্য। সমস্ত জার্মানি তখন বিজয়ীদের দাবী শুনে স্তম্ভিত হ'য়ে গেল। তারপর এল জার্মান্‌দের তীব্র প্রতিবাদ—আর সন্ধিপত্র যে উইল্‌সনের অঙ্গীকারের বিরোধী তার স্বপক্ষে অকাট্য যুক্তি। মিত্রশক্তিরা কিন্তু এ-প্রতিবাদে কিছু বিচলিত হ'ল না। আবার যুদ্ধ আরম্ভ করবার অথবা কোনপ্রকার বাধা দেবার শক্তির অভাবেই তখন জার্মানি অগত্যা সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করল (জুন, ১৯১৯)।

৩

ভের্সায়ির ব্যবস্থা

যুদ্ধবিরতির সাত মাস পরে জার্মানির সঙ্গে ভের্সায়ির সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হ'ল। পরাজিত অন্য রাষ্ট্রগুলির সহিত শান্তির ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করতে আরও দেরী হয়। চূর্ণীকৃত অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের উত্তরাধিকারী-হিসাবে অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গারি নামক নবজাত দুই রেপাব্লিকের সঙ্গে যথাক্রমে সাঁ-জের্মা (সেপ্টেম্বর্, ১৯১৯) এবং ত্রিয়ানন্ (জুন্, ১৯২০) সন্ধির ব্যবস্থা হ'ল। নিউয়ির সন্ধিপত্র স্বাক্ষর করতে হয় বুল্‌গেরিয়াকে (নভেম্বর্, ১৯১৯)। তুরস্ক সেভ্‌রের সন্ধি সই করল বটে (অগাস্ট্, ১৯২০) কিন্তু কামাল্ পাশার কল্যাণে এর বহু ব্যবস্থা অচল হ'য়ে পড়াতে শেষ পর্য্যন্ত লসানের সন্ধিতে (জুলাই, ১৯২৩) তুরস্কের সঙ্গে সংশোধিত বন্দোবস্ত করতে হয়। এদিকে উইল্‌সনের বিরুদ্ধে তুমুল আন্দোলনের ফলে, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ভের্সায়ির সন্ধি বর্জ্জন করে' জার্মানি প্রভৃতির সহিত পৃথক শান্তিস্থাপন করে (১৯২১)। অন্যত্র রাশিয়ার প্রত্যন্তে নবগঠিত রাজ্যগুলির সঙ্গে মিত্রশক্তিবর্গের স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করতে হয়েছিল।

যুদ্ধাবসানের সকল সন্ধির সংক্ষিপ্ত সংজ্ঞা হিসাবে ভের্সায়ির ব্যবস্থা কথাটির ব্যবহার চলে। ইউরোপের উত্তর-সামরিক ইতিহাস এর থেকেই আরম্ভ এবং সে-কাহিনীর অন্যতম প্রধান বিষয় এ-ব্যবস্থার সমর্থন কিম্বা

সংশোধন প্রচেষ্টা। সুতরাং এর বিস্তারিত আলোচনার প্রয়োজন আছে।

ভের্সায়ি এবং তার আনুষঙ্গিক প্রধান সন্ধিপত্রগুলিতে প্রথমেই রাষ্ট্রসঙ্ঘ-স্থাপনের নির্দ্দেশ ছিল। অস্ত্রসজ্জার হ্রাসসাধন, যুদ্ধভয়ের নিরাকরণ এবং সকল দেশের মধ্যে সদ্ভাববৃদ্ধির জন্য এই প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টি। কিন্তু প্রথম থেকেই তাকে বিজেতা-সঙ্ঘের রূপ দেওয়া হ'ল। জার্মানিকে শাস্তিস্বরূপ প্রথমে প্রবেশাধিকার দেওয়া হয় নি। সোভিয়েট্-রাশিয়া তখন সভ্যসমাজের বহির্ভূত ব'লেই গণ্য হ'ত। তারপর যখন যুক্তরাষ্ট্র সঙ্ঘে যোগ দিতে অস্বীকার করল, তখন এ-অসম্পূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিরপেক্ষ শান্তি বজায় রাখার আশা অতি ক্ষীণ হ'য়ে এল।

রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিকল্পনা পুরোভাগে থাকলেও, ভের্সায়িির সন্ধিপত্রের প্রকৃত রূপ ভিন্নগোত্রীয়। প্রথমে নূতন সীমা-নির্দ্ধারণের কথা মনে আসে। পাঁচ দিক থেকে জার্মানিকে রাজ্যক্ষয় মেনে নিতে হ'ল। ফ্রান্স্‌কে আল্‌সাস্-লোরেন্ এবং পোল্যাণ্ড্‌কে পোসেন্ ও পশ্চিম-প্রাশিয়া প্রত্যর্পণের ব্যবস্থাকে অবশ্য ঠিক অন্যায় বলা যায় না, কিন্তু এখানকার অধিবাসীরা জার্মান্-শাসনে থাকতে চায় কিনা, এ-সম্বন্ধে একটা মত-প্রকাশেরও অধিকার পায় নি। বাল্‌টিক্-উপকূলে ডান্‌সিগ্ ও মেমেল্ অঞ্চল দু'টিকে, পোল্‌দের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য, জার্মানি থেকে পৃথক করা হয়; সেখানকার অধিবাসীরা জার্মান্ হ'লেও তাদের অমতে সেখানে তাই স্বতন্ত্র শাসন-ব্যবস্থা হ'ল। শ্লেস্‌উইগ্, ইউপেন্-মাল্‌মেডি, দক্ষিণ-সিলেসিয়া এবং পূর্ব্ব-প্রাশিয়ার দক্ষিণাংশে

জনসমূহ মিশ্র বলে’ সেখানে ভোট্-গ্রহণের ব্যবস্থা হয়েছিল, যাতে কোনক্রমে গুণতির সময় সংখ্যাধিক্য জোগাড় করতে পারলেই এ-অঞ্চলগুলি যথাক্রমে ডেন্মার্ক্, বেল্জিয়াম্ এবং পোল্যাণ্ডের করায়ত্ত হ’তে পারে। খনিজসম্পদে সমৃদ্ধিশালী সার্-জেলা জার্মানি থেকে পৃথক হ’য়ে গেল এবং ঠিক হ’ল যে পনের বছরের মধ্যে সেখানকার লোকেরা স্বদেশের সঙ্গে যুক্ত হবার অধিকার চাইলেও পাবে না। সর্ব্বশেষে আফ্রিকা ও প্রশান্ত-মহাসাগরে জার্মানির উপনিবেশগুলিকে বিজয়ীদের হাতে সমর্পণ করতে হয়। এ-ছাড়া সন্ধিপত্রের নির্দ্দেশ অনুসারে নূতন অষ্ট্রিয়ার সঙ্গে স্বগোত্রীয় জার্মানির মিলন কার্য্যতঃ নিষিদ্ধ হয়েছিল। মূলনীতির দোহাই থাকলেও এ-সব ব্যবস্থার পিছনে যে সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব বর্ত্তমান, সে-কথা বোঝা সহজ। তাই প্রতিক্ষেত্রে এমন নীতিরই আশ্রয় নেওয়া হয়েছিল, যাতে পরাজিত জার্মানিরই ক্ষতি হয়। আত্মকর্ত্তৃত্বের খাতিরে আল্সাস্ বা পোসেন্ ফিরিয়ে দিতে হ’ল, কিন্তু সার্ কিম্বা অষ্ট্রিয়ার বেলা সে-দাবী খাটল না। রাষ্ট্রিক সুবিধার জন্য ডান্সিগ্কে অনেকখানি পোল্যাণ্ডের হাতে তুলে দেওয়া হয়, অথচ পশ্চিম-প্রাশিয়া কেড়ে নেওয়াতে পূর্ব্ব-প্রাশিয়া ও বাকী জার্মানির মধ্যে ব্যবধানরূপ যে-অসুবিধার সৃষ্টি হ’ল, সে-আপত্তি গ্রাহ্য হয় নি। ডান্সিগ্ বা সারের ঘোরালো বন্দোবস্ত অবশ্য উইল্সন্কে খুসী করবার জন্যই; এ-প্রসঙ্গে এ-কথাও উল্লেখযোগ্য যে আমেরিকার ভয়েই ফ্রান্স্ রাইন্-প্রদেশ একেবারে নিজ-রাজ্যভুক্ত করতে সাহস পেল না।

মধ্য ও পূর্ব্ব-ইউরোপে ব্যবস্থার কথাও এখানে সংক্ষেপে বলা উচিত। জার্মানির দক্ষিণ-পূর্ব্বে, চেকোস্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ড্ নামে দু'টি নূতন রাজ্য স্থাপিত হ'ল। নূতন ক্ষুদ্রায়তন অস্ট্রিয়া এবং হাঙ্গারিও এখন সম্পূর্ণ স্বাধীন সত্তা লাভ করে। আরও দক্ষিণে, সার্বিয়া এবং রোমানিয়া অস্ট্রিয়া-সাম্রাজ্যের ভূতপূর্ব্ব প্রজা স্বগোত্রীয় জনসমূহের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে বৃহদাকার দু'টি রাজ্যে পরিণত হয়। ইটালি এই সঙ্গে দক্ষিণ-টিরলে ব্রেনার্ পাস্ পর্য্যন্ত রাজ্যবিস্তার করল। অস্ট্রিয়ার প্রাচীন সাম্রাজ্যের খানিকটা এই ভাবে তিন প্রতিবেশীর (ইটালি, রোমানিয়া, সার্বিয়া) কবলে পড়ে। অন্য অংশে তিনটি নূতন রাষ্ট্র গঠিত হ'ল (হাঙ্গারি, অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া)। সপ্তম ভাগ একটি নূতন পোল্যাণ্ড্-রাজ্যের অন্তর্ভূত হয়। বল্কান্-উপদ্বীপের মতন মধ্য-ইউরোপেও এই ভাবে একের স্থানে বহু রাষ্ট্রিক ও আর্থিক সত্তার উদ্ভব পরিণামে মঙ্গলজনক কিনা, সে-সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থেকে যায়। নূতন ব্যবস্থার মূল কথা অবশ্য জাতিগত স্বায়ত্তশাসনের অধিকার, কিন্তু মধ্য-ইউরোপে বিভিন্ন জাতির এমনই মিশ্র বসতি যে রাষ্ট্রের সীমানা যে ভাবেই নির্দ্ধারিত হোক না কেন, দেশের মধ্যে সংখ্যান্যূন অথচ প্রবল বিজাতীয়দের অস্তিত্ব অনিবার্য্য। এমন অবস্থায় পূর্ণ নেশন্-রাষ্ট্রের পরিকল্পনা শুধু অশান্তিরই আকর।

পরাজিত বুল্গেরিয়া ও তুরস্ককেও আকারে খর্ব্ব করা হ'ল,—রোমানিয়া, সার্বিয়া এবং গ্রীসের উপকারের জন্য। কিন্তু তুরস্কের হাত থেকে মুক্তি পেলেও আরবেরা পূর্ব্ব-প্রতিশ্রুত ঐক্য ও স্বাধীনতা পায় নি। নব-উদ্ভাবিত ম্যাণ্ডেট্-প্রথায়

NABADWIP SADHARAN GRANTHAGAR ESTD. 1907
13352

জার্মান্-উপনিবেশগুলির মতন এগুলিকেও বিজয়ীরা যথাসাধ্য নিজেদের মধ্যে বণ্টন করে' নেয়। অন্যদিকে আঠারো শতক থেকে রাশিয়া যে-সব ভূখণ্ড, পশ্চিমে অগ্রসর হ'তে হ'তে, অধিকার করেছিল, তার অধিকাংশই এখন তার হস্তচ্যুত হ'ল। রোমানিয়া বিনা বাক্যব্যয়ে বেসারাবিয়া অধিকার করে' বসে; পোল্যাণ্ড্-এর অনেকখানিই রুষদের কাছ থেকে পাওয়া; আরও উত্তরে, বাল্‌টিক্-উপকূলে চারটি নূতন রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল—লিথুয়ানিয়া, ল্যাট্‌ভিয়া, এস্টোনিয়া এবং ফিন্‌ল্যাণ্ড্। দক্ষিণের নূতন রাজ্যগুলির মতন (পোল্যাণ্ড্, চেকোস্লোভাকিয়া, অষ্ট্রিয়া, হাঙ্গারি) এরাও সাধারণতন্ত্র স্থাপন করে। সোভিয়েট্-রাশিয়াকে এ-ভাবে অনেকখানি পূর্ব্বদিকে হটে' যেতে হ'ল।

সীমা-নির্দ্ধারণের পর আসে জার্মানির শক্তিনাশের কথা। যুদ্ধবিরতির সময়েই এর আভাস দেখা দেয়। তখন জার্মান্‌দের শুধু যুদ্ধে অধিকৃত ভূভাগ ছেড়ে দিতে হয় নি, মিত্রসৈন্যেরা তখনই জার্মানির রাইন্-প্রদেশ সাময়িকভাবে অধিকার করে' বসে। তাছাড়াও জার্মান্‌দের অস্ত্রশস্ত্র ও সমুদয় রণতরী শত্রুহস্তে সমর্পণ করতে হয়। এখন সন্ধির সময় একা জার্মানিকে প্রায় নিরস্ত্র হ'তে হ'ল; ভবিষ্যতেও তার স্থল, জল ও আকাশপথে যুদ্ধসজ্জার স্বাধীনতা রইল না। সন্ধি পালন হচ্ছে কিনা দেখার জন্য শুধু মিত্রপক্ষীয় পরিদর্শক নিযুক্ত হলেন না; পনের বৎসর কাল মিত্রসৈন্যেরা রাইন্ পর্য্যন্ত সকল প্রদেশ অধিকার করে' থাকবে এই ব্যবস্থা হয় এবং রাইন্ নদীর পূর্ব্বে কিছুদূর পর্য্যন্ত জার্মানির নিজ-রাজ্যের মধ্যেও জার্মান্ সৈন্যস্থাপন নিষিদ্ধ হ'ল। এই সঙ্গে

সাগরপারে চীন, মিশর, মরক্কো প্রভৃতি দেশে জার্মান্‌দের বিশেষ অধিকার সমস্তই লোপ পেল। পরাজিতকে অপমান করতেও মিত্রশক্তিরা ছাড়ে নি। ভের্সায়ি-সন্ধিপত্রের ২৩১ ধারায় অম্লানবদনে ঘোষণা করা হয়েছে যে যুদ্ধ-সংঘটনের সমস্ত দায়িত্ব একা জার্মানির এবং প্রতিবাদ সত্ত্বেও অবশ্য এ-কথা তাকে সন্ধিপত্রে মেনে নিতে হ'ল। এই দোষের জন্যই নাকি জার্মানিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রবেশ করতে দেওয়া হয় নি এবং তার হাত থেকে উপনিবেশগুলি কেড়ে নেওয়া হয়। কাইজার্, তাঁর মন্ত্রীগণ ও অত্যাচারী সেনানায়কদের বিচার ও দণ্ডের ব্যবস্থাও সন্ধিপত্রে ছিল, কিন্তু জার্মান্-জনমতকে ক্ষুব্ধ করা ছাড়া শেষ পর্য্যন্ত এই অভিনব প্রস্তাবের কোনও বিশেষ ফল হয় নি।

সন্ধির আর্থিক বিধিব্যবস্থার মধ্যেই কিন্তু সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতিদ্বন্দ্বী-বিনাশ-স্পৃহা সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। প্রথমতঃ, জার্মান্-বহির্বাণিজ্য প্রায় ধ্বংস পেল। সাব্‌মেরিন্ উৎপাতের প্রতিশোধ ছলে জার্মানিকে ১৬০০ টনের অধিক সকল বাণিজ্যতরী এবং তার চাইতে ছোট জাহাজগুলির অর্দ্ধেক সমর্পণ করতে হয়। জার্মান্-সরকারের বিদেশে সব সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হ'ল; এমন কি, জার্মান্ প্রজাদের বিদেশস্থিত ব্যক্তিগত সম্পত্তি পর্য্যন্ত কেড়ে নেবার অধিকার মিত্রশক্তিদের দেওয়া হয়েছিল। দ্বিতীয়তঃ, যে কয়লা ও লোহা বর্ত্তমানে যন্ত্রের সাহায্যে পণ্যোৎপাদনের প্রধান অবলম্বন, জার্মানির প্রকৃতি-দত্ত সেই সম্পদ হ্রাস করবার বিধিমত চেষ্টা হয়। ক্ষতিপূরণ হিসাবে ফ্রান্স্ প্রভৃতিকে কয়লা চালান ছাড়াও জার্মান্‌দের সার্-অঞ্চলের খনিগুলিকে ফরাসীদের হাতে দিয়ে

দিতে হ'ল এবং আরও অনেকখানি কয়লা থেকে জার্মানিকে বঞ্চিত করাই হ'ল পোল্যাণ্ড্কে দক্ষিণ-সিলেসিয়া অর্পণের আসল উদ্দেশ্য। লোরেনের সঙ্গে সঙ্গে এ-ছাড়া জার্মানি প্রচুর লোহা হারাল। এই ভাবে সন্ধির ফলে জার্মান্-যন্ত্রশিল্প আংশিক বিকল হ'য়ে পড়ে। কেন্স্ এ-সব ব্যবস্থার মধ্যে মিত্রশক্তিদের অপরিণামদর্শী মূর্খতাই দেখেছিলেন, কিন্তু এর প্রকৃত উৎপত্তি ইংরাজ ও ফরাসীদের প্রতিদ্বন্দ্বী জার্মানির প্রতি আর্থিক ও রাষ্ট্রিক বৈরিতায়। তৃতীয়তঃ, বহুসংখ্যক রেলগাড়ী কেড়ে নেওয়ার ফলে জার্মানির মধ্যে যাতায়াত এবং জার্মান্ পণ্য-সরবরাহের পক্ষে বিষম অসুবিধার উদয় হ'ল। এটাও অবশ্য ইচ্ছাকৃত; আর সেই সঙ্গে জার্মান্ নদীগুলির উপরও কর্ত্তৃত্বের ভার অনেকখানি গেল বিদেশীদের হাতে।

সবশেষে এল ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা। উইল্সন্ নিছক অর্থদণ্ডের বিরোধী ছিলেন, আমেরিকারও অবশ্য অর্থের অভাব ছিল না। দুর্ভাগ্যক্রমে যুদ্ধক্ষান্তির সময় তিনি মিত্রশক্তিদের একটি দাবী গ্রহণ করলেন যে জার্মানিকে মিত্রপক্ষীয় নিরপরাধ সাধারণ লোকের যুদ্ধের দরুণ ক্ষতি পূরিয়ে দিতে হবে। এর অর্থ অবশ্য স্পষ্ট নয়; কিন্তু সমরকালীন অনর্থক অত্যাচারে যাদের সম্পত্তি নষ্ট হয়েছে, তাদের কিছু অর্থ-সাহায্যই এর উচিত ব্যাখ্যা। লয়েড্-জর্জ্ কিন্তু ব্রিটিশ্-জনসাধারণকে লোভ দেখালেন যে যুদ্ধের খরচের অনেকখানি তিনি জার্মানির কাছ থেকে আদায় করে' নেবেন; আর ফরাসীদের আশ্বাস দেওয়া হ'ল যে ক্ষতিপূরণের টাকার সাহায্যে সরকারী অর্থকষ্টের

ভার লাঘব হবে। জার্মানির অসহায় অবস্থা হৃদয়ঙ্গম করে' মিত্রশক্তিবৃন্দ এখন ঠিক করল যে তাদের সৈনিকদের পরিবার-পরিজনের সরকারের কাছে প্রাপ্য অর্থ-সাহায্যের খরচও জার্মানির দেয় ক্ষতিপূরণ তালিকার অন্তর্গত করা হবে। এ-দাবী অবশ্য ক্ষতিপূরণের প্রাথমিক প্রস্তাবের অযথা সম্প্রসারণ, কিন্তু অন্যায় হ'লেও জার্মানিকে এতে সম্মত হ'তে হয়। স্থির হ'ল যে ১৯২১-এর ১লা মে'র মধ্যে জার্মান্‌দের একশ কোটি পাউণ্ড্‌ অর্থদণ্ড দিতে হবে, কিন্তু এ-ও সব নয়; ক্ষতিপূরণের মোট দেয় নির্দ্ধারণের জন্য এক সমিতি গঠিত হ'ল এবং আগে থাকতেই ঠিক হয় যে তার অনুজ্ঞা জার্মানিকে মেনে চলতেই হবে।

৪

দমননীতির ব্যর্থতা

মহাযুদ্ধের ফলে পৃথিবীর আটটি মহাশক্তির মধ্যে তিনটির পতন হ'ল। এর মধ্যে একটি, অস্ট্রিয়ার একেবারে উচ্ছেদ হয়; অন্য দু'টি, জার্মানি ও রাশিয়া, কিছুদিনের মতন অতি দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে। কিন্তু এর পরে যে-প্রতিদ্বন্দ্বিতার থেকে যুদ্ধের উদ্ভব হয়েছিল তার উপশম হ'ল মনে করলে ভুল হবে। জটিলতা এখন শুধু অন্য আকার নেয়। যুদ্ধান্তে বিজয়ীদের পারস্পরিক নূতন সম্বন্ধ নির্ণয়ের সময় নূতন বৈরিতার সূচনা দেখা দিল—ফ্রান্স্ ও ইংল্যাণ্ড্, ইংল্যাণ্ড্ ও আমেরিকা, আমেরিকা ও জাপান, এদের মধ্যে তখন বিশেষ সদ্ভাবের পরিচয় পাওয়া গেল না। তাছাড়া বিজেতাদের অবস্থাও সে-সময় অনেকাংশে শোচনীয় প্রতিপন্ন হ'ল—কেন না প্রচণ্ড সঙ্ঘর্ষের পর এক পক্ষের পূর্ণ লাভের সম্ভাবনা কম। অল্পদিনের মধ্যে রুষ ও জার্মান্ শক্তির পুনরুত্থান যুদ্ধজয়ের আংশিক লাভকেও ক্ষণস্থায়ী প্রতিপন্ন করল। সাম্রাজ্যতন্ত্রের চক্রে বাঁধা জগৎ তখন থেকে আবার নূতন সংগ্রামের আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছে।

ভের্সায়ির ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জার্মান্‌দের আপত্তি করবার অনেক কারণ ছিল। নানা উপলক্ষ্যে রাজ্যক্ষয় ছাড়াও জার্মানিকে অস্ত্রশক্তির ধ্বংসসাধন এবং আর্থিক সামর্থ্যের বহুল ক্ষতি মেনে নিতে হয়। বিদেশেও জার্মানির কষ্টার্জ্জিত

রাজ্য এবং সকল প্রকার আর্থিক সুবিধা ও অধিকার নষ্ট হ'ল। এত ক্ষতির উপর চাপানো হয়েছিল অন্যদের ক্ষতিপূরণের বোঝা। এ ছাড়াও রইল অবশ্য রাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে নির্ব্বাসন এবং যুদ্ধের সর্ব্বদায়িত্ব স্বীকারের গ্লানি। জার্মানিকে এ ভাবে দমন-চেষ্টার স্বাভাবিক ফল হ'ল ফরাসীদের প্রতি সেদেশের অপরিসীম আক্রোশ। সুযোগ পেলে জার্মানি নিজে যে এর অনুরূপ ব্যবহার করতে ছাড়ে নি, এই সহজ সত্যটুকু ভুলে লক্ষ লক্ষ জার্মানেরা তাই শত্রুদের প্রতি এক প্রচণ্ড বিদ্বেষ আজ পর্য্যন্ত পোষণ করে' আসছে। হিট্‌লারি-আন্দোলন এই মনোভাবের উপরই প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। ফলে আজ যদি জার্মানি ইউরোপে অবাধ কর্ত্তৃত্বের সুযোগ পায়, তবে যে সেখানে ভের্সায়ি অপেক্ষা কঠোরতর অত্যাচারের অনুষ্ঠান হবে তার সন্দেহ নেই।

১৯১৯-এর পর জার্মানিকে ফ্রান্সের চাপই বেশী সইতে হ'ল। আমেরিকার সমর্থনের অভাবে ফরাসীরা সন্ধিপত্রে তাদের মতে যথেষ্ট আদায় করে' নিতে পারে নি। যুদ্ধে পরাস্ত ও সন্ধি-দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হ'লেও জার্মানি যে তবুও রণক্লান্ত ফ্রান্সের থেকে শক্তিশালী থেকে গেল, বস্তুতঃ ফরাসীদের এ-বিশ্বাস অমূলক নয়। তাই রাইন্-প্রদেশ রাজ্যভুক্ত করতে না পেরে, ফ্রান্স্ অগত্যা ক্ষতিপূরণের ছলে জার্মানিকে পঙ্গু রাখতে কৃতসংকল্প হয়েছিল। ভবিষ্যৎ জার্মান্-আক্রমণ রোধের জন্য ফরাসীদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি উইল্‌সন্ দিয়েছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর স্বদেশ সে-দায়িত্ব স্বীকার করল না এবং তাই ইংল্যাণ্ড্‌ও সে-অঙ্গীকারে রাজি হয় নি। সুতরাং ফ্রান্স্‌কে সখ্যবন্ধন স্থাপন করতে

হ'ল বেল্‌জিয়াম্ (সেপ্টেম্বর্, ১৯২০) এবং পোল্যাণ্ডের সঙ্গে (ফেব্রুয়ারি, ১৯২১)। তাছাড়া ফ্রান্সের আওতায়, ১৯২১ সালে, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া (সার্বিয়ার নূতন নাম) এবং রোমানিয়ার মধ্যে' মৈত্রীবন্ধন হয়েছিল—যুদ্ধান্তে এই ত্রয়ীর সকল লাভ-সংরক্ষণে পারস্পরিক সাহায্য এর উদ্দেশ্য। এই ভাবে ইউরোপে প্রভাব-বিস্তার করে'ও ফ্রান্স্ জার্মানি সম্বন্ধে আশ্বস্ত হ'তে পারে নি। সীমান্তরক্ষার সুব্যবস্থা (এখন একে মাজিনো-প্ল্যান্ বলা হয়) ও ফরাসী-শাসিত আফ্রিকায় সে-দেশীয় বিরাট সৈন্যবাহিনী গঠনেও ফ্রান্স্ এখন নজর দেয়। কিন্তু তবুও পঁয়কারে প্রমুখ তথাকথিত বাস্তবপন্থী ফরাসী রাজনীতিবিদ্‌দের দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে জার্মানিকে দুর্ব্বল করে' রাখবার একমাত্র উপায় ভের্সায়ির বিধি-ব্যবস্থার আক্ষরিক পালন। ১৯১৯ থেকে ১৯২৪ পর্য্যন্ত ফ্রান্স্ এই উপায় অনুসরণের বিধিমত প্রয়াস পেয়েছিল।

কিন্তু বাধাও উঠ্‌ল অনেক। সন্ধির বহু ধারা অগ্রাহ্য করবার প্রবৃত্তি জার্মানিতে দেখা দেওয়া তখন স্বাভাবিক। ১৯১৫ সালের সকল প্রতিশ্রুতি রাখা হয় নি বলে' ইটালি তখন মিত্রশক্তিদের উপর বিরক্ত। প্যারিস্-বৈঠকে যখন প্রতিপন্ন হ'ল যে ইংল্যাণ্ড্ ও ফ্রান্সের মিলিত মতকে বাধা দেবার শক্তি আমেরিকা এখনও অর্জ্জন করে নি, তখন উইল্‌সনের নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা ও প্রভুত্বের আশা ছেড়ে দিয়ে যুক্তরাষ্ট্র ইউরোপ্ থেকে স'রে দাঁড়াল। এতে পরিণামে আমেরিকার ইউরোপে আর্থিক প্রতাপের পথই পরিষ্কার হয়—কিন্তু আপাততঃ জার্মান্-দমনে আমেরিকার সাহায্য হ'ল অসম্ভব। ততদিনে ইংল্যাণ্ড্ ও ফ্রান্সের থেকে দূরে সরে'

যেতে আরম্ভ করে। জার্মানির যে-ক্ষতিতে ইংরাজদের লাভ—সাম্রাজ্য, নৌবাহিনী, বহির্বাণিজ্য এবং যন্ত্রশিল্পের ক্ষয়সাধন—তা' আগেই সুসম্পন্ন হয়েছিল। এখন শুধু ফরাসী-স্বার্থের খাতিরে জার্মান্‌দের আরও উৎপীড়ন ইংরাজদের কাছে হঠাৎ অসঙ্গত বোধ হ'তে আরম্ভ করে। ফ্রান্স্‌কে তাই অনেকখানি একলাই অগ্রসর হ'তে হয়। আর শেষ পর্য্যন্ত এই অসদ্ভাবের জন্যই দমননীতির ব্যর্থতা প্রতিপন্ন হ'ল। লয়েড্‌-জর্জ্‌ প্যারিসে শান্তিসভায় আমেরিকার বিরুদ্ধে ফ্রান্সের সাহায্য করেছিলেন—যুক্তরাষ্ট্র সরে' দাঁড়াবার পর তিনিই রব তুল্‌লেন যে ভের্সায়ির বিধির সামান্য কিছু কিছু সংশোধন করলে অন্যায় হবে না। ইংরাজ ও ফরাসীদের মধ্যে ঠোকাঠুকি এর পর আরম্ভ হয়। এমন কি ১৯২২এ জেনোয়া-বৈঠকের সময়, লয়েড্‌-জর্জ্‌ জার্মানি ও রাশিয়ার সঙ্গে অন্তরঙ্গ মৈত্রীরও একবার চেষ্টা করেছিলেন। অন্যদিকে ফ্রান্স্‌ও ইংরাজ-আশ্রিত গ্রীক্‌দের বিরুদ্ধে তুর্কীনেতা কামাল্‌ পাশাকে অনেক সাহায্য, এমন কি, ১৯২১ সালে তাঁর সঙ্গে সখ্যবন্ধন পর্য্যন্ত করে। রাষ্ট্রনীতিতে স্বার্থসঙ্ঘাতের লীলা সত্যই বিচিত্র।

ভের্সায়ি-সন্ধিপত্রের স্বাক্ষরকারী দেশগুলির নূতন ব্যবস্থা সম্বন্ধে বিধিসঙ্গত অনুমোদন এল ১৯২০ সালের ১০ই জানুয়ারি। এই তারিখ থেকে সন্ধির সকল সর্ত্তগুলির কার্য্যে পরিণত হবার কথা। যুদ্ধচালনার সময় মিত্রশক্তিদের একটি পরিচালক-সমিতি গড়ে' উঠেছিল; তারই উত্তরাধিকারী-হিসাবে এই রাষ্ট্রগুলির প্যারিসে উপস্থিত দূতদের নিয়ে গঠিত এক সভার উপর এখন সন্ধি অনুযায়ী

কাজ চল্‌ছে কিনা দেখবার ভার পড়ে। কোন কোন বিষয়ে পরিদর্শনের ভার অবশ্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের উপরেই ন্যস্ত হয়েছিল। জার্মানির অভ্যন্তরেও মিত্রপক্ষীয় পর্য্যবেক্ষকদের প্রবেশ ছিল অবারিত। এ-ছাড়া ক্ষতিপূরণের মোট দেয় নির্দ্ধারণের জন্য একটি বিশেষ সমিতি স্থাপিত হয়।

অধিবাসীদের মত-নির্দ্ধারণের পর পূর্ব্ব-প্রাশিয়ার দক্ষিণ অংশ জার্মানির হাতেই থেকে গেল। কিন্তু দক্ষিণ-সিলেসিয়ার সমস্ত প্রদেশটিতে জার্মান্‌দের সংখ্যাধিক্য হ'লেও এ-অঞ্চলের অঙ্গচ্ছেদ করে' খানিকটা, রাষ্ট্রসঙ্ঘের নির্দ্দেশে, পোল্যাণ্ড্‌কে দেওয়া হয়। এর ফলে অবশ্য এখানকার খনিজ সম্পদের অধিকাংশই পোল্‌দের ভাগে পড়ে। কাইজারের শাস্তি এবং জার্মান্-প্রজাদের বিদেশস্থিত সম্পত্তি কেড়ে নেবার অধিকার—সন্ধিপত্রের এ-ধারাগুলি শেষ পর্য্যন্ত কার্য্যতঃ বর্জ্জিত হ'ল। কিন্তু অন্যদিকে জার্মানেরা তাদের অঙ্গীকার রাখছে না এই মর্ম্মে ফরাসীরা বারবার অভিযোগ আনতে লাগ্‌ল। কমিউনিস্ট্-দমনের জন্য জার্মানিতে শান্তিরক্ষকের সংখ্যাবৃদ্ধি এইরূপে ফরাসীরা ভীতির চক্ষে দেখে—আর যখন সেই কারণে জার্মান্‌সৈন্য রাইন্ নদীর পূর্ব্ব তীরের কাছে আসে, তখন সন্ধিভঙ্গের উপলক্ষ্যে ফ্রান্স্ প্রতিবাদস্বরূপ কিছু-দিনের জন্য রাইন্ পার হ'য়ে ফ্রাঙ্কফর্ট্ ও ডার্‌ম্‌স্টাড্ নগরী অধিকার করে (এপ্রিল্, ১৯২০)। আবার ক্ষতিপূরণ-হিসাবে জার্মানির দিক থেকে প্রাথমিক অর্থদণ্ডের সবটুকু না দেবার অপরাধে, কিছুদিন রাইনের অপর পারে ডুসেল্‌ডর্ফ্ নগরও এই ভাবে ফরাসীদের অধিকৃত হয়। তবুও ইংরাজ-উৎসাহের অভাবে ফ্রান্সের এই কঠোর শাসন ব্যাহত হ'তে লাগ্‌ল। নানা

বৈঠকে এ-সময়ের ইতিহাসের পাতা কণ্টকিত। তার মধ্যে স্পা'র আলোচনার ফলে ক্ষতিপূরণের অর্থে বিজয়ীদের ভাগ নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল। শতকরা ভাগ ফ্রান্সের ৫২, ব্রিটেনের ২২ আর ইটালির ১০ সাব্যস্ত হয়। আমেরিকার এতে কোন দাবী থাকে নি, কিন্তু মিত্রশক্তিরা যুক্তরাষ্ট্রের কাছে অশেষ ঋণজালে আবদ্ধ থাকায় জার্মানির প্রদত্ত অর্থ শেষ পর্য্যন্ত আমেরিকাতেই পৌঁছবার কথা। ১৯২১এ যথাসময়ে ক্ষতিপূরণ-সংসদ জার্মানির মোট অর্থদণ্ডের পরিমাণ ৬৬০ কোটি পাউণ্ডে (প্রায় ৮৮০০ কোটি টাকা) নির্দ্ধারিত করে। তখন সমস্যা দাঁড়াল যে এত টাকা দেবার বা আদায় করবার উপায় কি।

বিদেশে বিপুল অর্থ পাঠাবার মাত্র দুইটি উপায় আছে। আন্তর্জ্জাতিক আদানপ্রদানে সোনার আদর সর্ব্বস্বীকৃত, কিন্তু জার্মানির উপর যে-গুরুভার চাপান হ'ল, তার সমস্ত পরিমাণ দূরে থাকুক, বার্ষিক সুদের তুল্যমূল্য সোনা বছরের পর বছর যোগানোর সামর্থ্য জার্মানির অন্ততঃ ছিল না। দ্বিতীয় উপায়, অত দামের দ্রব্যসামগ্রী পাঠানো। কিন্তু বিদেশ থেকে আমদানীর উপর জার্মান্-রপ্তানির অতখানি আধিক্য গড়ে' তোলা সে-দেশ কেন, কোন দেশের পক্ষেই অসম্ভব। আর কোন্ দ্রব্যই বা এ ভাবে বিদেশে চালান করা যেত? খনিজ পদার্থ, শিল্পযন্ত্র বা যন্ত্রনির্ম্মিত সামগ্রী এর কোনটাই ইংল্যাণ্ড্ প্রভৃতি দেশ অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে নিলে সে-দেশের বাণিজ্যেরই সমূহ ক্ষতি। বিশেষজ্ঞেরা, বিশেষতঃ ইংরাজ পণ্ডিতেরা, তাই শীঘ্রই বুঝলেন যে ক্ষতিপূরণ হিসাবে নির্দ্দিষ্ট অর্থদণ্ডের পূরাপুরি

আদায় সহজ না। ক্ষতিপূরণের পরিমাণ যদি অনেক কম করে' ধরা হ'ত, তবে জার্মানির সে-ঋণ শোধ করাও সম্ভব হ'ত। অবস্থা অন্য রূপ হওয়াতে যেটুকু দেওয়া যেত, তাও এড়াবার প্রবৃত্তি জার্মানিতে জেগে উঠ্‌ল। কিন্তু জার্মান্‌দের উপর চাপ দিতে ইংরাজদের স্বভাবতঃই বিশেষ উৎসাহ দেখা গেল না। পক্ষান্তরে, জার্মান্‌ দ্রব্যসামগ্রী এসে পড়লে ফরাসী-বাণিজ্যের অতখানি ক্ষতির ভয় ছিল না, কারণ ফ্রান্সে স্বদেশজাত পণ্য অন্য ধরণের। তা ছাড়া অর্থদণ্ড-আদায় প্রথম থেকেই ফরাসীদের চোখে জার্মানিকে পঙ্গু করে' রাখার উপায় রূপেই আদর পেয়েছিল। সে দিক থেকে, সম্পূর্ণ দেয় দিতে না পারলেও, ঋণভারে জার্মানি অবসন্ন থাকাটাই লাভের কথা।

ক্ষতিপূরণ-আদায়ের একটা সমবেত চেষ্টা প্রথমে অবশ্য হয়েছিল। মোট দাবী নির্দ্ধারণের পর লণ্ডন্‌-বৈঠকে স্থির হ'ল যে জার্মানিকে বছরে সুদ হিসাবে প্রায় দশ কোটি পাউণ্ডের মতন সোনা দিতে হবে, এবং তাছাড়া জার্মান্‌ রপ্তানির উপর বিজয়ীদের প্রাপ্য শতকরা ছাব্বিশ টাকার এক ট্যাক্স্‌ বসবে। এ-দাবী মেনে নেওয়া সত্ত্বেও কিছুদিনের মধ্যেই জার্মানি কিন্তু তার দেয় দিয়ে উঠতে পারল না। অর্থদণ্ড ঘোর অন্যায়, সমস্ত জার্মান্‌ জাতির এই বদ্ধমূল ধারণা যে এই দেয় শোধের চেষ্টাকে খর্ব্ব করেছিল তাতে বিশেষ সন্দেহ নেই। কিন্তু এ-কথাও মনে রাখা উচিত যে যুদ্ধান্তে পরাস্ত জাতির পক্ষে অতখানি ভার নিশ্চয়ই দুর্ব্বহ ছিল। বিদেশ থেকে সাময়িক ঋণের সাহায্যে প্রাপ্য টাকা দেওয়া সম্ভব হ'লেও তখন ধার পাবার সম্ভাবনাও ছিল অত্যল্প। ঋণভারে

প্রপীড়িত জার্মান্-সরকারের প্রতিপত্তি দেশের মধ্যেও ক্ষয়োন্মুখ হওয়াতে, সরকারী নোটের মূল্য দ্রুতবেগে হ্রাস পেতে লাগ্‌ল। তখন অগত্যা জার্মানি অর্থদণ্ডের সুদ দেওয়ার থেকে কিছুদিনের মতন অব্যাহতি চায়।

ফরাসী-নেতা পঁয়কারের মনে সন্দেহ ছিল না যে এ-প্রার্থনা ফাঁকি দেবার চেষ্টা মাত্র। তাই চাপ দেবার জন্য তিনি ১৯২৩-এর জানুয়ারিতে জার্মানির খনিজ সম্পদ ও যন্ত্রশিল্পের প্রধান কেন্দ্র রুর্-অঞ্চল সৈন্যবলে দখল করলেন। বেল্‌জিয়াম্ তাঁকে সমর্থন করে, কিন্তু ইংরাজেরা কোন প্রকার সাহায্য অস্বীকার করল। রুর্-প্রদেশের অধিবাসীরা তখন ফরাসী সৈন্য ও শাসকদের সঙ্গে সম্পূর্ণ অসহযোগ আরম্ভ করে। জার্মান্-সরকার সেখানে দণ্ডিত লোকদের আর্থিক সাহায্যের ভার নিলেন। ফলে, রাষ্ট্রের আর্থিক দুর্দৈবের জন্য অল্পদিনে জার্মানির মধ্যে প্রচলিত সরকারী মার্ক্‌নোট-গুলির আর কোন দামই রইল না। ওদিকে রাইন্‌ল্যাণ্ডে আলাদা একটি আশ্রিত রাজ্যসৃষ্টির চেষ্টা ব্যর্থ হ'লে, ফরাসীরাও বুঝল যে এ-ভাবে ক্ষতিপূরণ আদায়ের আশা বৃথা এবং সে-চেষ্টায় ক্ষতির সম্ভাবনা নিজেদেরই।

৫

শান্তির সম্ভাবনা

১৯১৯ সালে প্যারিসে যুদ্ধশেষে সন্ধি হয়েছিল বটে, কিন্তু প্রকৃত শান্তি আসে নি। ১৯২৩-এর শেষ পর্য্যন্ত মিত্র-শক্তিদের, বিশেষ করে' ফ্রান্সের দিক থেকে জার্মানিকে উৎপীড়ন এবং জার্মান্‌দের শত্রুবিদ্বেষ, আর্থিক দুর্দ্দশা এবং অবসাদ এর সাক্ষ্য দিচ্ছে। অন্যত্রও গোলযোগ চলেছিল কিন্তু ধীরে ধীরে চারিদিকেই মিটমাট ও শান্তির আবহাওয়ার সৃষ্টি হ'ল। ১৯২৪এ তাই ইউরোপের চেহারার বিস্তর বদল দেখা যায়। এই বছরে ফরাসী-জার্মান্ গণ্ডগোলের একটা সাময়িক নিষ্পত্তি হয়, আর সেই সঙ্গে শান্তিপ্রিয় আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাব আবার ইউরোপে বিস্তার লাভ করে। ১৯১৯ থেকে ১৯২৩-এর মধ্যে, সবলে আড্রিয়াটিক্-বন্দর ফিউম্ নগরীতে আপনার অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং মুসোলীনি কর্ত্তৃক শাসনযন্ত্র-অধিকারের পর (১৯২২), ইটালির অস্থিরতা অনেকখানি হ্রাস পায়। ১৯২৩এর মধ্যে নব্য তুরস্ক বাহুবলে ও ইংরাজ-ফরাসী অসদ্ভাবের কল্যাণে অন্যদের কাছ থেকে নিজ ন্যায্য অধিকারের স্বীকৃতি আদায় করতে সমর্থ হয়। ততদিনে পোল্যাণ্ড্ ফরাসীদের সহায়তায় রুষদের পরাস্ত করে' রাজ্যবিস্তারের ফলে (১৯২০), এবং দুর্ব্বল লিথুয়ানিয়ার হাত থেকে ভিল্‌না নগরী কেড়ে নিয়ে, তৃপ্তি বোধ করেছে। ১৯২১-এর মধ্যে বল্‌শেভিকেরা রাশিয়ায় নিজেদের কর্ত্তৃত্ব

সুপ্রতিষ্ঠিত করতে পারাতে মিত্রশক্তিরাও অবশেষে সে-অঞ্চলে সোভিয়েট্‌বিরোধী বিদ্রোহীদের সাহায্য করা থেকে বিরত হয়। ইতিমধ্যে মধ্য-ইউরোপে হাঙ্গারি ইত্যাদি দেশে বল্‌শেভিক্‌ বিপ্লব-চেষ্টার অবসান ঘটেছিল। ১৯২২-এর ওয়াশিংটন্‌-চুক্তি প্রশান্ত-মহাসাগরে সাময়িক শান্তি আনয়ন করে। শান্তির পুনরাগমনের সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রসঙ্ঘেরও প্রভাব বিস্তার তখন নবযুগের সূচনা হিসাবেই দেখা দিল। মার্ক্স্‌পন্থী কয়েকটি লেখক ভিন্ন প্রায় সকলেই তখন অদূর ভবিষ্যতে শান্তির প্রত্যাশায় আশ্বস্তির নিঃশ্বাস ফেল্‌লেন।

ফরাসী-জার্মান্‌ সঙ্ঘর্ষের সাময়িক অবসানে অঙ্কুরিত হয়েছিল এই নূতন আশার মূল প্রেরণা। ১৯২৩-এর শেষে রুর্‌-অঞ্চলে কোন পক্ষই ঠিক বিজয়ী বোধ করছিল না। এ-সময়ে জার্মান্‌-মার্কের অভাবনীয় দুরবস্থা ইতিহাসে বিস্ময়ের বস্তু হ'য়ে থাকবে। তখনকার দিনে সে-দেশে কোন নোটের সকালবেলার মূল্য দিনান্তে তার শতভাগের এক ভাগে নেমে যেতে পারত। এ-অবস্থায় জার্মানির জেদ হ্রাস পাওয়া স্বাভাবিক। অন্যদিকে পঁয়কারের দমননীতির কোন আশু ফল দেখা গেল না, অথচ ইংল্যাণ্ডের সহযোগিতা থেকে বঞ্চিত হওয়াও ফ্রান্সের বাঞ্ছনীয় নয়। সর্ব্বোপরি আমেরিকার নীতি-পরিবর্ত্তন নূতন ব্যবস্থা সম্ভবপর করে' তোলে। যুদ্ধান্তে মিত্রশক্তিরা সকলেই যুক্তরাষ্ট্রের কাছে ঋণী থাকায়, এবং সে-দেশ থেকে রপ্তানির আধিক্য ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায়, এতদিন নানা দেশ থেকে অপর্য্যাপ্ত সোনা এসে আমেরিকায় জমা হচ্ছিল। তাই মার্কিনী ধনিকপ্রবরেরা তাঁদের উদ্বৃত্ত অর্থবল বিদেশে খাটাবার সুযোগ খুঁজতে

আরম্ভ করলেন। জার্মানিকে তাঁরা টাকা ধার দিলে তার পক্ষে ক্ষতিপূরণ সম্ভব হবে, সে-অর্থদণ্ডের সাহায্যে আবার মিত্রশক্তিরাও আমেরিকার প্রাপ্য সমর-ঋণের সব টাকা চুকোতে পারবে। অন্যদিকে সঞ্চিত মূলধনের নূতন ক্ষেত্রে ব্যবহারে সুদ আদায় ত' হবেই, সেই সঙ্গে ইউরোপ্ যুক্তরাষ্ট্রের কাছে সোনার শিকলে বাঁধাও পড়বে। ১৯২৪-এর ডস্-প্ল্যানের মূলকথা এই।

প্রথমে ফরাসীদের সঙ্গে জার্মান্ ধনিকদের রুর্-অঞ্চলে একটা রফার কথাবার্ত্তা হয়—সে-বন্দোবস্ত মাইকাম্-চুক্তি নামে খ্যাত। জার্মানিতে এই সময় স্ট্রেস্মানের প্রভাব আরম্ভ হ'ল। তাঁর বিশিষ্ট মত ছিল এই যে, পূর্ব্বে বল্শেভিক্দের উপর নির্ভর না করে' পশ্চিম-ইউরোপের ভদ্র জাতিগুলির মুখাপেক্ষী হওয়াই জার্মানির পক্ষে মঙ্গলজনক। তাই সম্ভব হ'লে ফ্রান্সের সঙ্গে পর্য্যন্ত একটা নিষ্পত্তি করতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন। ১৯২৩-এর শেষে এক প্রচণ্ড চেষ্টার ফলে মার্ক্-সমস্যার সমাধান হ'ল। পুরাতন নোট ইত্যাদি বর্জ্জন করে' সম্পূর্ণ নূতন রেণ্টেন্মার্ক্ নামে এক কারেন্সির সৃষ্টি হওয়াতে, অনেক অসুবিধা সত্ত্বেও রাষ্ট্রশক্তির আর্থিক ক্ষমতায় লোকের বিশ্বাস ফিরে আসে। এতে জার্মানির অভ্যন্তরে অনিশ্চয়তার অবসানের সঙ্গে বিদেশ থেকে ঋণ পাবার সম্ভাবনাও বাড়ে। ফ্রান্সে পঁয়কারের মতের পরাজয় হ'ল ১৯২৪-এর সাধারণ নির্ব্বাচনে। র‍্যাডিকাল্ নেতা এরিও মন্ত্রী হ'য়ে আন্তর্জ্জাতিক শান্তির উদ্যোগী হলেন। ইংল্যাণ্ডেও তখন র‍্যাম্সে ম্যাক্ডোনাল্ডের নেতৃত্বে প্রথম শ্রমিক-মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে। চারিদিকে

সঞ্চারিত নবীন আশার আবহাওয়ায়, অর্থনীতিবিশারদ বিশেষজ্ঞেরা মার্কিন্ সেনাপতি ডস্-এর নেতৃত্বে ক্ষতিপূরণের এক নূতন বন্দোবস্ত করাতে সে-প্রস্তাব গৃহীত হ'ল (১৯২৪)।

অনুসন্ধানের পর স্থির হয় যে সহজ অবস্থায় জার্মানির পক্ষে বছরে সাড়ে বার কোটি পাউণ্ড অর্থদণ্ড দেওয়া সম্ভব। ১৯২১এ লণ্ডন্-বৈঠকে বিজয়ীদের বার্ষিক দাবীর যে-পরিমাণ ঠিক হয়, এ অবশ্য প্রায় তারই অনুরূপ। কিন্তু প্রথম পাঁচ বছর জার্মানিকে এর অনেক কম টাকা দিতে হবে ঠিক হ'ল, বার্ষিক দেয় বাড়তে বাড়তে ১৯২৯এ সাড়ে বার কোটিতে পৌঁছবার কথা রইল। জার্মান্ বাজেট্ ও কারেন্সিকে দাঁড় করাবার জন্য বিদেশ থেকে ধারের বন্দোবস্ত হ'ল এবং বস্তুতঃ ডস্-প্ল্যান্‌কে কাজে পরিণত করবার উপায়ই ছিল এই বিদেশী অর্থ-সাহায্য। এতদিন অবশ্য জার্মানির পক্ষে এ পথ খোলা ছিল না। বার্ষিক দেয় টাকার অর্দ্ধেকের (এবং প্রথম পাঁচ বছর তারও বেশী) ভার চাপানো হ'ল জার্মান্ রেলওয়ে ও যন্ত্রশিল্পের উপর, অর্থাৎ সে-ভার থেকে জার্মান্-সরকার মুক্তি পেয়েছিলেন। তারা আবার সে-ভার বহন করল খানিকটা বিধিমত ব্যয়সংকোচ ও বাকী বিদেশ থেকে টাকাধারের সাহায্যে। সরকারী কতকগুলি আয়ও ক্ষতিপূরণের দাবীর জন্য নির্দ্দিষ্ট রইল—অর্থাৎ জার্মান্-রাষ্ট্রের সেই অর্থ যথেচ্ছ ব্যয়ের স্বাধীনতা লোপ পেল। মার্কের প্রহসনের পুনরাবৃত্তি আটকাবার জন্য জার্মানিতে নোট ছাপবার ক্ষমতা রাষ্ট্রের হাত থেকে চলে গেল এক নূতন ব্যাঙ্কের হাতে। এই সব ব্যবস্থার পরিদর্শক হিসাবে কয়েকজন বিদেশী বিশেষজ্ঞের নিয়োগ হ'ল এবং বলা বাহুল্য তাঁদের নেতৃস্থানীয় হলেন

এক আমেরিকান্। এক হিসাবে নূতন ব্যবস্থায় জার্মানিতে বিদেশী কর্তৃত্ব বাড়া বই কমে নি। কিন্তু এতদিনে বিদেশাগত ঋণের কল্যাণে জার্মানির দেয় দেবার উপযুক্ত উপায় উদ্ভব হ'ল। তাছাড়া ফরাসীরা যে শুধু রুর্ থেকে সৈন্যবল সরিয়ে নিয়ে গেল তা' নয়; সেই সঙ্গে এ-কথাও ঠিক হয় যে ভবিষ্যতে কোন গণ্ডগোল হ'লে অস্ত্রের ব্যবহার না করে' শুধু সালিসীর শরণাপন্ন হ'তে হবে। দমননীতি-ত্যাগের যথারীতি সুযোগ নিতে জার্মানি পরে ছাড়ে নি। ১৯২৯-এর জগদ্ব্যাপী আর্থিক সঙ্কটের পর এর জন্যই ক্ষতিপূরণের সকল বন্দোবস্ত একেবারে লোপ পেয়েছিল।

ক্ষতিপূরণের যথাসম্ভব সুব্যবস্থা অথচ জার্মানির বিষম সঙ্কটমোচন আর সেইসঙ্গে ইউরোপে অন্ততঃ সাময়িক শান্তিস্থাপন—ডস্-প্ল্যানের এই ছিল কৃতিত্ব। কিন্তু তখন বোঝা শক্ত ছিল যে এর অনুষঙ্গী বিরাম দীর্ঘস্থায়ী হবে না। জার্মান্‌দের মনের গ্লানি ঘুচল না এবং পণ্যোৎপাদনের ব্যয়সংকোচ-প্রচেষ্টায় সে-দেশে শ্রমিকদের কষ্ট বরং বেড়েই চল্‌ল। আর্থিক অভাবমোচনের একমাত্র উপায় বিদেশীদের উপর প্রতিশোধ, হিট্‌লারি-দলের এ-ধারণা ছড়িয়ে পড়বার এই ভাবে সূত্রপাত হয়। তাছাড়া ধারের সাহায্যে ধার-শোধের নীতি মঙ্গলজনক নয়। কোনক্রমে আমেরিকা থেকে টাকার প্রবাহ বন্ধ হ'য়ে গেলে অন্য সব ব্যবস্থাও অচল হ'য়ে পড়বার সম্ভাবনা রইল। পরে আর্থিক সঙ্কটের সময় বাস্তবিক তাই ঘটেছিল।

প্রথম কয়েক বৎসর কিন্তু শান্তির সম্ভাবনা আরও ব্যাপক আকার নেয়। ডস্-পদ্ধতি কাজে পরিণত হওয়া মাত্র, ১৯২৫-

এর প্রথম দিকে, জার্মান্ নেতারা ইংল্যাণ্ড্, ফ্রান্স্ ও ইটালির সঙ্গে সখ্যবন্ধনের প্রস্তাব করলেন—ভের্সায়ি-নির্দ্ধারিত জার্মানির পশ্চিম-সীমান্ত নিয়ে তাঁরা আর কখনও গণ্ডগোল করবেন না এমন প্রতিশ্রুতি দিতেও তাঁরা রাজি হন। তদনুসারে লোকার্নো সহরে অনেক আলোচনার পর, ১৯২৫-এর শেষের দিকে কয়েকটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। লোকার্নোর মৈত্রীভাব জার্মান্, ফরাসী ও ইংরাজ মন্ত্রী, স্ট্রেস্‌মান্, ব্রিঁয়া এবং অস্টেন্ চেম্বার্‌লেনের মিলিত কীর্ত্তি। প্রধান চুক্তিটির মর্ম্মানুসারে জার্মানি ও ফ্রান্স্ রাষ্ট্রসঙ্ঘের অনুজ্ঞা ব্যতীত নির্দ্দিষ্ট সীমান্ত অতিক্রম করে' কখনও পরস্পরকে আক্রমণ করবে না এই অঙ্গীকারবদ্ধ হয়। সেই সঙ্গে দুই জাতির মধ্যে সকল বিবাদের সালিসী-নিষ্পত্তির ব্যবস্থাও হয়েছিল; এই চুক্তি কার্য্যকরী থাকলে ইউরোপে যুদ্ধের প্রধান কারণ অন্তর্হিত হবার কথা, কারণ পূর্ব্বের মত যুদ্ধান্তেও ফরাসী-জার্মান্ দ্বন্দ্বই সেখানে প্রধান সমস্যার স্থান নিয়ে আছে। ফ্রান্সের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপনের জন্য, স্ট্রেসমান্ এখন আল্‌সাস্-লোরেন্ ফিরিয়ে পাবার আশা ছাড়তে প্রস্তুত হলেন। কিন্তু ডস্-পদ্ধতির মতন লোকার্নো-চুক্তিতেও সমস্যার পূর্ণ সমাধান হ'ল না। এক্ষেত্রে মুস্কিল হয়েছে অবশ্য জার্মানির পূর্ব্ব-সীমান্ত নিয়ে। ইংল্যাণ্ড্ ও ইটালি, ফ্রান্স্ ও বেল্‌জিয়ামের সহিত জার্মানির পশ্চিম-সীমান্তরেখা অবিচলিত রাখবার প্রতিশ্রুতি দিলেও, পূর্ব্বদিকে পোল্যাণ্ড্ ও চেকোস্লোভাকিয়ার বেলায় সে-দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত ছিল না। যদিও জার্মানি এসময় কথা দেয় যে এদু'টি রাজ্যের সঙ্গেও সকল বিবাদনিষ্পত্তি সালিসীর সাহায্যে

হবে, তবু ইংল্যাণ্ড্ ও ইটালি নির্দ্দিষ্ট সীমান্ত রক্ষার দায়িত্ব অস্বীকার করায় পূর্ব্বদিকে জার্মান্-চাপের দরুণ শান্তি-ভঙ্গের সম্ভাবনা থেকেই গেল। সেই থেকে আজ পর্য্যন্ত আমরা এই আতঙ্কের ছায়ায় রয়েছি। পূর্ব্বদিকে জার্মান্‌দের চোখ রয়েছে কতকগুলি ভূখণ্ডের উপর যেগুলির সম্বন্ধে জার্মানির অবশ্য কিছু দাবী আছে, অথচ যা তারা সবলে অধিকার করলে ও-অঞ্চলে যুদ্ধান্তের সকল ব্যবস্থাই ভেঙ্গে পড়তে পারে। এর মধ্যে গোলযোগের আশঙ্কার প্রধান ক্ষেত্র হ'ল —পশ্চিম-প্রাশিয়া (পোল্‌দের সমুদ্রে পৌঁছবার করিডর্ বা বারান্দা নামে এ-অঞ্চলের খ্যাতি), দক্ষিণ-সিলেসিয়া (এর খনিজ সম্পদ প্রচুর), ডান্‌সিগ্ এবং চেকোস্লোভাকিয়ার অন্তর্গত জার্মান্ জেলাগুলি (সুদেৎ-প্রদেশ)। ফ্রান্স্ কিন্তু তখন পোল্যাণ্ড্ ও চেকোস্লোভাকিয়া জার্মান্‌দের দ্বারা আক্রান্ত হ'লে তাদের সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত হ'ল।

এই ভাবে লোকার্নোর পশ্চিমদিকে শান্তিরক্ষার চেষ্টার আড়ালে রইল পূর্ব্বে শান্তিভঙ্গের আশঙ্কা। ১৯২৫-এ কিন্তু সকলে ভাল দিকটা দেখতেই কৃতসঙ্কল্প ছিল। তাই লোকার্নো-মনোভাবের খ্যাতিতে তখন চারিদিক মুখরিত হয়েছিল। রাইন্‌ল্যাণ্ডে ১৯১৯ থেকে মিত্রপক্ষীয় যে-সৈন্যদল সন্ধির সর্ত্তানুসারে রক্ষিত হয়েছিল, এই সময়ে তাদের কিয়দংশে অপসারণ আরম্ভ হয়। লোকার্নোর আলোচনার সময়ই জার্মানিকে রাষ্ট্রসঙ্ঘে স্থান দেবারও কথা ওঠে। তদনুসারে ১৯২৬এ জার্মানি এতদিন পর রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রবেশাধিকার পেল। শুধু তাই নয়, সঙ্ঘের চালক-সমিতিতে ইংল্যাণ্ড্, ফ্রান্স্, ইটালি ও জাপানের মতন,

জার্মানিকেও বিরাট রাষ্ট্রের ন্যায্য অধিকার হিসাবে স্থায়ী সভ্যপদ দেওয়া হয়। এ-প্রস্তাবে প্রথমে কিছু আপত্তি হয়েছিল; সম্ভবতঃ ফ্রান্স্ ও ইংল্যাণ্ডের গুপ্ত প্ররোচনায়, পোল্যাণ্ড্ ও স্পেন্ জার্মানির সঙ্গে সমান পদমর্য্যাদার দাবী করল এবং প্রতিবাদ-স্বরূপ ব্রেজিল্ সঙ্ঘ ত্যাগ করে। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত জার্মানিই শুধু সমিতির নূতন স্থায়ী সভ্য হয়। ফরাসী-জার্মান্ সদ্ভাব এর পর কিছু দিন আরও বৃদ্ধি পায় এবং সারা ইউরোপে সেইজন্য একটা আশ্বস্তির আরাম ছড়িয়ে পড়ে।

৬

বহির্জগৎ

ইউরোপের আধুনিক কোন যুগের ইতিবৃত্ত শুধু সে-মহাদেশটির মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না, পৃথিবীর সর্ব্ব ভাগের সঙ্গে ইউরোপীয়দের এখন অতি ঘনিষ্ঠ যোগ। এক দিকে ইউরোপের ব্যাপারে আজকাল আমেরিকার প্রভাব পদে পদেই পাওয়া যায়—অন্যদিকে ইউরোপীয় সাম্রাজ্যগুলি আবার পৃথিবীর সকল অঞ্চলেই রাজ্যবিস্তার করেছে। সে-সব সাধারণ কথা ছেড়ে এখন দুটি বিষয়ের আলোচনা করা প্রয়োজন—প্রশান্ত-মহাসাগরে শক্তি-সঙ্ঘাত এবং নব্যতুরস্কের অভ্যুত্থান।

চীনদেশের অবস্থার কথা সংক্ষেপে বর্ণনা সম্ভব নয়। গত শতকে ইংরাজ ও অন্য বিদেশীরা অস্ত্রের সাহায্যে এর রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত করে;—ফলে এ-শতাব্দীর প্রথম দিকের মধ্যে চীনের স্বাধীন অস্তিত্ব লুপ্তপ্রায় হয়েছিল। বিভিন্ন জাতির বিরোধী স্বার্থই শুধু তাকে ধ্বংসের হাত থেকে বাঁচায়। কিন্তু ইউরোপে জার্মান্-প্রতিদ্বন্দ্বিতা প্রবল হ'য়ে উঠ্‌লে ইংরাজদের, আত্মরক্ষার জন্য, সুদূর চীনের উপর নিজেদের মুষ্টি শিথিল করে' আনতে হ'ল। সেই সময়ে জাপানের সঙ্গে ব্রিটেন্ মৈত্রীস্থাপন করে (১৯০২)। এর অপর কারণ, ১৮৯৯ থেকে আমেরিকার চীনে মুক্তদ্বার অর্থাৎ সকলের বাণিজ্যে সমান সুবিধা এই দাবীর সমর্থন। কিন্তু ইংরাজ-শক্তি

পিছনে থাকাতে জাপান এর পর দ্রুত ক্ষমতাবৃদ্ধির পথে অগ্রসর হ'ল।

বিদেশীদের হাতে লাঞ্ছিত হ'য়ে জাপানীদের সাধনা হয়েছিল ইউরোপীয় রণচাতুর্য্য ও কর্ম্মকুশলতা আয়ত্ত করে' স্বদেশের শক্তি-প্রতিষ্ঠা। চীনের তন্দ্রালস ভাব কিন্তু এক শতাব্দীর বিদেশী প্রভাবের পরও কাটে নি। গত শতকের শেষভাগ থেকেই জাপান বিদেশীদের পদানুসরণে চীনে ক্ষমতা বিস্তার করছিল। এখন সে-উদ্যম বহুল বৃদ্ধি পেল। যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের ফলে দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়ায় জাপানী-কর্ত্তৃত্বের পথে আর বাধা রইল না (১৯০৫)। সেই থেকে এ-প্রদেশ নামে চীনের অন্তর্গত থাকলেও, কার্য্যতঃ জাপানী-সম্পত্তি দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া রেল-কোম্পানীর করায়ত্ত হ'য়ে পড়ে। জাপান এর পর, ১৯১০ সালে, আশ্রিত কোরিয়া দেশ রাজ্যভুক্ত করে' নিল। চীনে জাতীয়দলের অভ্যুত্থান এবং বিপ্লবের পর সাধারণতন্ত্র সংস্থাপন (১৯১১) নবজন্মের প্রতীকরূপে বোধ হ'লেও, রাষ্ট্রপতি ইউয়ান্-শি-কাই-এর কল্যাণে সেখানে বিদেশীদের প্রভাব সমানই থেকে যায়; এমন কি কিছুদিনের মধ্যে দেশে বিভিন্ন সেনানায়ক-শাসিত খণ্ডরাজ্যের উদয় চীনকে এসময় দুর্ব্বলতর করে' ফেলে। মহাযুদ্ধ আরম্ভ হ'লে জাপান সে-সুযোগে জার্মানির হাত থেকে চীনের শাংটুং-প্রদেশ দখল করে' বসে; তারপর অবশ্য মিত্রশক্তিদের বিশেষ সাহায্য করা জাপানীদের আর হ'য়ে ওঠে নি। বরং সকলকে অন্যত্র ব্যস্ত দেখে, জাপান চীনের কাছে একুশটি দাবী জানাল (১৯১৫); সেগুলি সব পূর্ণ হ'লে চীন নিশ্চয়ই জাপানের পদানত আশ্রিত রাজ্য

হ'য়ে পড়ত। বাধা এল স্বভাবতঃই আমেরিকার দিক থেকে। অগত্যা বাধ্য হ'য়ে জাপানকে তখন অনেক দাবী প্রত্যাহার করতে হয় (১৯১৭)। তবুও যুদ্ধশেষে জাপান শুধু প্রশান্ত-মহাসাগরস্থিত জার্মান্ দ্বীপের অনেকগুলি ম্যাণ্ডেট্-প্রথা অনুসারে শাসন করবার অধিকার পায় নি—শাংটুং-প্রদেশও সে চীনকে ফেরৎ দিতে অস্বীকার করে। ভের্সায়ির বিধি-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আমেরিকার তীব্র প্রতিবাদের অন্যতম কারণ এই।

কিন্তু মহাযুদ্ধের ফলে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতাপ খুবই বৃদ্ধি পেয়েছিল। অবশ্য প্যারিসে, ১৯১৯ সালে, ইংল্যাণ্ড্ ও ফ্রান্সের সঙ্গে পেরে না ওঠাতে আমেরিকার মনে হ'ল যে ইউরোপে ও রাষ্ট্রসঙ্ঘে জড়িয়ে না পড়াই ভাল। তাই প্রবল আন্দোলনের পর উইল্‌সনের কীর্ত্তি—ভের্সায়ির সন্ধিপত্র ও রাষ্ট্রসঙ্ঘ—আমেরিকায় পরিত্যক্ত হয়েছিল। কিন্তু তাতে যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতা বেশী খর্ব্ব হয় নি। এই সময়েই ইংল্যাণ্ড্ ও আমেরিকার রণতরী-নির্ম্মাণের প্রতিযোগিতা প্রবলভাবে আরম্ভ হ'ল। সাম্রাজ্যতন্ত্রের বিবর্ত্তনের ইতিহাসে একটা সাধারণ-সূত্রের অস্তিত্ব সহজেই চোখে পড়ে—প্রবল রাষ্ট্র-গুলির পারস্পরিক শক্তির অনুপাত সর্ব্বদাই অসম এবং চিরচঞ্চল। জার্মানির নৌবল-উচ্ছেদে তাই ইংল্যাণ্ডের বেশী লাভ হ'ল না। ১৯২১ পর্য্যন্ত ইংরাজ মন্ত্রীরা বিধিমত চেষ্টা করলেন যাতে ইংরাজ নৌবাহিনী পৃথিবীতে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ থাকে, কিন্তু আমেরিকার অর্থবলের সঙ্গে পেরে ওঠা সহজ নয়। একদিকে জাপান ও অন্যদিকে ব্রিটেন্ এই ভাবে যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ত্রস্ত হ'য়ে আপোষে নিষ্পত্তির পক্ষপাতী হ'য়ে

পড়ল। এরই ফলে আমেরিকার নেতৃত্বে ওয়াশিংটন্-চুক্তির উদ্ভব হয় (১৯২২)।

এই বিখ্যাত সন্ধিপত্রে যুক্তরাষ্ট্রকে খুসী করবার জন্য ঠিক হয় যে শাংটুং-প্রদেশ জাপান চীনকে ফিরিয়ে দেবে, ইংরাজ এবং আমেরিকান্ নৌবহর আয়তনে সমান হবে, আর ইংরাজ ও জাপানীর পারস্পরিক সাহায্যের ১৯০২ সালের অঙ্গীকার এখন থেকে লোপ পাবে। এছাড়া নয়টি রাষ্ট্র আর একটা চুক্তিবদ্ধ হ'ল যে তারা সকলেই চীনের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা মেনে নিয়ে তাতে কখনও হস্তক্ষেপ করবে না। জাপানকে এই ভাবে প্রতিশ্রুতি দিয়ে বেঁধে যুক্তরাষ্ট্র প্রশান্ত-মহাসাগরে শান্তির প্রচেষ্টা করছিল। বাণিজ্যপ্রসারে অবাধ স্বাধীনতা থাকলেই অবশ্য আমেরিকার স্বার্থ সংরক্ষিত হয়। কিন্তু জাপানকে এর জন্য প্রতিদানে কিছু সুবিধাও দিতে হয়েছিল। ব্রিটেন্ ও আমেরিকার প্রতি পাঁচ পাঁচ খানি বড় রণতরীর জায়গায় জাপানকে এখন তিনটি তেমন জাহাজ রাখার অনুমতি দেওয়া হ'ল। অন্য দুটি মহাশক্তির নৌবহর জাপানের মতন এক জায়গায় সমবেত রাখবার উপায় নেই—কেননা পৃথিবীর সর্ব্বত্র এদের রণতরী বহুবিস্তৃত স্বার্থরক্ষায় নিযুক্ত থাকে। তাই চীন-উপকূলে নূতন ব্যবস্থায় জাপানী নৌশক্তির প্রাধান্যই প্রকারান্তরে স্বীকৃত 'ল। দ্বিতীয়তঃ, চুক্তি অনুসারে, প্রশান্ত-মহাসাগরের উত্তর-কে দ্বীপমালায় নূতন দুর্গ কিম্বা সুরক্ষিত বন্দর নির্ম্মাণনিষিদ্ধ ; এর ফলে সুদূর আমেরিকা থেকে জাপানকে আক্রমণ রার আয়োজন প্রায় অসাধ্য হ'য়ে ওঠে। সকল চুক্তির মতন য়াশিংটনেও উভয় পক্ষকেই কিছু কিছু ছাড়তে হয়েছিল।

ষোল বছর পরে এখন সহজেই বোঝা সম্ভব যে ওয়াশিংটন্-চুক্তিতেও অনেক গলদ থেকে যায়। আমেরিকা ও ব্রিটিশ্-ডোমিনিয়ান্গুলিতে জাপানীদের অবাধ-প্রবেশ স্বীকৃত না হওয়াতে জাপানের স্বার্থ ও আত্মাভিমান আহত হবারই কথা। আর্থিক ও রাষ্ট্রিক কর্ত্তৃত্বের লোভে দুর্ব্বল চীনকে পদদলিত করবার বাসনা জাপানী সাম্রাজ্যবাদী মহলে প্রবল হ'য়ে উঠলে, শুধু প্রতিশ্রুতির বাঁধনে জাপানকে আটকে রাখা দুষ্কর হ'য়ে ওঠাই স্বাভাবিক। তাছাড়া চীনে পরে সঙ্ঘাতের সূত্রপাত হ'লে, ইংল্যাণ্ড্ যে তার দু'কূল রাখবার অভ্যস্ত নীতি অনুসরণ করবে না এমন কোন স্থিরতা ছিল না। তবুও সাময়িক শান্তিস্থাপন হিসাবে ওয়াশিংটনের সন্ধির অনেকখানি সাফল্য ও খ্যাতি আছে। চীন-অঞ্চলে শান্তির সম্ভাবনা এবং জগতের প্রধান পাঁচটি নৌশক্তির অনুপাত নির্দ্ধারণ এর কীর্ত্তি। সে অনুপাত হ'ল, আমেরিকা ও ব্রিটেন্ প্রত্যেকে পাঁচ, জাপান তিন, ফ্রান্স্ ও ইটালি প্রত্যেকে দেড়।

চীন জাপান প্রভৃতি দেশ পশ্চিমে সুদূর-প্রাচ্য নামে অভিহিত। তারই বিপরীত শব্দ হিসাবে তুরষ্ক-অঞ্চলের নাম হয়েছে অদূর-প্রাচ্য। নূতন তুরষ্ক কিন্তু এখন বেশীর ভাগ এশিয়ার মধ্যে এসে পড়েছে, যদিও এখনও কন্স্টান্টি-নোপ্ল্ ও তার পার্শ্ববর্ত্তী ভূখণ্ড তুর্কীদের অধিকারে রয়েছে। নূতন রাষ্ট্রকেন্দ্র আংকারা নগরী তাই এশিয়ার অন্তর্গত আনাটোলিয়ার অভ্যন্তরে সংস্থিত। এশিয়ার পশ্চিম ভাগে যে-শ্রেণীবদ্ধ ইস্লামীয় দেশগুলিকে ইউরোপে অনেক সময় মধ্য-প্রাচ্য আখ্যা দেওয়া হয়, বস্তুতঃ তুরষ্ক এখন তারই

সঙ্গে নিবিড়ভাবে সংযুক্ত। তাই ইউরোপের ইতিহাসে তুর্কীদের আর সেই আগেকার স্থান নেই—তাদের প্রভাব এখন শুধু মহাদেশের প্রত্যন্ত স্পর্শ করছে মাত্র। তাছাড়া তুরস্কের পুনরুজ্জীবন যতই চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ হোক না কেন, সাম্প্রতিক ইতিহাসের মূলবস্তুর (অর্থাৎ বিশাল শক্তিগুলির পারস্পরিক সঙ্ঘাত এবং এযুগের সম্পূর্ণ নূতন ভাবধারার উদ্ভব) সহিত তার সম্পর্ক কম। সুতরাং স্বল্পায়তন আখ্যায়িকায় ইউরোপ্-প্রসঙ্গে তুরস্কের বিস্তৃত আলোচনার সুযোগ নেই।

১৯১৮ সালের শেষে তুরস্ক দুর্ভাগ্যের চরমে পৌঁছেছিল। তার পর বৎসর গ্রীক্‌রা এই সুযোগে স্মার্ণা অধিকার করে' এশিয়া-মাইনরের উপকূল জয়ে উদ্যত হ'ল। সেভ্‌রের সন্ধিতে তুর্কী সুল্‌তান্ নানাদিকে বহু ক্ষতি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন (অগাস্ট্, ১৯২০), কিন্তু ইতিমধ্যে মুস্তাফা কামাল্ পাশার নেতৃত্বে এক নব্য জাতীয়দলের অভ্যুত্থান তুরস্কের ভাগ্য পরিবর্তন করে। কয়েকটি বৈঠকের পর এই দল সঙ্ঘবদ্ধ হ'য়ে গ্রীক্‌দের হাত থেকে তুর্কীদের স্বদেশ আনাটোলিয়ার রক্ষা কার্য্যে ব্রতী হয়। তারা আঙ্গোরায় কেন্দ্র করে' সংগ্রাম চালাল এবং সেভ্‌রের সন্ধিপত্র অগ্রাহ্য করে' সুল্‌তান্ যেন শত্রুহস্তে বন্দী এই ভাবে নিজেরা রাজ্যশাসনের ভার নিল। ১৯২২-এর মধ্যে তুর্কীরা গ্রীক্‌দের বিধ্বস্ত করে' এশিয়া থেকে বিতাড়নে সমর্থ হয়। ফ্রান্স্ ও ইটালির সঙ্গে মৈত্রী তখন তুর্কীদের ইংরাজ-প্রতিকূলতার থেকে বাঁচিয়েছিল। ইতিমধ্যেই কামাল্ পাশা সমরজয়ের উৎসাহ দেশ ও জাতির পুনর্গঠনে সঞ্চারিত করতে

পেরেছিলেন। ফরাসী-বিপ্লবের বিখ্যাত জ্যাকোবিন্ শাসন-পদ্ধতির (১৭৯৩) মূলসূত্রগুলির সাহায্যে ১৯২১এ নূতন তুরস্কের রাষ্ট্রযন্ত্র গঠিত হয়। পশ্চিমী সভ্যতার যে-আদর্শ ধীরে ধীরে দেশে শিকড় গেড়েছিল, শুভমুহূর্ত্তে কামাল্ পাশা স্বদেশকে সে-মন্ত্রে পূর্ণদীক্ষা দিলেন। সুল্তানের পদচ্যুতির পর তুরস্ক সাধারণতন্ত্রে পরিণত হ'ল (১৯২৩)—তবে যুদ্ধান্তের যুগে অন্য অনেক দেশের মত ব্যক্তিগত কর্ত্তৃত্বই দেশকে তখন চালিত করে এবং কামালপাশা তখন থেকে অপ্রতিহত ভাবে নব্য তুরস্কের অধিনায়কত্ব করেছেন। ইস্লাম্-ধর্ম্মরক্ষক খলিফার পদে ১৯২৪ পর্য্যন্ত সুল্তান্কে রাখা হয়, কিন্তু সেবছর মার্চ্চমাসে সংস্কারকদের হাতে এই উচ্চপদও লোপ পেল। তুরস্কের নবার্জ্জিত শক্তি বিদেশীদের কাছে সমাদর পেল লসানের সন্ধিতে (১৯২৩)—এতে সেভ্রের ব্যবস্থা বহুল পরিবর্ত্তিত হ'য়ে তুরস্কের মর্য্যাদা বৃদ্ধি হয়। মুস্তাফা কামালের সংস্কারের গভীরতা ও স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও, তুর্কীনেতাদের জাতীয় পুনর্গঠন-প্রচেষ্টা ইতিহাসে নিশ্চয়ই স্মরণীয় হ'য়ে থাকবে।

যুদ্ধান্তের ম্যাণ্ডেট্-প্রথাও তুরস্কের মতন ইউরোপীয় ইতিহাসের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হ'লেও তার অন্তরঙ্গ অংশ নয়। মহাসমরে প্রচারিত নীতিকথার মধ্যে অন্যতম ছিল এই, যে পূর্ব্বের মতন অনুন্নত বিজিত দেশগুলিকে বিজয়ীদের সাম্রাজ্যভুক্ত করা অনুচিত, যারা নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে এখনও স্বায়ত্তশাসনের উপযুক্ত হয় নি তাদের জন্য অভিভাবকত্বের আয়োজনই সমীচীন। বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের

বিধানপত্রের দ্বাবিংশতি ধারায় এ-আদর্শ রূপ নিল। তুরস্কের আশ্রিত আরবপ্রদেশগুলি এবং জার্মানির সমস্ত উপনিবেশ তাই সোজাসুজি বিজয়ীদের রাজ্যভুক্ত না হ'য়ে বিভিন্ন অভিভাবকের হাতে ন্যস্ত হয়। অভিভাবকেরা যে মিত্রপক্ষীয় জয়ী শক্তিগুলি, সে-কথা অবশ্য বলা বাহুল্য। শত্রুহস্তচ্যুত নাবালক ভূখণ্ডগুলিকে তিন স্তরে সাজানো হয়। প্রথম স্তরে, আরবপ্রদেশগুলি—অর্থাৎ ইরাক্, সিরিয়া এবং প্যালেস্টাইন্—স্থান পায়; এদের বিদেশের সঙ্গে সকল সম্পর্ক এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারেও চূড়ান্ত-কর্তৃত্বের অধিকার অভিভাবক ইংরাজ ও ফরাসীর (সিরিয়ার পক্ষে) হাতে থাকলেও, এদের খানিকটা পৃথক রাষ্ট্রিক সত্ত্বা স্বীকৃত হয়। কিন্তু তুর্কীদের বিরুদ্ধে আরব-বিদ্রোহের সময়, ইংরাজ দূত ম্যাক্‌ম্যাহন্ আরবদের যুদ্ধান্তে পূর্ণ-স্বাধীনতার আশ্বাস দিয়েছিলেন। ফ্রান্সের সঙ্গে এক গোপন ব্যবস্থার (সাইক্‌স্-পিকো চুক্তি) ফলে এখন সে-প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হ'ল। তাছাড়া ১৯১৭ সালে ব্যাল্‌ফোর্-ঘোষণাপত্রে প্যালেস্টাইনে য়িহুদি-নিবাস গড়ে' তোল্‌বার যে-অঙ্গীকার দেওয়া হয়, তার সঙ্গেও যে আরবদের আত্ম-কর্তৃত্বের দাবী খাপ খায় না, ভবিষ্যতে সে-কথা স্পষ্ট হয়েছিল। প্যালেস্টাইন্ ও সিরিয়ায় তাই আরব জাতীয়তার সঙ্গে অভিভাবকদের সঙ্ঘর্ষ ঘট্‌ল বারবার। প্যালেস্টাইনে এ-সঙ্ঘাত সম্প্রতি অতি তীব্র রূপ নিয়েছে। পক্ষান্তরে ইরাক্ দ্রুত উন্নতি করে' পরে অন্ততঃ নামে স্বাধীনতা পেয়েছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের ম্যাণ্ডেটের উপর অভিভাবকদের কর্তৃত্বের অধিকার আরও অনেক বেশী, কিন্তু সেখানেও

কাগজে কলমে সে-ক্ষমতার একটা সীমা নির্দ্দিষ্ট আছে। ম্যাণ্ডেট্-পরিদর্শনের ভার অবশ্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের উপর ন্যস্ত। সে-প্রতিষ্ঠানের অন্তর্নিহিত শক্তির উপরই তাই এ-প্রথার সাফল্য নির্ভর করছে।

৭

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ

মধ্যযুগে খ্রীষ্টধর্ম্মের আশ্রয়ে সমগ্র ইউরোপে যে-একতার বন্ধন ছিল, চার পাঁচ শত বৎসর আগে তার লোপ হয়। তারপর থেকে যে-আধুনিক কালের আরম্ভ ধরা হয়, তার একটা বৈশিষ্ট্য হ'ল প্রত্যেক রাষ্ট্রের সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং স্বকর্ত্তৃত্বের অধিকার স্বীকার। কার্য্যতঃ কয়েকটি প্রবল দেশ অন্যদের উপর দৌরাত্ম্য করলেও, পরবর্ত্তীকালে আন্তর্জ্জাতিক বিধি-বিধান আর রাষ্ট্রশাস্ত্রের আলোচনা এই অধিকারের উপর প্রতিষ্ঠিত। এ-ব্যবস্থায় কিন্তু বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপরে কোন সার্ব্বভৌম শক্তির অভাবের কুফল দিনে দিনে দেখা গেল। মনে হ'তে লাগল যে অশান্তি ও অনাচার নিবারণের শ্রেষ্ঠ উপায় আবার তেমন কোন সার্ব্বভৌম শক্তির সংস্থাপন। ফরাসী রাজা চতুর্থ হেন্‌রি, যাজক সাঁ পিয়র্, জার্মান্ দার্শনিক কাণ্ট্ প্রমুখ অনেকে এ-বিষয়ে জল্পনা করেছিলেন। কিন্তু ধনতন্ত্রের প্রভাবে প্রথম পৃথিবীর সর্ব্ববিভাগের আর্থিক যোগ সুগঠিত হ'য়ে উঠলেও, সেই সঙ্গে বিভিন্ন রাষ্ট্রের কর্ত্তা ভিন্ন ভিন্ন ধনিকগোষ্ঠির মধ্যে স্বার্থের সঙ্ঘাত তীব্রতর হ'তে লাগ্‌ল। বস্তুতঃ ধনিক-আমলে বিভিন্ন দেশের বুর্জোয়াশ্রেণীর দীর্ঘস্থায়ী সাধারণ স্বার্থের অস্তিত্ব যে কল্পনা মাত্র, বর্ত্তমান সাম্রাজ্যতন্ত্রের ক্রমবিকাশ তার প্রচুর সাক্ষ্য দেয়। বিশ্বব্যাপী কোন

রাষ্ট্র-প্রতিষ্ঠান তাই ধনিকতন্ত্রের সঙ্গে খাপ খাওয়ানো প্রায় অসম্ভব। এ-অবস্থায় বহুদিন যে ঐক্যস্থাপনের কোন যথার্থ প্রয়াস পর্য্যন্ত হয় নি, তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই।

গত শতকের উদার মতবাদের ব্যর্থতা, তার আদর্শ এবং আচরণের প্রভেদ, এই প্রসঙ্গে স্বভাবতঃই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। উনিশ শতকের প্রথম দিকটা কব্‌ডেন্‌ ও অবাধ-বাণিজ্যের যুগ ; রাসেল্‌ সম্প্রতি এর বৈশিষ্ট্য দেখেছেন মুক্তিপ্রয়াসে ও শান্তির আদর্শে। কিন্তু তারপর এল শান্তির বদলে সংগ্রাম, রাসেলের ভাষায় সংগঠনের যুগ ; তখন মুক্ত জাতিদের মধ্যেও সংরক্ষণ, প্রতিযোগিতা ও রাজ্যকাড়াকাড়ির ধুম পড়ে' গেল। সাম্রাজ্যবাদের জালে জড়িয়ে পড়ে' উদার ভাববাদীরা অনেকে তখন ঠিক অবস্থাটা বুঝে উঠতে পারেন নি। ন্যায়ধর্ম্মে গ্ল্যাড্‌স্টোনের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল, অথচ তাঁরই আমলে আলেক্‌জান্দ্রিয়ায় গোলাবর্ষণ ও ব্রিটিশ্‌ সৈন্যের ঈজিপ্ট্‌-অধিকার ঘটেছিল। এ-পরিবর্ত্তন মানব-মনের আকস্মিক অধঃপতনের জন্য নয়, তৎকালীন আর্থিক বিপর্য্যয়ের প্রতিফলনই হয়ত এর প্রকৃত কারণ। ধনতন্ত্র ততদিনে শান্ত আদান-প্রদানের উদারনীতির বাঞ্ছিত ব্যবস্থা অতিক্রম করে' একচেটিয়া কর্ত্তৃত্বস্থাপনের পর্য্যায়ে অগ্রসর হয়েছিল বলে'ই, ইউরোপে গত শতকের শেষের দিক থেকে পৃথিবীভাগাভাগির উপলক্ষ্যে মহাযুদ্ধের প্রলয় ঘনিয়ে আসে।

ধনতন্ত্র সাম্রাজ্যবাদে পরিণত হবার সময় জগদ্ব্যাপী ঐক্যের আশা তাই স্বপ্নমাত্র ছিল। কিন্তু মহাযুদ্ধের করাল রূপের একটা ফল হ'ল জনসাধারণের মনে চিরস্থায়ী শান্তির আকাঙ্ক্ষা। তাই তখন আমেরিকান্‌ আদর্শবাদীদের

বিশ্বসঙ্ঘের পরিকল্পনা সর্ব্বত্র সাড়া পেল। উইল্‌সন্‌ তাঁর চোদ্দ প্রস্তাবের মধ্যে এর স্থান দিলেন এবং এর চারদিকেই ভবিষ্যতের আশা ভরসা মূর্ত্তি নিতে লাগ্‌ল। প্যারিস্‌-বৈঠকে কূটনীতিজ্ঞেরা অবশ্য এ-পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন নানা গুপ্ত কারণে। তাঁদের কারো উদ্দেশ্য ছিল আমেরিকাকে খুসী করা ; অন্যরা ভাবলেন নূতন প্রতিষ্ঠানের সাহায্যে কর্ত্তৃত্ব হবে সহজতর কিম্বা বল্‌শেভিক্‌-বিপ্লবকে আটকাবার সুবিধা হবে। এই শেষোক্ত উদ্দেশ্য স্বয়ং লয়েড্‌-জর্জ্‌ একবার স্বীকার করে' ফেলেছিলেন (১৯১৯এর মার্চ্চ্‌)। যে-কারণেই হোক, আন্তর্জ্জাতিক শান্তি সম্বন্ধে প্রাথমিক উৎসাহের প্রাবল্য লীগ্‌-অব্‌-নেশন্‌স্‌-এর মূর্ত্তিগ্রহণ করে' তখন উদিত হ'ল।

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ কার্য্যকরী হ'তে হ'লে তাকে অবশ্য অনেকখানি বিশ্বরাষ্ট্রের আকার ধারণ করতে হয়। জেনীভার প্রতিষ্ঠানটির অজস্র নিন্দাবাদ সকলেরই পরিচিত, সাম্প্রতিক সকল দুর্ঘটনার দায়িত্ব অনেকে এর উপর চাপিয়ে তৃপ্তি লাভ করেন। কিন্তু বিশ্বরাষ্ট্রকে সম্ভব করে' তোলার উদ্যম সম্পর্কে এই সমালোচকেরা নিশ্চেষ্ট ও নীরব। বস্তুতঃ স্বদেশের পদমর্য্যাদা বা ক্ষমতা-হ্রাসের বিন্দুমাত্র সম্ভাবনায় এঁরাই হবেন সব চেয়ে উত্তেজিত। সেজন্য স্বীকার করতে হয় যে বিশ্ব-রাষ্ট্রসঙ্ঘের মূল প্রেরণা একটা সাময়িক অবসাদ এবং রণক্লান্ত মনোভাব মাত্র। অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটির দুর্গতিও তাই বিচিত্র নয়।

কিন্তু যুদ্ধান্তে বিশ্বরাষ্ট্রের অনুরূপ কোন আংশিক ব্যবস্থাও কি গড়ে' তোলা সম্ভব ছিল না ? নর্ম্যান্‌ এঞ্জেলের মতন

শান্তিবাদী, এইচ্ জি ওয়েল্সের ন্যায় বুদ্ধিবাদী, হিল্ফার্ডিং ও কাউট্স্কির মতন সোশ্যাল্-ডেমক্রাটেরা—এঁদের সকলেরই ধারণা যে ধনিকতন্ত্রের মধ্যেই এক নিয়ন্ত্রণ-শক্তি উদ্ভূত হচ্ছে, একই ধনিকগোষ্ঠির হাতে চূড়ান্ত-কর্তৃত্ব এসে পড়তে পারে এবং নানাদেশীয় ধনিকের মধ্যে স্বাভাবিক বিরোধের কথা মাঝে মাঝে অন্ততঃ অনেকখানি কল্পিত। সাম্রাজ্যতন্ত্রের সাম্প্রতিক ইতিহাস বিশ্লেষণে কিন্তু এ-ধারণা অমূলক মনে হয়। যে-ভাববাদীরা যুদ্ধবৃত্তিকে শাসকদের মস্তিষ্ক-বিকৃতি মাত্র মনে করেন, দুর্ভাগ্যক্রমে তাঁরা ভুলে যান যে স্বার্থের সঙ্ঘাত অতি বাস্তব এবং ধনতন্ত্রের কল্যাণে তার উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হচ্ছে। যুদ্ধে অনেক সময় প্রকৃতই প্রভূত ব্যক্তি ও শ্রেণীগত লাভের সম্ভাবনা থাকে, আবার পূর্ব্বার্জ্জিত লাভ বজায় রাখতেও যুদ্ধের প্রয়োজন হয়। ধনতন্ত্রের পথে সকল দেশ সমান অগ্রসর নয়, সকল জাতির আর্থিক সম্পদ সমান হ'তে পারে না, প্রসারচেষ্টা ধনিক-ব্যবস্থার স্বাভাবিক নিয়ম—অসন্তুষ্ট অতৃপ্ত রাষ্ট্রের অস্তিত্ব তাই দেখা যায়, এবং বর্ত্তমান আর্থিক ব্যবস্থার মধ্যে তাদের লক্ষ্যসাধন হ'তে পারে শুধু অন্যদের অভাব-অভিযোগ বাড়িয়ে। একটি বিরাট রাষ্ট্র যে অন্যদের দাবিয়ে রাখতে পারবে, রাসেলের এ-বিশ্বাসও অসঙ্গত মনে হয়। একা বিধ্বস্ত জার্ম্মানিকে পর্য্যন্ত বেশী দিন চেপে রাখা সম্ভব হয় নি। জগদ্ব্যাপী আল্ট্রা-ইম্পিরিয়ালিজ্ম্, সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যতন্ত্র, তাই অলীক স্বপ্ন মাত্র। ধনতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের পরিধির মধ্যে জগতে যুদ্ধ বিগ্রহ অতি স্বাভাবিক ব্যাপার বলে'ই মনে হয়।

অধ্যাপক জিমার্ণ্‌ সম্প্রতি দেখিয়েছেন যে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ-স্থাপনের সময় একটা প্রস্তাব এসেছিল যে, যুদ্ধের সময় যে-মিত্রপক্ষীয় পরিচালক-সমিতির সর্ব্বময় কর্ত্তৃত্ব গড়ে' উঠেছিল, যুদ্ধান্তেও সেই সমিতির পরিবর্দ্ধিত এক সংস্করণ আন্তর্জ্জাতিক বাণিজ্য নিয়ন্ত্রিত করুক। আমেরিকা তৎক্ষণাৎ এই প্রস্তাবে অসম্মত হ'ল। এই অসম্মতিই সাম্রাজ্যবাদের প্রাণের কথা। বড় রাষ্ট্রগুলির প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিশ্বরাষ্ট্রের অনুরূপ কিছু গড়ে' উঠবার পরিপন্থী; কোনও একটি শক্তি কিম্বা একদল রাষ্ট্র বেশীদিন অন্যদের চেপে রাখতেও পারে না। সুতরাং বর্ত্তমান আর্থিক ও রাষ্ট্রিক অবস্থায় কার্য্যকরী বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের সম্ভাবনাও সুদূরপরাহত। কার্য্যক্রমের স্বাধীনতা সীমাবদ্ধ হবার সম্ভাবনা মাত্র যুক্তরাষ্ট্রকে সঙ্ঘের বাইরে রাখল। তারপর নিজের স্বেচ্ছাচারের প্রতিবাদ হওয়ামাত্র জাপান সঙ্ঘ ত্যাগ করে এবং যথেচ্ছ আচরণের সুবিধার জন্য জার্ম্মানিও এখন তার অনুসরণ করেছে।

কিন্তু সংকীর্ণতর পরিধির মধ্যে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘেরও আংশিক সার্থকতা থাকতে পারে। ধনতন্ত্রের দিক থেকে দেখলে, যুদ্ধান্তে এর সাহায্যে খানিকটা বিশৃঙ্খলতা নিবারণ সম্ভবপর ছিল—তাই প্রথমে জেনীভার প্রতিষ্ঠানটিকে এই ভাবেই ব্যবহার করা হয়। যে-বিবাদে বড় কোন রাষ্ট্র লিপ্ত নয়, তার সমাধান লীগ্‌ সহজেই করতে পেরেছে, আর সে-লাভও একেবারে উপেক্ষণীয় নয়। জনসাধারণের দিক থেকে দেখতে গেলে, আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার অভ্যাসও মঙ্গলজনক। আর শান্তিরক্ষার প্রচেষ্টাতে এ-প্রতিষ্ঠানকে কিছুদূর পর্য্যন্ত ব্যবহার করা যেতে পারে, এর সাহায্যে

যুদ্ধাগমনের পথে কিছু বাধা-সৃষ্টিও অসম্ভব না। এই শেষ উদ্দেশ্যে সোভিয়েট্-রাশিয়া ১৯৩৪ সালে লীগে প্রবেশ করে।

ব্যক্তিগত হিসাবে প্রেসিডেন্ট্ উইল্সনের শ্রেষ্ঠ কীর্ত্তি বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ স্থাপন, কিন্তু তাঁকে কাজ করতে হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী নানা স্বার্থের বড় ক্ষেত্র এড়িয়ে ক্ষুদ্র পরিধির মধ্যে। সঙ্ঘ-স্থাপন সম্পর্কীয় আলোচনার সময় সোভিয়েট্-সচিব চিচেরিন্-এর চিঠি (অক্টোবর্, ১৯১৮) এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। নূতন প্রতিষ্ঠানের অনুকূল আবহাওয়া সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তাঁর চারটি প্রস্তাব ছিল—নির্ব্বিচারে সকল জাতির আত্মকর্ত্তৃত্বের অধিকার স্বীকার, সকল দেশের একত্র অস্ত্রত্যাগ, অর্থদণ্ড ও সমরঋণ আদায়ের সকল দাবী বর্জ্জন এবং ধনিকদের আধিপত্য নাশ। কিন্তু সমাজের আমূল পুনর্গঠন ব্যতীত এ-প্রস্তাব গৃহীত হবার কোন সম্ভাবনাই ছিল না। শেষ পর্য্যন্ত, দায়িত্বগ্রহণে লাভের চাইতে ক্ষতির আধিক্য আশঙ্কায়, যুক্তরাষ্ট্র সরে' দাঁড়ালে, ফ্রান্স্ রাষ্ট্রসঙ্ঘকে শুধু ভের্সায়ি-ব্যবস্থার রক্ষকে পরিণত করতে চায়, আর ইংল্যাণ্ড্ চাইল জেনীভা যাতে হয় আন্তর্জ্জাতিক আলাপ আলোচনার ক্ষেত্র মাত্র।

ভের্সায়ির ব্যবস্থা কাজে আসা মাত্র, অর্থাৎ ১৯২০র প্রথম থেকে, বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ পূর্ব্বস্বীকৃত কভেনাণ্ট্ বা বিধানপত্র অনুসারে স্থাপিত হ'ল। এর সভ্যপদভুক্ত রাষ্ট্রগুলি অবশ্য তাদের স্বাধীনতা বিসর্জ্জন দেয়নি—সত্যিকারের যে-কোনও বড় সিদ্ধান্তের বেলায় প্রত্যেকের সম্মতির প্রয়োজন এবং পদত্যাগ করবার অধিকার তার প্রমাণ। তবে সন্ধি দ্বারা

যেমন রাষ্ট্রমাত্রই নিজের অধিকার সীমাবদ্ধ করে, এক্ষেত্রেও তেমনি জগতের মঙ্গলের জন্য পৃথিবীর প্রায় সকল দেশ স্বেচ্ছাচার খর্ব্ব করবার নানা অঙ্গীকারে আবদ্ধ হ'ল। তারপর যতদিন না সাম্রাজ্য-তন্ত্রের অন্তর্নিহিত নিয়মের তাড়নায় বড় রাষ্ট্রগুলির সঙ্ঘাত আবার প্রাক্‌সামরিক তীব্রতায় পরিণত হয়, ততদিন রাষ্ট্রসঙ্ঘও খানিকটা সাফল্য লাভ করে। যে-সময়টুকু ইউরোপে ফরাসী-জার্মান্ সদ্ভাব আর সুদূর-প্রাচ্যে ওয়াশিংটনের ব্যবস্থা শান্তিরক্ষায় সমর্থ হয়, ঠিক সেই সময়টি, অর্থাৎ ১৯২৩ থেকে ১৯৩০ পর্য্যন্ত, রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিপত্তির যুগ।

মহাশক্তিগুলির পারস্পরিক সম্বন্ধের উপর সুতরাং রাষ্ট্রসঙ্ঘের স্বরূপ নির্ভর করে। কিন্তু কাগজে-কলমে যে-অঙ্গীকারগুলি দেওয়া হয়েছিল, তাদের ব্যাপ্তি নিতান্ত সামান্য নয়। এখনও প্রতিদেশে শান্তিবাদীদের পক্ষে এই প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য নিজ নিজ রাষ্ট্রশক্তির উপর চাপ দেওয়া সম্ভব। এড়াবার শত চেষ্টা সত্ত্বেও কভেনাণ্টের দশম ধারার নির্দ্দেশ এখনও ন্যায্যতঃ বিদ্যমান—এতে প্রত্যেক রাজ্যের অখণ্ডতা ও রাষ্ট্রিক স্বাধীনতা মেনে চলা এবং রক্ষা করবার দায়িত্ব-ও অন্য সভ্যেরা সকলে গ্রহণ করেছে। দ্বাদশ ধারা-অনুসারে সকল সভ্য অঙ্গীকারবদ্ধ হ'ল যে বিবাদ উপস্থিত হ'লে বলপ্রয়োগ না করে' শান্তভাবে কলহ-নিষ্পত্তির চেষ্টা করতে হবে। তিন জাতীয় নিষ্পত্তি নির্দ্দিষ্ট হয়েছে—কোনও প্রকার সালিসীর আশ্রয়, হেগ্ নগরীস্থ আন্তর্জ্জাতিক বিচারালয়ের নির্দ্ধারণ অথবা স্বয়ং লীগ্ কাউন্সিল্ কর্ত্তৃক মিটমাটের চেষ্টা। এরূপ নিষ্পত্তির প্রয়াস না করে', কিম্বা

সে-উদ্যম ব্যর্থ হ'লে তারপর ছ'মাস অতিক্রান্ত হবার আগে, কারও যুদ্ধ করবার বৈধ অধিকার থাকল না। এই নিয়ম-ভঙ্গের শাস্তিস্বরূপ ষোল ধারায় কয়েকটি দণ্ড বিধান আছে। দোষী রাষ্ট্রের সহিত অন্য সকলে আর্থিক ও সর্ব্ববিধ যোগাযোগ ছিন্ন করতে বাধ্য; প্রয়োজনানুসারে সঙ্ঘের নির্দ্দেশে তার বিরুদ্ধে বল-প্রয়োগও চল্‌তে পারে। সহজেই বোঝা যায় যে এ-ব্যবস্থা কার্য্যকরী হ'তে হ'লে প্রবল রাষ্ট্রগুলি একজোট হওয়া আবশ্যক। দোষী রাষ্ট্র স্বয়ং শক্তিশালী হ'লে, এবং অন্য তু-একটি ক্ষমতাবান দেশের সহানুভূতি পেলে, তাকে দমন করবার সম্ভাবনাও কমে আসে। ১৯৩৫এ ইটালি-আবিসিনিয়ার ব্যাপারে এর প্রমাণ পাওয়া গেল। এর জন্য দায়ী সাম্রাজ্যতন্ত্রের রাষ্ট্র-ব্যবস্থা, রাষ্ট্রসঙ্ঘ নামক একটি প্রতিষ্ঠান নয়।

পৃথিবীর প্রায় ষাটটি স্বাধীন দেশের মধ্যে পঞ্চাশের উপর রাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগ দিল। বৎসরে অন্ততঃ একবার সঙ্ঘের সাধারণ-সভা জেনীভায় সম্মিলিত হয়—এই মহাসভায় ছোট বড় সকল দেশেরই এক এক ভোট। ইংরাজ-ডোমিনিয়ান্‌গুলি এবং ভারতবর্ষ পর্য্যন্ত পূর্ণ স্বাধীন না হ'য়েও প্রথম থেকে সভ্যরূপে গণ্য হ'ল। এ-ছাড়া প্রয়োজনানুসারে সঙ্ঘের একটি ছোট কর্ম্ম-সমিতির বৈঠক হয়। সেখানে প্রত্যেক মহাশক্তির স্থায়ী আসন আছে এবং তাছাড়া অন্য কয়েকটি প্রতিনিধি প্রতি বৎসর সাধারণ-মহাসভা কর্ত্তৃক নির্ব্বাচিত হয়। এই কাউন্সিল্‌ বা সমিতিই অধিকাংশ ক্ষেত্রে সঙ্ঘের প্রতীক। এ-ছাড়া জেনীভাতে সঙ্ঘের কার্য্যালয় নানাদেশীয় কর্ম্মচারী নিয়ে গঠিত হ'ল। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে

নিখিল-বিশ্ব লেবার্-অফিস্ উল্লেখযোগ্য। তার বার্ষিক অধিবেশনে প্রতিদেশ থেকে শ্রমিক ও ধনিকদের প্রতিনিধি যাবার কথা।

শান্তির সময় আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার প্রসারকার্য্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘ অনেকখানি সাফল্য লাভ করেছে। দুর্গত অস্ট্রিয়াকে লীগের চেষ্টাতেই অর্থ-সাহায্যের দ্বারা পায়ের উপর দাঁড় করানো হ'ল (১৯২২—১৯২৬)। হাঙ্গারিও অনুরূপ সাহায্য পায় ১৯২৪ থেকে ১৯২৬ পর্য্যন্ত। এশিয়া-মাইনর্ থেকে বিতাড়িত গ্রীক্‌দের এবং পূর্ব্ব-ইউরোপে দুর্ভিক্ষ-প্রপীড়িতদের ভার গ্রহণ করে' লীগ্ অনেকের উপকার করেছিল নিশ্চয়। সার্‌জেলায় ও ডান্‌সিগ্ নগরীতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের শাসনকে নিরপেক্ষ বলে' প্রশংসা করাও উচিত। স্বাস্থ্যোন্নতির জন্য তথ্যসংগ্রহ, মহামারীর প্রকোপ সীমাবদ্ধ করার প্রচেষ্টা, পৃথিবীর দুর্গম কোণেও দাসত্ব-উচ্ছেদের উদ্যম, দেশদেশান্তরে গমনাগমনের সুবিধা বর্দ্ধন—সঙ্ঘের এ-জাতীয় কাজও মঙ্গলজনক।

রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার দিকেও সঙ্ঘের সামান্য কিছু সার্থকতা দেখা গেল। ম্যাণ্ডেট্‌গুলির শাসন সম্বন্ধে অন্ততঃ সমালোচনার অধিকার একেবারে তুচ্ছ নয়। যুদ্ধান্তে প্রায় সকল নূতন রাজ্যে সংখ্যান্যূন সম্প্রদায় দেখা যায়—দেশের অধিকাংশ লোকের সঙ্গে তাদের জাতি,ধর্ম্ম কিম্বা ভাষাগত পার্থক্য আছে। ভের্সায়ির সন্ধিসর্ত্ত-অনুসারে তাদের কিছু বিশেষ অধিকার স্বীকৃত হয়। পূর্ব্ব-ইউরোপে সংখ্যান্যূন সম্প্রদায়দের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হ'ল যে তাদের ধর্ম্ম বা ভাষার স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত কোন অধিকার খর্ব্ব হবে

না। রাষ্ট্রসঙ্ঘের উপর ভার পড়ে এই ব্যবস্থা-পরিদর্শনের। আন্তর্জ্জাতিক শান্তিরক্ষার সঙ্গে এই কাজের অবশ্য সবিশেষ যোগ। কিন্তু এ-ব্যবস্থার একটা দোষও ছিল। স্বাতন্ত্র্য-রক্ষার প্রবল উৎসাহে এই সম্প্রদায়গুলি বিদেশের মুখাপেক্ষী হ'য়ে পড়লে, তারা স্বদেশের ঐক্য-বর্দ্ধনের পরিপন্থী হ'য়ে দাঁড়াতে পারে। অবশ্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের পরিদর্শন শেষ পর্য্যন্ত স্বভাবতঃই কার্য্যকরী হ'ল না। জাতীয় ও সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ এভাবে প্রশমিত হওয়া দূরে থাকুক, প্রবলতর হ'য়ে এখন পর্য্যন্ত পূর্ব্ব-ইউরোপে শান্তিভঙ্গের উপক্রম করছে।

বড় রাষ্ট্রের স্বার্থ যেখানে ব্যাহত হয়নি, এমন কতকগুলি বিরোধও রাষ্ট্রসঙ্ঘ মিটিয়ে ফেলেছিল। উদাহরণ-হিসাবে আলাণ্ড্ দ্বীপের অধিকার নিয়ে ফিন্‌ল্যাণ্ড্ ও সুইডেনের বিবাদ, আল্‌বানিয়াকে যুগোস্লাভিয়ার ভয়-প্রদর্শন এবং গ্রীক্ ও বুল্‌গার্‌দের সীমান্ত নিয়ে ঝগড়া—ইত্যাদি ঘটনার উল্লেখ করা যায়। কিন্তু বড় শক্তি কাউকে আটকানো স্বভাবতঃই প্রথম থেকে শক্ত প্রতিপন্ন হ'ল। ১৯২০তে পোল্যাণ্ড্ সবলে ভিল্‌না অধিকার করলে' রাষ্ট্রসঙ্ঘকে শেষ পর্য্যন্ত সে-ব্যবস্থা মেনে নিতে হয়েছিল। গ্রীসের সামান্য ত্রুটির প্রতিবাদে, ১৯২৩-এ ইটালি কর্ফু দ্বীপে গোলাবর্ষণ করে এবং এ-অনাচারেরও কোন প্রতিবিধান সঙ্ঘের শক্তিতে কুলায় নি।

সব শেষে অস্ত্রসজ্জার সীমা-নির্দ্দেশ অথবা নিরস্ত্রীকরণের কথাও বলা উচিত। কভেনাণ্টে অষ্টম ধারায় অস্ত্রত্যাগের অঙ্গীকার আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে অঙ্গীকার-প্রতিপালনের কোনও সময় নির্দ্দেশ ছিল না। তাই প্রথম থেকেই এ-

বিষয়ে সকল জল্পনাই ব্যর্থ হ'তে লাগ্‌ল। তার মূল কারণ অবশ্য এই যে, অস্ত্রবর্জ্জন মানেই সাম্রাজ্যতন্ত্রের মূল প্রকৃতি পরিবর্ত্তন। শক্তিশালী সাম্রাজ্যগুলির মোটেই সে-অভিপ্রায় ছিল না। প্রথমে আপত্তি উঠ্‌ল এই যে, অস্ত্রত্যাগের আগে আকস্মিক আক্রমণ থেকে পরিত্রাণের ব্যবস্থার প্রয়োজন। ১৯২৩এ ফ্রান্স্‌কে আশ্বাস দেবার জন্য প্রস্তাব হ'ল যে কোনও দেশ আক্রান্ত হওয়া মাত্র অন্য সকলে তৎক্ষণাৎ সাহায্য পাঠাবার অঙ্গীকারবদ্ধ হবে। কিন্তু যুদ্ধের সময় কে প্রকৃত আততায়ী তার নির্দ্ধারণ কঠিন বলে' ইংল্যাণ্ড্‌ প্রভৃতি এতে রাজি হ'ল না। তারপর ম্যাক্‌ডোনাল্ড্‌ ও এরিও মিলিত হ'য়ে ১৯২৪এ জেনীভা-প্রোটোকল্‌ খাড়া করেন—এ-যুগে শান্তি-সংস্থাপনের এ-ই হ'ল শ্রেষ্ঠ উদ্যম। সে-প্রস্তাব অনুসারে বিবাদের সময় যে-দেশ সালিসী প্রভৃতি শান্তিসঙ্গত উপায়ের আশ্রয় অস্বীকার করবে, তাকেই তৎক্ষণাৎ আততায়ীরূপে গণ্য করে' অন্য সকলে অপর পক্ষকে সাহায্য পাঠাবে। তখন ইংরাজ সাম্রাজ্যবাদীদের আবার শান্তিরক্ষার আয়োজন পণ্ড করবার পালা এল। ম্যাক্‌ডো-নাল্ডের পদত্যাগের পর, বল্‌ড্‌উইনের মন্ত্রিসভা অন্যদেশকে প্রস্তাবিত সাহায্য পাঠাবার এ দায়িত্বটুকুও অস্বীকার করাতে, জেনীভা-প্রোটোকলের অকাল মৃত্যু ঘট্‌ল (১৯২৫)। তার পরই অবশ্য লোকার্নোর ব্যবস্থাকে লীগ্‌ অনুমোদন করে। কিন্তু পূর্ব্বে দেখানো হয়েছে যে তার পরিধি অনেক সঙ্কীর্ণ এবং তার মধ্যে ফাঁক রইল অনেক বেশী।

অস্ত্রত্যাগ-আলোচনার ভূমিকাতেই এই ভাবে গলদ থেকে যায়। তবুও ১৯২৫ থেকে রাষ্ট্রসঙ্ঘ যথাসাধ্য সে-আলোচনায়

প্রবৃত্ত হ'ল। ১৯২৭এ সোভিয়েট্-প্রতিনিধি লিট্ভিনভ্ সমস্ত যুদ্ধসজ্জার আমূল বর্জ্জন প্রস্তাব করে' সকলকে চমকিত করলেন। আর তখনই অবশ্য দেখা গেল যে শক্তিশালী রাষ্ট্রেরা কেউ এতে রাজি নয়। সাম্রাজ্যতন্ত্রের স্বরূপ এই প্রসঙ্গে আর একবার চোখে পড়ে। বহু আয়াসের পর যখন ১৯৩২এ অস্ত্রত্যাগ-বৈঠকের মহাসম্মেলন হয় ততদিনে পৃথিবীর অবস্থার বিশাল পরিবর্ত্তন হ'য়ে নিরস্ত্রীকরণের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত প্রায় মিলিয়ে এসেছে।

মার্ক্স্, এঙ্গেল্‌স্ ও লেনিন্

ইউরোপের সাম্প্রতিক ইতিহাস ১৯১৭ সালের রুষ-বিপ্লব থেকে আরম্ভ করা কিছু অন্যায় না। এই বিপ্লবের পিছনে একটা বিশিষ্ট মতবাদ ও এক দীর্ঘ আন্দোলন ছিল। সে-মতবাদ এবং প্রচেষ্টা উভয় অর্থেই কমিউনিজ্‌ম্ অথবা সাম্যবাদ কথাটির ব্যবহার আছে। উভয়কেই রূপ দিয়েছিলেন কার্ল্ মার্ক্স্ ও তাঁর আজীবন সহকর্ম্মী ফ্রিড্‌রিশ্ এঙ্গেল্‌স্। তাঁদের মৃত্যুর বহু পরে সেই সাধনা আজকের ইউরোপে এক প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণত হয়েছে; এমন কি তার প্রতিক্রিয়া-হিসাবেই ফাশিজ্‌ম্এর উৎপত্তি। রুষ-বিপ্লবের নেতা লেনিনের প্রধান কীর্ত্তি,—মার্ক্স্‌বাদের প্রকৃত রূপ হৃদয়ঙ্গম করে' তার উপযুক্ত প্রয়োগ। মার্ক্সের চিন্তা ও কর্ম্মের সঙ্গে তাই পরিচয় না থাকলে আধুনিক ইতিহাস বোঝা অসম্ভব।

সাম্যের স্বপ্ন পৃথিবীতে চিরকালই চলে এসেছে, প্রতি যুগেই চিন্তাশীল লোকে বৈষম্যবিহীন সমাজের আদর্শ এঁকেছেন; কিন্তু বাস্তবের সঙ্গে যোগ না থাকায় ইতিহাসে এ-সব প্রাচীন কল্পনার বেশী সার্থকতা নেই। ধনতন্ত্রের প্রভাবে আর্থিক সম্পদ ও ক্ষমতার বৈষম্য অত্যধিক হ'য়ে ওঠার পরই প্রথম সমাজতন্ত্রবাদ বা সোশ্যালিজ্‌ম্ মূর্ত্ত প্রশ্নের রূপ নিল। তার আক্রমণের লক্ষ্য হ'ল ধনতন্ত্রের প্রধান অঙ্গগুলি। প্রতিযোগিতায় সামাজিক শক্তির অপচয়,

একচেটিয়া কর্ত্তৃত্ব যেখানে সম্ভবপর সেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থের খাতিরে তার অপব্যবহার, মুষ্টিমেয় লোকের হাতে আর্থিক প্রভুত্বের সমাবেশ, শুধু মালিকদের লাভের জন্যই পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন, অর্থবলের কল্যাণে মাত্র এক শ্রেণীর লোকেদের জীবন উপভোগ করবার উপায়, জনসাধারণের ভাগ্যে আজীবন পরিশ্রমের পরিবর্ত্তেও কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ—ধনতন্ত্রের এই বিবিধ অমঙ্গল বর্জ্জন করে' আর্থিক সমানাধিকার-সম্বলিত নূতন-সমাজগঠনের আদর্শ তখন অনেককে আকৃষ্ট করতে লাগ্‌ল।

পূর্ব্বগামী সোশ্যালিস্ট্‌দের মার্ক্স্ ইউটোপীয় বা অবাস্তব আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁরা বৈষম্যবর্জ্জিত আদর্শ সমাজের স্বপ্ন দেখলেও সেদিকে অগ্রসর হবার উপযুক্ত পথ বা কর্ম্ম-প্রণালী দেখাতে পারেন নি। তা'ছাড়া তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল সম্পূর্ণ ভাবপ্রবণ।—অতীতের স্বর্ণযুগ ও প্রকৃতির মঙ্গল-ময়তায় তাঁদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল। তাঁরা ভাবতেন যে মানুষ শুধু বুদ্ধির দোষেই শুভ প্রাকৃতিক বিধান ত্যাগ করে' দুঃখে নিমগ্ন হয়েছে। সুতরাং কেবল ন্যায়বুদ্ধির সাহায্যেই আবার সত্য মঙ্গলের আদর্শকে ফিরিয়ে এনে দুঃখমোচন সম্ভব। শান্ত অহিংস প্রচার-কার্য্যের তাই প্রয়োজন, পশুবল উপদ্রব মাত্র। প্রচারের ফলে ও প্রকৃত শিক্ষার গুণে ধীরে ধীরে কঠিন হৃদয় দ্রব এবং অজ্ঞান-তিমির অপসারিত হবে। তখন নূতন সমাজের আদর্শ আপনা থেকেই জয়যুক্ত হ'তে বাধ্য।—স্পষ্টই বোঝা যায় যে ইউটোপীয় সোশ্যালিজ্‌ম্-এর সঙ্গে ধর্ম্মবিশ্বাসের একটা আন্তরিক যোগ আছে, যদিও এর নেতারা অনেকে প্রচলিত ধর্ম্মে আস্থাবান ছিলেন না। যে-

আঠারো শতকের যুক্তিবাদ থেকে এর উৎপত্তি ঐতিহাসিক সম্বার্ট্ সবিস্তারে দেখিয়েছেন, তার মূল বিশ্বাস হ'ল প্রকৃতির চিরন্তনী শুভ বিধানের অস্তিত্ব, মূর্খতার দোষে মানুষের তার থেকে বিচ্যুতি এবং যুক্তি দিয়ে পূর্ব্বাবস্থার পুনরুদ্ধারের সম্ভাবনা।

মার্ক্স্ দেখ্‌লেন যে তাঁর পূর্ব্বগামীরা বুঝতে চান নি যে ইতিহাসে একটা ক্রমবিকাশ আছে, তদনুসারে মানুষের অবস্থা ও ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন হ'য়ে থাকে, সামাজিক ইতিহাস পাপের দোষে স্বর্গ থেকে বিদায় এবং পুণ্যের জোরে স্বর্গে পুনঃপ্রবেশের কাহিনী নয়। তাঁর মনে হ'ল যে নূতন-সমাজ গঠনের বাধা অজ্ঞানান্ধকার নয়, ধনিকদের স্বার্থ মাত্র, কারণ বর্ত্তমান ব্যবস্থায় সম্পত্তিবান শ্রেণীর সন্তুষ্ট থাকবার যথেষ্ট হেতু আছে। পরিবর্ত্তন তাই আসতে পারে তাদেরই উদ্যমে যারা শ্রমিক হিসাবে সমাজ-ব্যবস্থার খারাপ ফলটাই ভোগ করছে, এবং সে-পরিবর্ত্তনে ধনিক ও সংশ্লিষ্ট শ্রেণীগুলি স্বার্থের খাতিরে বরাবরই বাধা দেবে। নৈরাশ্যের বদলে মার্ক্সের মনে কিন্তু আশা এল; কারণ ক্রমবিকাশের একটা ধারা তাঁর মাথায় রূপ নিচ্ছিল যার প্রভাবে বিশ্বাস হওয়া আশ্চর্য্য নয় যে শ্রমিক-বিপ্লব অনিবার্য্য। সেই বিপ্লবের ফলেই শ্রেণীবর্জ্জিত সমাজ গড়ে' উঠবে, সাম্যবাদের এই হ'ল মূল বিশ্বাস।

ইতিমধ্যেই যন্ত্রশিল্পের প্রভূত প্রসারে শ্রমিক-অসন্তোষ দেশে দেশে দেখা দিয়েছিল। ইউটোপীয়েরা এর প্রকৃত তাৎপর্য্য ধরতে পারেন নি—রবার্ট্ ওয়েনের চার্টিস্ট্‌দের সঙ্গে অসহযোগ তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ। শ্রমিকেরাও কিন্তু

নিষ্ফল আক্রোশে শক্তি ক্ষয় করছিল—কোন নির্দ্দিষ্ট পথ তারা তখনও খুঁজে পায় নি। ইংরাজ চার্টিস্ট্‌দের বৃথা আস্ফালন ও ফরাসী কারিগরদের অযথা দাঙ্গায় মৃত্যু-বরণ তার উদাহরণ। মার্ক্স্‌ ও এঙ্গেল্‌সের জীবনের প্রধান কাজ হ'ল সোশ্যালিজ্‌মের নূতন রূপ সাম্যবাদের সঙ্গে শ্রমিক-আন্দোলনের সংযোগস্থাপন। এর প্রভাব সহজেই অনুমেয়। স্টালিনের ভাষায় বলা যায় যে, ব্যবহার-বর্জ্জিত থিওরি বন্ধ্যা আর মতবাদশূন্য প্র্যাক্‌টিস্‌ অন্ধ আচরণ মাত্র। তাই মার্ক্স্‌বাদের অভ্যুদয়ের ফলে, একদিকে বৈষম্যহীন সমাজের পরিকল্পনা শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত হ'য়ে পড়ল, আর অন্যদিকে ধনতন্ত্রের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের আক্রোশ এতদিনে একটা নির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম-পদ্ধতি খুঁজে পেল।

মার্ক্স্‌ ও তাঁর সহযোগীর জীবনবৃত্তান্ত এখানে অপ্রাসঙ্গিক। প্রায় ছাত্রাবস্থায় তাঁরা জার্মানিতে রাষ্ট্রিক আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন এবং প্রাণভয়ে তাঁদের ইংল্যাণ্ডে আশ্রয় নিয়ে সেখানেই সারা জীবন কাটাতে হয়। তার পূর্ব্বেই ১৮৪৭এর শেষে সাম্যবাদের ঘোষণা পত্রিকায় তাঁরা নিজেদের বিশিষ্ট মতামত লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তারপর বহুকাল ধরে' সে-মতবাদের প্রসার ও প্রচারে তাঁদের সময় কাটে। জার্মানে লেখা তাঁদের রচনা প্রথমতঃ সেদেশেই সাড়া পায়। ইংল্যাণ্ডে তখন ভিক্‌টোরীয় সমৃদ্ধির যুগে তাঁদের সমাদর না হবারই কথা। ডাস্‌ কাপিটাল্‌ গ্রন্থরচনা মার্ক্সের শেষ জীবনের প্রধান কীর্ত্তি, কিন্তু সাম্যবাদ বুঝতে বোধ হয় তাঁর ছোট ছোট পুস্তিকাগুলিই বেশী সাহায্য করে। কিন্তু মার্ক্স্‌কে শুধু ব্রিটিশ্‌ মিউজিয়ামে অধ্যয়নরত

পণ্ডিত হিসাবে দেখা উচিত নয়। তিনি সমসাময়িক শ্রমিক-আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনিই প্রথম (১৮৬৪ সালে) আন্তর্জ্জাতিক শ্রমিক-প্রতিষ্ঠান স্থাপনা করেন। পরে বাকুনিনের সঙ্গে মার্ক্সের তীব্র মতভেদের ফলে এই সভা ছিন্ন ভিন্ন হ'য়ে যায়। বাকুনিন্‌ আধুনিক নৈরাজ্যবাদ বা এনার্কিজ্‌ম্‌-এর জনক। সেই থেকে মার্ক্স্‌বাদী ও বাকুনিন্‌-পন্থীদের প্রকাশ্য ও গোপন বিবাদ আজ পর্য্যন্ত চলে এসেছে। পরবর্ত্তী ইতিহাসের দিক থেকে মার্ক্সের চিন্তা বা কর্ম্মধারায় একটা বৈশিষ্ট্য প্রথমেই উল্লেখযোগ্য। সারা জীবন তিনি দুই শত্রুর সঙ্গে সংগ্রাম করে' চলেছিলেন—একদিকে অতিমাত্রায় সাবধানী রক্ষণশীলতা এবং অন্যদিকে অধীর ভাববিলাসের অতি দ্রুত অগ্রসর-আকাঙ্ক্ষা। লেনিন্‌ ও স্টালিন্‌কেও পরে এই দুই শত্রুর সঙ্গে অনেক লড়তে হয়েছিল।

মার্ক্স্‌বাদের প্রাণবস্তু একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী, তাকে ডায়ালেক্‌টিক্‌ আখ্যা দেওয়া হয়। এই ডায়ালেক্‌টিক্সের উৎপত্তি একদিকে আদর্শবাদের শীর্ষস্থানীয় হেগেলের চিন্তাপ্রণালী ও অন্যদিকে জড়বাদের মূল দার্শনিক বিশ্বাসের মধ্যে। বিশ্বসংসারকে স্থিতিশীল না ভেবে ক্রমবিবর্ত্তনের নিয়মানুগ মনে করা হেগেলের বিশেষত্ব ছিল—সেই পরিবর্ত্তনের মূলসূত্রকে তিনি প্রাচীন গ্রীক্‌ বাদানুবাদ-পদ্ধতির স্মরণেই বোধ হয় ডায়ালেক্‌টিক্স্‌ নাম দেন। ভাববাদী হেগেলের কাছে ক্রমবিকাশ ছিল অবশ্য শুধু আইডিয়ারই রূপান্তর। শিষ্যস্থানীয় মার্ক্স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌ কিন্তু জড়বাদের মূল বিশ্বাস—বিদেহী জ্ঞানের আগে জড়বস্তুর অস্তিত্ব—ত্যাগ

করতে পারলেন না। অথচ পুরাতন জড়দর্শন তাঁদের কাছে অত্যন্ত যান্ত্রিক মনে হচ্ছিল—নূতন কিছুর উদ্ভবের সঙ্গত ব্যাখ্যা তার মধ্যে তাঁরা পেলেন না। এইজন্য হেগেলের ডায়ালেক্‌টিক্ দৃষ্টিভঙ্গী তাঁরা জড়বাদের মধ্যে এনে তাকে নূতন রূপ দিলেন। তাই পরমমনের আইডিয়ার ক্রমবিকাশের বদলে প্রকৃত বস্তুর বিবর্ত্তন-বিশ্বাস হ'ল মার্ক্স্‌দর্শনের গোড়ার কথা। বস্তুর এই ব্যাপক সংজ্ঞার মধ্যে অবশ্য জীবের মানসিক ক্রিয়ারও স্থান রইল। হেগেলের সঙ্গে মার্ক্সের তফাৎ জগতের মূলবস্তু নিয়ে, তাঁদের মিল ক্রমবিকাশের স্বরূপ সম্বন্ধে বিশ্বাসে। সেই পরিবর্ত্তনধারাকে থিসিস্, অ্যান্টিথিসিস্ ও সিন্‌থেসিস্ নাম দেওয়া হয়েছে।

মার্ক্স্‌দর্শনের সত্যাসত্য যাই হোক না কেন, তার বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী বোঝা বিশেষ শক্ত নয়। এ-মত অনুসারে বিশ্লেষক ব্যাপক দৃষ্টির কাছে চিরস্থিরতা নেই, মানুষের সকল বিধি-ব্যবস্থা, প্রতিষ্ঠান, এমন কি আইডিয়ার ক্ষেত্রেও একটা গতি লক্ষিত হয়। এই পরিবর্ত্তনের বীজ বস্তুর মধ্যেই অন্তর্নিহিত পরস্পরবিরোধী শক্তির সঙ্ঘর্ষ মাত্র; কিন্তু বিবর্ত্তন বা এভলিউশন্ আকস্মিক ও লক্ষ্যহীন নয়—তার একটা, বস্তুটির নিজস্ব গড়ন-অনুযায়ী, বিশেষ ঝোঁক থাকাই স্বাভাবিক। বিবর্ত্তন প্রণালীর ধাঁচ হচ্ছে বস্তুবিশেষের অবস্থান, অন্তর্নিহিত বিরোধী শক্তির সঙ্ঘাত, তারপর সামঞ্জস্য; সেই সমন্বয় থেকে আবার নূতন পরিবর্ত্তন-ধারার সূত্রপাত। একই সময়ে পরস্পর-বিরোধী শক্তির পরস্পরের মধ্যে অনুপ্রবিষ্ট হ'য়ে একত্র অবস্থান সম্ভব, কিন্তু পরিণামে

ভারসাম্য ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য, তাই বিরোধই হচ্ছে সামঞ্জস্যে অগ্রসর হবার উপায়—সেজন্য শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষের মধ্য দিয়ে এ ভাবে শ্রেণীভেদের অবসান হওয়া-ই সম্ভব। পরিবর্ত্তনের এই ধারা অনেকটা কম্বুরেখা বা স্পাইরালের মতন, বৃত্তাকার কিম্বা সরল রেখা নয়; অর্থাৎ বিবর্ত্তনের প্রতিপদেই উন্নতির সোপান অধিরোহণ হয় না, অথচ সিন্‌থেসিসের সময় আমরা ঠিক গোড়ার অবস্থায় ফিরে যাই না। গতির বেগ অবশ্য কখনও দ্রুত, কখনো বা মৃদুমন্দ; পরিবর্ত্তন কিন্তু অবিচ্ছিন্ন স্রোত নয়, স্তর থেকে স্তরান্তরে যাওয়াতে একটা উল্লম্ফন থাকে, সিন্‌থেসিসের মধ্যে নূতন কোন বিশিষ্ট গুণ বা কোয়ালিটি দেখা যায়—আর এই বিপ্লব ইতিহাসের অপরিহার্য্য অঙ্গ।

এঙ্গেল্স্ দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন যে এই ডায়ালেক্‌টিক্-গতি প্রকৃতি, ইতিহাস ও চিন্তাধারা তিন ক্ষেত্রেই উল্লেখযোগ্য। ইতিহাসচর্চ্চায় এই দৃষ্টিভঙ্গীকে নাম দেওয়া হ'ল ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা। কথায় যাই বলুন না কেন, ঐতিহাসিকমাত্রেই ইতিহাসের ধারার খোঁজ করেন এবং প্রতি ইতিহাস রচনার মধ্যে একটা দেখবার ধরণ বা মূল বিশ্বাস থাকতে বাধ্য। ভাববাদীরাও এ-নিয়ম থেকে বাদ পড়েন না। যান্ত্রিক জড়বাদের ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা এক বা একাধিক জড়বস্তু বা অবস্থার (খাদ্যের প্রকারভেদ, ভৌগোলিক সংস্থান প্রভৃতি) প্রভাবনির্ণয়ে পর্য্যবসিত হয়। এতে পরিবর্ত্তনের সঙ্গত ব্যাখ্যা দুঃসাধ্য হ'য়ে ওঠে, কারণ নির্দ্দিষ্ট জড়প্রভাব বহুকাল এক অবস্থায় থাকলেও ইতিহাসের গতি সেজন্য থেমে যায় না। মার্ক্স্‌বাদে ইতিহাসের মূলসূত্র

ধনোৎপাদনে মানুষের সঙ্গে মানুষের পরিবর্ত্তনশীল সম্বন্ধের মধ্যে। সেই সম্বন্ধ সমাজে ভিন্ন ভিন্ন স্তর অর্থাৎ শ্রেণীর রূপ নেয়। মার্ক্সের মতে বিভিন্ন শ্রেণীর ঘাতপ্রতিঘাত ও ক্রমবিকাশ ইতিহাসের মূলকথা। যুগবিশেষে সে-যুগের শ্রেণী-সম্বন্ধের উপরই তৎকালীন বিধি-ব্যবস্থা, আইন-কানুন, ধারণা-সমষ্টি ও পরিশীলন-সম্পদ গড়ে' ওঠে। বলা বাহুল্য যে শ্রেণী-সম্বন্ধ সমাজ-মন্দিরের ভিত্তি অথবা কাঠামো মাত্র, তার উপর বা মধ্যে বৈচিত্র্যের লীলাকে মার্ক্স্ কখনই অস্বীকার করেন নি। কিন্তু মূলসূত্রের সাহায্যে মার্ক্স্ ইউরোপের ইতিহাসে একটা পর্য্যায়ক্রম দেখতে পেলেন— যার প্রাণবস্তুই হ'ল শ্রেণীর উত্থান পতন অর্থাৎ শ্রেণী-সম্বন্ধের ক্রমবিকাশ। দাসত্বপ্রথা, ফিউডাল্-সমাজ এবং তারপর ধনতন্ত্রের প্রথমে পুষ্টিসাধন ও পরে ক্ষয়োন্মুখ অবস্থা— ইউরোপের ক্রমবিকাশ এই পথেই চলেছে। এর পর ধনতন্ত্রের পতন অথবা সোশ্যালিজ্‌মের আগমন তাই মার্ক্স্-পন্থীদের কাছে ইতিহাসের অতি-স্বাভাবিক পরিণতি ব'লেই মনে হ'ল। মার্ক্স্ একথা বলেন নি যে সে-পরিণাম হবেই হবে, কারণ ইউরোপীয় সভ্যতা ধ্বংস হ'য়ে যাবার সম্ভাবনাও তাঁর মনে উদয় হয়েছিল। কিন্তু ইতিহাসের স্বাভাবিক গতি এখন যে শ্রেণীশূন্য সমাজ-গঠনের দিকে, এ-সম্বন্ধে মার্ক্সের সন্দেহ ছিল না। তিনি একথাও বলেন নি যে, সোশ্যালিজ্‌ম মানুষের বিনা চেষ্টাতেই আপনা থেকে হাজির হবে। এ জাতীয় অদৃষ্টবাদের সঙ্গে শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষের থিওরির খাপ খায় না, একথা বলা বাহুল্য। মার্ক্সের বক্তব্য বরং এই যে, ধনতন্ত্রের অন্তর্নিহিত তাড়নাতেই সাম্যতন্ত্র

গড়ে' তুলবার চেষ্টা মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হবে।

দর্শন অথবা ইতিহাস ছেড়ে অর্থনীতি ও রাষ্ট্রচর্চ্চায় মার্ক্সের মূল বিশ্বাসের প্রয়োগই অবশ্য বেশী পরিচিত। ব্যক্তিবিশেষ যাই করুক না কেন, শ্রেণীবিশেষের অস্তিত্ব তার বিশিষ্ট স্বার্থের উপর নির্ভর করছে, সে-স্বার্থলোপ শুধু সেই শ্রেণীর লুপ্তির মধ্যে। সেইজন্য শ্রেণীভেদ থাকলে শ্রেণী-স্বার্থ এবং সেই সঙ্গে শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষও থাকতে বাধ্য। সীমারেখা স্পষ্ট না হ'লেও সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর পৃথক অস্তিত্ব নিঃসন্দেহ। বর্ত্তমান আর্থিক ব্যবস্থায় প্রধান প্রতিপক্ষ, ধনিক ও মজুর শ্রেণী ;—অন্য সকল শ্রেণী সংশ্লিষ্ট পার্শ্বচর মাত্র। ধনতন্ত্রের যুগে অন্য সামগ্রীর মতন শ্রমশক্তিও ক্রয় বিক্রয়ের বস্তু, কিন্তু এই ক্রীত শ্রমশক্তির সাহায্য ছাড়া নূতন ধনোৎপাদন অসম্ভব। সমগ্র সমাজের দিক থেকে দেখতে গেলে সুতরাং শ্রমশক্তিই পণ্যোৎপাদনের মূল। যদি কোনও কারণে শ্রম বন্ধ হ'য়ে যায় তাহলে সঞ্চিত মূলধনেরও কোন মূল্য থাকে না, একথা বোঝা শক্ত নয়। অর্থাৎ সঞ্চিত মূলধন কেবল নূতন শ্রমশক্তি ক্রয় করবার ক্ষমতা মাত্র। শ্রমিকের পারিশ্রমিক উৎপন্ন দ্রব্যের মূল্যের চাইতে কম ব'লেই মূলধনী মালিকের ব্যবসায় লাভ থাকে। কিন্তু এই অতিরিক্ত সম্পদ ন্যায্যতঃ ধনিকশ্রেণীর চাইতে সমস্ত সমাজেরই প্রাপ্য নয় কি? ধনতন্ত্রে ব্যক্তিগত লাভের জন্য প্রচলিত উৎপাদন-পদ্ধতিকে মার্ক্স্‌ তাই শোষণ আখ্যা দিলেন। তাঁর একথাও মনে হ'ল যে সকল স্টেট্‌ বা রাষ্ট্রই শ্রেণীবিশেষের স্বার্থরক্ষার উপায় মাত্র।

শ্রেণীভেদ যতদিন থাকে ততদিন সেখানে দেশ বা জাতির সম্মিলিত স্বার্থ শুধু কথার কথা এবং আসলে এ-ধারণা শাসকশ্রেণীর প্রভুত্বের আবরণ মাত্র। এই জন্যই মার্ক্স্ সকল দেশের শ্রমিকদের একজোট হ'তে আহ্বান করেছিলেন। সে-একত্রীকরণের পরিণতি শ্রমিক-বিপ্লবে, আর তখন ধনিকদের উচ্ছেদসাধনের পর শ্রেণীবর্জ্জিত সমাজ-গঠনই শ্রমিকদের বাঞ্ছিত মুক্তির একমাত্র উপায়। মার্ক্স্ তার নাম সাম্যতন্ত্র দিলেন, তাঁর মতে শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষের নিষ্পত্তি এইভাবে আসবে।

পূর্ব্বতন সমাজতন্ত্রবাদের থেকে মার্ক্স্-প্রচারিত সাম্যবাদের দুস্তর পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। পুরাতন ইউটোপীয় মতবাদগুলি এর কাছে এখন সম্পূর্ণ নিষ্প্রভ মনে হ'তে লাগ্‌ল। পরবর্ত্তী শ্রমিকনেতা সোশ্যালিস্টেরা তাই অধিকাংশই মার্ক্স্-পন্থী হিসাবে নিজেদের পরিচয় দিতেন। জার্মানির বিশাল সোশ্যাল্-ডেমক্রাট্ পার্টি গোঁড়া মার্ক্স্‌বাদী ব'লে নিজেদের গণ্য করে' গর্ব্ব অনুভব করত। কিন্তু কার্য্যতঃ তাদের মধ্যে বিপ্লব-চেষ্টার সাধনা ক্রমে ক্ষীণ হ'য়ে শান্তিপ্রিয় কর্ম্মপদ্ধতিতেই পর্য্যবসিত হ'ল। সেই থেকে পরে সোশ্যাল্-ডিমক্রাসির একটা বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী উদ্ভূত হয় যার সঙ্গে মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্‌সের চিন্তার ধরণের মিল ক্রমশঃ কমে আসে। প্রাক্‌সামরিক যুগে জার্মান্ পণ্ডিত কার্ল্ কাউট্‌স্কি দেশে বিদেশে মার্ক্স্‌বাদের প্রধান পুরোহিত রূপে পূজা পেতেন। ১৮৮৯ সালে স্থাপিত শ্রমিকদের দ্বিতীয় আন্তর্জ্জাতিক-প্রতিষ্ঠানে ক্রমে তিনিই গুরুর স্থান নেন। বের্ণ্‌স্টাইন্ মার্ক্স্‌কে সংশোধন করবার

প্রকাশ্য প্রস্তাব আনলে, তাঁর অনুচরেরা দুঃসাহসের জন্য দল থেকে বহিষ্কৃতপ্রায় হ'ল অথচ আসলে কাউট্স্কিও যে মার্ক্স্বাদকে ভদ্র ও বিকৃত করে' ফেল্‌ছিলেন সে কথা অনেক দিন ধরা পড়ে নি।

মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্‌সের প্রকৃত মতামতের পুনরুদ্ধার হ'ল লেনিনের সারাজীবন চেষ্টার ফলে। যুদ্ধের পর লেনিনের সঙ্গে বাদানুবাদে কাউট্স্কি এমন পরাস্ত হলেন যে এখন তাঁর ব্যাখ্যাকে মার্ক্স্-পন্থা ভাববার ভুল অতি অল্প লোকেই করবেন। উপরে সাম্যবাদের পরিচয়ে তাই লেনিন্‌কেই অনুসরণ করা হয়েছে। তাঁর প্রভূত অধ্যবসায়ে মার্ক্স্বাদের কয়েকটি অঙ্গ প্রথম পরিস্ফুট হ'ল। প্রথম সোপান হিসাবে শ্রমিকদের সশস্ত্র বিপ্লব ছাড়া শ্রেণীবর্জ্জিত নূতন-সমাজ গঠনের অন্য উপায় নেই ; সুতরাং বিপ্লব সম্ভব ও সার্থক করে' তোলার সাধনাই হ'ল শ্রমিক-প্রতিভূ সাম্যবাদীদের কর্ত্তব্য। এই বিশ্বাসের জন্যই আজ প্রায় প্রতিদেশে প্রচলিত বিধি-ব্যবস্থা রক্ষার জন্য মার্ক্স্বাদের দমনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সাম্যবাদ-অনুসারে বিপ্লবের পর নূতন সমাজ গড়ে তোলার জন্য বহুদিনের পরিশ্রম চাই। লেনিনের ব্যাখ্যায় সে-যুগসন্ধির সময় শ্রমিকশ্রেণীর একাধিপত্য প্রয়োজন— অর্থাৎ ঠিক তখন গণতান্ত্রিক ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার প্রশ্রয় সম্ভব নয়। এইখানে কাউট্স্কির সঙ্গে ঘোর মতানৈক্যের ফলে, সোশ্যাল্-ডিমক্রাসি ও সাম্যবাদ পরস্পর-বিরোধী হ'য়ে পড়ল। লেনিন্ আরও বল্লেন যে বিপ্লবের পর ক্রমে ক্রমে শ্রেণীভেদ শেষ হ'য়ে গেলে, এঙ্গেল্‌সের ভাষায় স্টেটের নিষ্পেষণযন্ত্র শুকিয়ে যাবে।

তখনই পূর্ণ সাম্যতন্ত্র আসতে পারবে আর তার সঙ্গে পরিণামে নৈরাজ্যবাদের ঈপ্সিত অবস্থা, অর্থাৎ রাষ্ট্রবর্জ্জিত সমাজ সম্ভবপর হবে। এই ভাবে লক্ষ্যে পৌঁছবার পদ্ধতিই লেনিনের সাম্যবাদ এবং মার্ক্সের দৃষ্টিভঙ্গী থেকে তা' অভিন্ন।

৯

রুষ-বিপ্লব ও সোভিয়েট্-ইউনিয়ান্

আঠারো শতক থেকে রাশিয়া ইউরোপে প্রধান রাষ্ট্রগুলির মধ্যে আসন পেয়েছে। উত্তরোত্তর তার শক্তি অনেক দিন বৃদ্ধি পেয়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে রুষ সম্রাট জার্‌দের রাজ্যমধ্যে স্বেচ্ছাচার ও বাইরে প্রবল প্রতাপ প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়। ১৯১৭তে সে-শক্তির উচ্ছেদসাধন সুতরাং সম্পূর্ণ আকস্মিক হ'তে পারে না। বস্তুতঃ ক্রিমিয়ার যুদ্ধের পর থেকে রুষরাজ্যের প্রসার অনেকখানি বাধাপ্রাপ্ত হ'তে লাগল। দেশের মধ্যে সংস্কার-কামনার উদয়ও প্রায় সেই একই সময়ে। প্রথম নিকোলাসের রাজত্বে, অর্থাৎ ঠিক একশত বৎসর আগে, রুষ-চিন্তারাজ্যে প্রখর বাদানুবাদের পর, জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপাসক স্লাভোফিল্‌দলের চাইতে সংস্কারক পশ্চিমপন্থীদের প্রভাব প্রবলতর হ'তে লাগ্‌ল। ক্রমে এই ভাবধারা রাষ্ট্রিক আন্দোলনে পরিণত হ'লে, দ্বিতীয় আলেক্‌জাণ্ডার্ রাষ্ট্রশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত করে' নেবার জন্য কয়েকটি সংস্কার করলেন। ব্যবস্থাগুলি বহু পূর্ব্বে আসা উচিত ছিল—সে জন্য, এবং তাদের মধ্যেও উদারতার অভাবের ফলে, দেশে কিন্তু এতে অসন্তোষের লাঘব হ'ল না। অর্দ্ধদাসত্ব প্রথা লোপের পর কৃষকেরা দেশের কিছু জমি পেলেও পূর্ব্বতন প্রভুদের ক্ষতিপূরণের ভার তাদের উপরই পড়্‌ল। রাজ্যশাসনেও অবাধ-রাজতন্ত্রের তখনও অবসান

হয় নি। তাই সংস্কার সত্ত্বেও চরমপন্থীদের সঙ্গে শাসকদের প্রবল সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়েছিল। এ-সময়ের রুষ-আন্দোলন (গত শতকের তৃতীয় পাদে) নারোদ্‌নিকি নামে খ্যাত। একদিকে রাজার অত্যাচার, অন্যদিকে নিহিলিস্ট্ নামে পরিচিত সন্ত্রাসবাদ রাশিয়াকে তারপর মথিত করে। বাকুনিনের প্রভাবান্বিত এসার্-দল রাশিয়ায় প্রথম সোশ্যালিজ্‌মের ধ্বজা তুল্‌ল, কিন্তু তার কিছু পরে যন্ত্রশিল্পের প্রসারের সঙ্গে মার্ক্সের অনুগামী সোশ্যাল্-ডেমক্রাট্‌দের উদ্ভব হয় প্লেকানভের নেতৃত্বে। তৃতীয় আলেক্‌জাণ্ডার্ ও দ্বিতীয় নিকোলাসের আমলে ওদিকে দমননীতির পরাকাষ্ঠা দেখা গেল। শুধু সন্ত্রাসবাদীরা নয়, সকল প্রকার সোশ্যালিস্ট্, এমন কি উদারমতাবলম্বী লোকেরা এবং সংখ্যান্যূন জাতিদের নেতারা পর্য্যন্ত তখন দণ্ডিত হতেন। দমন ও বিপ্লব-প্রচেষ্টার সঙ্ঘাত তখনকার রুষ-সাহিত্যের পটভূমিকা; সাইবেরিয়ায় নির্ব্বাসন-দণ্ডের কথাও সুপরিচিত।

বিদেশে লণ্ডনে রুষ সোশ্যাল্-ডেমক্রাট্‌দের দ্বিতীয় মহাসভায় দল ভঙ্গ হ'ল—বিরোধী মেনশেভিক্ মত অগ্রাহ্য করে' লেনিনের অনুচরেরা এ-সময় একজোট হয়। সে-সভায় সংখ্যাধিক্যের জন্য তারা বল্‌শেভিক্ অর্থাৎ সংখ্যাধিক্যের দল নামে খ্যাত হ'ল। মতভেদের কারণ লেনিনের মতামত—তিনি মার্ক্সীয় দলটিকে বিপ্লবব্রতীরূপে সংগঠিত করতে চান, আর অনেক বিষয়ে মার্ক্স্‌বাদের প্রচলিত ব্যাখ্যা তাঁর কাছে বিকৃত ও ভুল মনে হ'তে লাগ্‌ল। প্লেকানভ্ ক্রমশঃ মেন্‌শেভিক্-ভাবাপন্ন হ'য়ে পড়েন, তাই লেনিন্‌ই বল্‌শেভিক্‌দের প্রকৃত নেতা হলেন। তাঁর স্বদেশে ফেরার

উপায় ছিল না, কিন্তু স্টালিন্ প্রভৃতি বল্‌শেভিক্ কর্ম্মীরা দেশের মধ্যে গোপনে প্রচার চালালেন। মেন্‌শেভিক্‌দের দৃঢ়বিশ্বাস ছিল যে, রাশিয়া আর্থিক ব্যাপারে অনুন্নত বলে' প্রথমে পশ্চিম-ইউরোপের অনুরূপ উদার-গণতন্ত্র এবং মধ্যশ্রেণীর কর্ত্তৃত্ব সে-দেশে স্থাপিত হবে, তারপর কালে সোশ্যালিজ্‌ম্ স্থাপন সম্ভব হবে। বল্‌শেভিক্ মতে মার্ক্স্ কখনও এমন যান্ত্রিক ভাবে বিবর্ত্তনের কল্পনা করেন নি। লেনিন্ দেখালেন যে ধনতন্ত্র এখন পৃথিবীব্যাপী, কাজেই রাশিয়া অন্য দেশের মতন অগ্রসর না হ'লেও সেই আর্থিক ব্যবস্থারই অঙ্গ হ'য়ে পড়েছে। বিরোধের ফলে জগদ্ব্যাপী ধনতন্ত্র ভেঙ্গে পড়াকে লেনিন্ টানের চোটে শৃঙ্খল ছেঁড়া রূপে কল্পনা করেছিলেন। শিকল ছিঁড়বে নিশ্চিত জান্‌লেও ঠিক কোথায় ছিঁড়বে আগে থাকতে জানা যায় না, তবে এটুকু বলা সম্ভব যে দুর্ব্বলতম স্থানটিই আগে ছিন্ন হবে। কাজেই কোনও কারণে ধনতন্ত্রের ব্যবস্থা কোথাও দুর্ব্বল হ'য়ে পড়লে সেইখানেই শ্রমিক-বিপ্লব ঘটতে পারে। মহাযুদ্ধের ফলে রাশিয়ায় তাই হ'ল, কিন্তু বল্‌শেভিক্ মতবাদ আগে থাকতেই সে-সম্ভাবনা ধরতে পেরেছিল। ১৯১২ সালের মধ্যে বল্‌শেভিকেরা মেন্‌শেভিক্‌দের সম্পূর্ণ ছেড়ে পৃথক দল গঠন করল।

জাপানের হাতে পরাজয়ের পর রাশিয়ায় তুমুল আন্দোলন হয় (১৯০৫)—নানাদলের মিলিত চাপে তখন সম্রাটকে বাধ্য হ'য়ে নিয়মতন্ত্র অঙ্গীকার করতে হ'ল। ডুমা অর্থাৎ প্রতিনিধি-সভা এভাবে স্থাপিত হ'লেও গণ্ডগোল অবসানের পর ধীরে ধীরে তার সব ক্ষমতা কেড়ে

নেওয়া হয়। কিন্তু এর ফলে দেশের মধ্যে অসন্তোষ আরও পুঞ্জীভূত হ'য়ে উঠতে লাগ্‌ল। তারপর এল মহাসংগ্রাম (১৯১৪)।

মার্ক্স্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌ বরাবরই বলেছিলেন যে তাঁরা শুধু মূলসূত্র ও বিশ্লেষণ প্রণালীর উদ্ভাবন করেন—তাঁদের মতবাদ মুখস্থ বিদ্যা নয়, বিশিষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী মাত্র। কাউট্‌স্কির প্রামাণ্যতা অগ্রাহ্য করে' লেনিন্‌ ইতিমধ্যেই নূতন পারিপার্শ্বিকের পর্য্যালোচনায় মার্ক্সে্‌র দৃষ্টিভঙ্গী নিয়োগ করেছিলেন। ধনতন্ত্রের সমসাময়িক রূপকে তিনি সাম্রাজ্যবাদ আখ্যা দিলেন—তার চালকশক্তি হচ্ছে ফিনান্স্‌-ক্যাপিটাল্‌, তার ঝোঁক মনোপলি বা একচেটিয়া কর্ত্তৃত্বের দিকে। শক্তিশালী দেশ মাত্রই তাই তথাকথিত আর্থিক উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধনিকদের তাড়নায় কূল ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়তে উদ্যত হয়। তার ফলেই পরাক্রান্ত দেশসমূহের হাতে সারাজগৎ বিভক্ত হ'য়ে পড়েছে। স্বভাবতঃই পৃথিবীভাগাভাগি কাড়াকাড়িতে পরিণত হ'য়ে মহাযুদ্ধের উদয় হবে—আর তখনই আসবে শ্রমিকদের সুযোগ। ধনিকতন্ত্রের শান্তভাবে সমাজতন্ত্রে পরিণত হবার প্রত্যাশা কাউট্‌স্কির মনে ছিল। সে-আশা বস্তুতঃ ইংরাজ ফেবিয়ান্‌দের মন্থর পরিবর্ত্তনের ধারণা থেকে অভিন্ন। কিন্তু ডায়ালেক্‌টিকের নিয়মানুসারে, সমাজব্যবস্থার এত বড় পরিবর্ত্তন বিবর্ত্তনধারার মধ্যে নূতন গুণের সৃষ্টির উপযোগী উল্লম্ফনের অথবা বিপ্লবের আকার নেওয়াই স্বাভাবিক। লেনিন্‌ ঘোষণা করলেন যে সাম্রাজ্যতন্ত্র অচিরে তিনদিক থেকে চাপের জন্য ভেঙ্গে পড়বে—প্রতি দেশের মধ্যে

শ্রমিকদের অসন্তোষ, অধীন অনুন্নত জাতিদের মুক্তিপ্রয়াস এবং মহাশক্তিদের স্বার্থপ্রণোদিত সঙ্ঘর্ষে। লেনিনের ধারণাগুলিকে, স্টালিনের ভাষায়, সাম্রাজ্যতন্ত্রের যুগোপযোগী মার্ক্স্‌বাদরূপে অভিহিত করাই সঙ্গত।

মহাযুদ্ধের সময় জার্‌তন্ত্রের অক্ষমতা বার বার প্রকাশ পাওয়াতে অসন্তোষ ও সংস্কারকামনা আবার মাথা তুলে দাঁড়াল। রাস্‌পুটিন্ নামে এক খৃষ্টীয় সন্ন্যাসী তখন রাজপরিবারের শনিরূপেই সম্রাট-সম্রাজ্ঞীর অপ্রিয়তাবৃদ্ধির কারণ হ'ন। তাঁর মৃত্যুর পর সম্রাটের শিথিল হাত থেকে রাজদণ্ড খসে পড়বার উপক্রম হ'ল। ১৯১৭ সালের প্রথমে রণক্লান্তি, খাদ্যাভাব, ধর্ম্মঘট, দমনচেষ্টা, অবস্থা সঙ্গীন করে' তোলে। পেট্রোগ্রাডে মার্চ্চের প্রথমে সৈন্যেরা শ্রমিকদের উপর গুলি চালাতে চাইল না। তারপর বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়াতে, ডুমাসভার এক সমিতি রাজ্যভার গ্রহণ করে এবং সম্রাটকে পদত্যাগ করতে হয়। ইতিহাসে এর নাম ১৯১৭ সালের প্রথম বা মার্চ্চ্ বিপ্লব।

ক্রমে এসার্-নেতা কেরেন্‌স্কি দেশের শাসক হ'য়ে পড়েন কিন্তু আসলে নানাদলের মিলিত কর্ত্তৃত্ব নূতন সাধারণতন্ত্রকে তখন চালাতে থাকে। স্থির হয় যে সমস্ত জনসাধারণের এক বিরাট প্রতিনিধি-সভা ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতি ঠিক করবে, আর নূতন রাষ্ট্রশক্তি আগের মতনই যুদ্ধ চালাতে থাকবে। ইতিমধ্যে লেনিন্ ও নির্ব্বাসিত অন্য সকল নেতাদের দেশে ফেরা সম্ভব হয়েছিল। মেন্‌শেভিকেরা তাদের মতানুসারে দেশে পরবর্ত্তী পর্য্যায় হিসাবে বুর্জোয়া-গণতন্ত্র স্থাপন প্রত্যাশা করে' নিশ্চেষ্ট ভাবে বসে ছিল। কিন্তু লেনিনের

মনে হ'ল, ধনিকদের দুর্ব্বলতার সুযোগ নিয়ে শ্রমিক-বিপ্লবের সুবিধা উপস্থিত হয়েছে।

তিনি তৎক্ষণাৎ নূতন কর্ম্ম-পদ্ধতির উদ্ভাবন করে' ফেলেন। সময়োপযোগী ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন মার্ক্স্-পন্থার একটা বৈশিষ্ট্য। ১৯০৫-এর বিপ্লবে পেট্রোগ্রাডে শ্রমিকেরা সোভিয়েট্ নামে এক প্রতিষ্ঠান গড়েছিল। ১৯১৭র মার্চ্চে তার পুনর্স্থাপন হয় এবং অন্যান্য স্থানেও অনেক শ্রমিক ও কৃষক সোভিয়েট্ দেখা দেয়। সোভিয়েট্ শুধু শ্রমজীবিদের সমিতি মাত্র—কিন্তু প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের কেন্দ্রগুলি বাসস্থান অনুযায়ী পল্লীসমূহ নয়, কারখানা ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্মস্থল অনুসারে প্রতিনিধি পাঠাবার ব্যবস্থা এ-প্রতিষ্ঠানের বিশেষত্ব। যে-কোনও মুহূর্ত্তে পুরাতনের জায়গায় নূতন প্রতিনিধি পাঠাবার ক্ষমতা থাকায় সোভিয়েটে শ্রমিক ও কৃষকদের ইচ্ছা সক্রিয় থাকতে পারে। লেনিনের আন্দোলনের মন্ত্র হ'ল যে এখন সোভিয়েট্গুলির হাতেই সকল ক্ষমতা দেওয়া হোক। সহসা সমগ্র দেশের প্রতিনিধি-সভার আদর্শ খর্ব্ব করে' শ্রমিক-শ্রেণীর প্রাধান্যের কলরব উঠ্ল। কৃষকদের দলে টানবার জন্য লেনিন্ দাবী করলেন যে জমিদারদের জমি কেড়ে চাষীদের হাতে দেওয়া হোক। অত্যাচারিত সংখ্যান্যূন অনেক জাতির রুষদেশে বসবাস ছিল। লেনিনের তৃতীয় প্রস্তাব, এদের পূর্ণ আত্মকর্ত্তৃত্ব দেওয়া। আর সমস্ত দেশের গুপ্ত ইচ্ছা মূর্ত্ত হ'ল তাঁর চতুর্থ প্রস্তাবে—যুদ্ধ থামিয়ে তৎক্ষণাৎ শান্তির আয়োজনে।

জুলাই মাসে বিদ্রোহের একটা চেষ্টা ব্যর্থ হ'লে লেনিন্কে কিছুদিন অজ্ঞাতবাসে থাকতে হয়। সেই দারুণ উদ্বেগের

সময় তাঁর বিখ্যাত পুস্তিকা—রাষ্ট্র ও বিপ্লব—রচনা হ'ল। তারপর নভেম্বরে বিপ্লব-চেষ্টা করল সাফল্যলাভ। নবাগত ট্রট্স্কির সাহায্যে লেনিন্ ও তাঁর সহকর্ম্মীরা শাসনযন্ত্র সবলে অধিকার করলেন। এই সময়ে দশটি স্মরণীয় দিনের প্রত্যক্ষ বিবরণ রীড্ নামে এক আমেরিকান্ লিপিবদ্ধ করে' রেখেছেন। যে-চার প্রস্তাবে লেনিন্ জনমতকে উত্তেজিত করেছিলেন, বল্‌শেভিক্‌দের প্রথম কর্ত্তব্য হ'ল সেগুলি অনুমোদন এবং কাজে পরিণত করবার প্রয়াস। জাতীয় প্রতিনিধি-সভার বদলে শ্রমিক-সমিতি বা সোভিয়েট্‌গুলি নূতন রাষ্ট্রের অঙ্গ হওয়াতে রাশিয়া সোভিয়েট্-ইউনিয়ান্ নামে পরিচিত হ'ল। ইতিমধ্যেই অবশ্য সোভিয়েট্‌সমূহ বল্‌শেভিক্‌দের হাতে এসে পড়েছিল। সোভিয়েট্‌গুলিতে বল্‌শেভিক্‌দের প্রাধান্য বাড়ছে দেখেই লেনিন্ বিপ্লবের উদ্যমে সাহসী হয়েছিলেন।

১৯১৭র নভেম্বর্ থেকে ১৯১৮ সালের জুন্ পর্য্যন্ত আট মাস বল্‌শেভিক্-শাসনের প্রথম অধ্যায়। লেনিনের প্রস্তাবের কিছু কিছু সোশ্যালিস্ট্-আদর্শের আপাতবিরোধী হ'লেও তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন যে তখন প্রথম কর্ত্তব্য ছিল শাসনযন্ত্র অধিকার এবং দ্বিতীয় হ'ল সে-অধিকার অটুট রাখার চেষ্টা। তাই কৃষকদের মধ্যে জমিদারদের জমি বণ্টন করা হয় এবং ছোট ছোট জাতিরা স্বায়ত্তশাসন পেল। সেইজন্যই আবার ব্রেস্ট্-লিটভ্স্কের সন্ধিতে রাশিয়া রাজ্যক্ষয় করে'ও শান্তি আনে। রুষদেশে ধনিকদের একেবারে উচ্ছেদ তখনও হয় নি; কেন্দ্রীয় আর্থিক-পরিষদ স্থাপন ও ফ্যাক্টরিগুলিতে শ্রমিক প্রতিনিধি নিয়ে পরিচালক-সমিতি

গঠন আর্থিক ব্যাপারে প্রথমটা ধনিকদের সহযোগে এক রকম দ্বৈত-শাসনের প্রবর্ত্তনা করে।

দ্বিতীয় অধ্যায়, ১৯১৮র জুন্ থেকে ১৯২১-এর অগাস্ট্ পর্য্যন্ত। এই সময়টা বল্‌শেভিক্‌দের অগ্নিপরীক্ষার যুগ। অন্তর্বিরোধ আরম্ভ হ'ল—বল্‌শেভিক্‌বাদের প্রতিক্রিয়া হিসাবে নানা দিকে বিদ্রোহ দেখা দিতে লাগ্‌ল। উত্তরে যুডেনিচ্, দক্ষিণে ডেনিকিন্ ও রাঙ্গেল্, পূর্ব্বে কল্‌চাক্ বিদ্রোহের নেতৃত্ব করেন। জার্‌তন্ত্রের ঋণশোধের দায়িত্ব বল্‌শেভিকেরা অস্বীকার করেছে এই নজিরে মিত্রশক্তিরা সোভিয়েটের শত্রুদের সাহায্যে উদ্যত হ'ল। তখন ইংরাজ, ফরাসী, জাপানী ও মার্কিন সৈন্য রুষদের আক্রমণ করে। বল্‌শেভিক্‌দের দৃঢ়তা কিন্তু সংগ্রামে শেষ পর্য্যন্ত জয়ী হ'ল। মধ্য-ইউরোপে বিপ্লব ছড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা, রাশিয়াকে আক্রমণ করাতে পাশ্চমে শ্রমিকদের অসন্তোষ ও সোভিয়েটের গৃহশত্রুদের অকৃতকার্য্যতা শেষ পর্য্যন্ত মিত্রশক্তিদের অভিযান ব্যর্থ করে। পোলেরা শুধু এই সুযোগে কিছু রাজ্যবিস্তারে সমর্থ হয়েছিল। এই জীবনমরণের সমস্যার সময়ই লেনিন্‌কে বাধ্য হ'য়ে সামরিক-সাম্যতন্ত্রের ব্যবস্থা করতে হয়। নূতন রাষ্ট্রশক্তি তখন সমস্ত আর্থিক ব্যবস্থা নিজের হাতে নেয়। ধনিকদের এবার উচ্ছেদ হ'ল, যন্ত্রশিল্প এল স্টেটের কর্ত্তৃত্বে, কৃষকদের সঙ্গে তাদের শস্যের পরিবর্ত্তে এখন সহরজাত অন্য পণ্য-সামগ্রী সরবরাহের নানা চুক্তিও হয়। রাষ্ট্রশক্তির সর্ব্বেব কর্ত্তৃত্ব যুদ্ধজয়ে সাহায্য করল বটে, কিন্তু এতে দেশের ভিতর তখনকার মত অভাব ও গণ্ডগোল বহুল বৃদ্ধি পেয়েছিল।

১৯২১এ লেনিন্ তাই নূতন আর্থিক ব্যবস্থা, সংক্ষেপে নেপ্-পদ্ধতির আশ্রয় নিলেন। সাম্যবাদের অবসান হ'ল, চারিদিকে তখন এই রব উঠলেও বোঝা সহজ যে বল্‌শেভিকেরা শুধু নানা সাময়িক উপায়ে নিজেদের কর্ত্তৃত্ব দৃঢ়তর করছিল, মূল লক্ষ্য থেকে ভ্রষ্ট হয় নি। পরে ১৯২৮এ আর্থিক-নীতি পরিবর্ত্তন একথা সপ্রমাণ করে। নেপের আমলে কৃষকদের এবং ব্যবসায়ীদের স্বাধীনতা অনেকখানি ফিরে আসে আর বিদেশী ধনিকদেরও কিছু কিছু সুবিধা দেওয়া হয়। কিন্তু ঠিক ধনতন্ত্রের পূর্ব্বাবস্থায় দেশ তখন ফিরে যায় নি মনে রাখতে হবে। বড় কারখানাগুলি এবং বহির্বাণিজ্যের কর্ত্তৃত্ব নেপের আমলেও রাষ্ট্রের হাতে থাকে। তাই ধনিকদের ক্ষমতা কিছু ফিরে এলেও আর্থিক ব্যবস্থা একেবারে সোভিয়েট্-শক্তির মুষ্টিচ্যুত হ'ল না। নেপ্‌কে বস্তুতঃ বল্‌শেভিক্‌দের অগ্রগতির পথে নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর হিসাবে দেখাই উচিত। এরই মধ্যে ১৯২৪-এর প্রথমে লেনিনের মৃত্যু হ'ল।

লেনিনের শাসন সম্পর্কে আর দুইটি বিষয়ের, বহির্জগতের সহিত সম্বন্ধ এবং নূতন রাষ্ট্রশক্তি সংগঠনের উল্লেখ করে'ই এ-প্রসঙ্গ শেষ করতে হবে। ১৯১৮-১৯১৯এ শ্রমিকবিপ্লব নানা দেশে ছড়িয়ে পড়বার খুবই সম্ভাবনা ছিল। বল্‌শেভিকেরা মার্ক্সের ব্যবহৃত সাম্যবাদী নাম গ্রহণ করে' কমিন্‌টার্ন্ অথবা তৃতীয় শ্রমিক আন্তর্জ্জাতিক-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করল—সর্ব্বত্র বিপ্লবের প্রসার ছিল তার লক্ষ্য। যুগসন্ধির সময় কিন্তু পাশ্চাত্য জগৎ লেনিন্‌কে অগ্রাহ্য করে' উইল্‌সন্-পন্থাই অনুসরণ করে। কিছুদিনের মধ্যে

সাম্যবাদীরা তাই বুঝ্‌ল যে ধনিকতন্ত্র টল্‌মল করে' উঠ্‌লেও খানিকটা সামলে নিয়েছে। হাঙ্গারিতে বেলাকুনের বল্‌শেভিকি-আধিপত্য ধনিকেরা ধ্বংস করল রোমানিয়ার সৈন্যের সাহায্যে। জার্মানিতে বিপ্লবের পর সোশ্যাল্‌-ডেমক্র্যাটেরা শ্রমিক-একাধিপত্য স্থাপনে অস্বীকার করাতে ধীরে ধীরে মধ্যশ্রেণীর কর্ত্তৃত্ব পুনর্প্রতিষ্ঠিত হ'ল। রাশিয়ার মধ্যে বিপ্লব জয়যুক্ত হ'লেও শেষ পর্য্যন্ত বাইরে তার পরাজয় হয়। ১৯২৩-এর পর আমেরিকার আর্থিক সাহায্যের সম্ভাবনাই পশ্চিমে বিপ্লবের ভয় অপসারণ করতে পেরেছিল। কিন্তু সে-সম্ভাবনার অনেক আগে থাকতেই সোভিয়েট্‌-রাশিয়া বিদেশ সম্বন্ধে নিরপেক্ষ-নীতি অবলম্বন করে। ১৯২০ সালেও চিচেরিন্‌ মার্কিন গভর্ণমেণ্ট্‌কে জানান যে সোভিয়েট্‌-শক্তি অন্যদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চায় না। জার্‌দের সুবিদিত অগ্রসর-নীতি তাই প্রথম থেকে সযত্নে পরিত্যক্ত হয়েছিল। তার উদাহরণ—ব্রেস্ট্‌-লিটভ্‌স্কের রাজ্যক্ষয়-অঙ্গীকার পালন, দেশের মধ্যে ক্ষুদ্র জাতিগুলির স্বায়ত্ত-শাসনের অধিকার স্বীকার, এবং একদিকে তুরস্ক অন্যদিকে চীনের উপর আগের মতন চাপ দেবার লোভ সম্বরণ। সুতরাং আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে শান্তিপ্রিয়তা শুধু এখন নয়, লেনিনের আমল থেকেই সোভিয়েট্‌-ইউনিয়ানের বিশেষত্ব। এর কারণ বোধ হয় আভ্যন্তরীণ সংগঠন কার্য্যে ব্যস্ততা এবং বিদেশে ছড়িয়ে পড়বার আর্থিক তাগিদের অভাব। তুরস্ক, পারস্য ও আফগানিস্থানের সঙ্গে রুষদের নূতন সদ্ভাব ১৯২১-এর সন্ধিগুলির থেকে আরম্ভ; চীনের সঙ্গেও মৈত্রী হ'ল

১৯২৪এ। ক্রমে ক্রমে পশ্চিমের প্রতিবেশীদের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন হয়, যদিও সীমান্ত নিয়ে পোল্যাণ্ড্ ও রোমানিয়ার সঙ্গে রুষদের কিছু মনোমালিন্য থেকেই গেল। এ-সময় বিজয়ী বড় রাষ্ট্রগুলি সোভিয়েট্কে অস্পৃশ্য করে' রাখাতে জার্মানির সঙ্গে তার বন্ধুত্ব হয়েছিল (রাপালোর সন্ধি, ১৯২২)।

নূতন রাশিয়ার আভ্যন্তরিক অবস্থার আলোচনা স্থানাভাবে এখানে সম্ভব নয়। অশেষ দুর্গতি ও অনেকখানি অত্যাচারের মধ্য দিয়ে এক সম্পূর্ণ-নতুন ব্যবস্থা এখানে গড়ে' উঠবার সূত্রপাত হ'ল ; রাষ্ট্র-ব্যবস্থার ভিত্তিতে স্থানীয় সোভিয়েট্গুলি গ্রামে গ্রামে ও প্রতি নগরে বিরাজ করতে লাগ্‌ল। তাদের প্রতিনিধি নিয়ে প্রাদেশিক সোভিয়েট্ এবং প্রদেশগুলির প্রতিনিধি দিয়ে সোভিয়েট্-কংগ্রেস্ গঠিত হ'ল—এই কংগ্রেস্ই দেশের ব্যবস্থা-পরিষদ। কংগ্রেস্ দুই ভাগে বিভক্ত এক সংসদ নির্ব্বাচন করে, তার এক ভাগে দেশান্তর্গত ভিন্ন ভিন্ন ক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরাও আসন পেল। এর থেকে আবার কমিসার্ অথবা মন্ত্রীদের সমিতির নিয়োগ। ১৯২৩-এর শাসন-পদ্ধতি অনুসারে সোভিয়েট্-রাজ্য এক ফেডারেশন্ অথবা সংহত-রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এতে আসল রাশিয়ার সঙ্গে আরও ছয়টি সোভিয়েট্ রেপাব্লিক্ সংযুক্ত হ'ল ; তাদের নাম—শ্বেত-রাশিয়া, উক্রেন্, ট্রান্স্-ককেশিয়া, তাজিকিস্থান, উজ্‌বেকিস্থান এবং তুর্ক্‌মানিয়া। মূল রুষদেশেও আবার নানা অঞ্চলে স্থানীয় আত্ম-কর্তৃত্বের ব্যবস্থা থাকে। কিন্তু এই জটিল বন্দোবস্ত চালাতে লাগল এক মূল শক্তি, এবং সে-

চালক হচ্ছে সাম্যবাদী-দল। প্রকৃত-নেতৃত্ব রইল সাম্যবাদী পার্টি-কংগ্রেস্ ও তার সমিতির হাতে। শেষ পর্য্যন্ত পলিট্‌বুরো নামক সাম্যবাদী কর্ম্ম-সমিতিই রাশিয়ার শাসক —মন্ত্রী প্রভৃতিরা তারই আশ্রিত। রুষ অধিনায়ক স্টালিন্ কেবল সাম্যবাদী-দলের কর্ম্মসচিব ও পলিট্‌বুরোর সভ্যমাত্র।

লেনিন্-গঠিত যন্ত্রের মূল কথা ছিল শ্রমিক-আধিপত্য, তার রূপ হ'ল সোভিয়েট্‌গুলি। কিন্তু শ্রমিকসাধারণকে ঠিক পথে চালাবার জন্য নেতার প্রয়োজন। সে-অভাব দূর করে সাম্যবাদী-দল। বিরোধীদের তাই দেশমধ্যে দমন করা হ'ল। এই চণ্ডনীতির কোন সার্থকতা থাকলে, মার্ক্স্ ও লেনিনের মতবাদে বিশ্বাস থেকেই তার উৎপত্তি।

১০

মুসোলীনি ও ইল্ ফাশিস্‌মো

সাম্যবাদীরা যে-সময় রাশিয়ায় কর্ত্তৃত্বস্থাপনে ব্যস্ত, তখন ইটালিতে ফাশিজ্‌ম্ নামে এক নূতন আন্দোলনের উদয় হয়। পরে এই ফাশিস্ট্ মতই সকল প্রকার সমাজতন্ত্রবাদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হিসাবে ইউরোপের সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়ে; মার্ক্স্-পন্থার প্রতিক্রিয়াই তার মূল প্রেরণা। এতে করে' যে-আদর্শ ও চিন্তাধারার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও তার পিছনে বিভিন্ন আর্থিক ব্যবস্থার সঙ্ঘাত সূচিত হচ্ছে, উত্তরসামরিক ইতিহাসের প্রধান বিষয়বস্তু তারই বিবরণ। প্রতিক্রিয়ার প্রথম অবস্থাতে মুসোলীনির দেশে তার নামকরণ হয় ইল্ ফাশিস্‌মো। প্রাচীন রোমে একসঙ্গে বাঁধা কতকগুলি দণ্ডকে রাজশক্তির চিহ্নরূপে ব্যবহার করা হ'ত—তার লাটিন্ নাম থেকেই ফাশিস্‌মো কথাটির উৎপত্তি। এই প্রতীকটির থেকে নূতন আন্দোলনের দু'টি মূলসূত্র আবিষ্কার করা যায় —রাষ্ট্রশক্তির প্রতিভূ নেতাদের কর্ত্তৃত্ব স্বীকার এবং সকলের সম্মেলন রূপ বন্ধনের মধ্য দিয়ে জাতির অখণ্ড ঐক্যকামনা।

এই প্রতিক্রিয়ার ইটালিতে প্রথম উদয় হবার কারণ অবশ্য সেদেশের বিশেষ অবস্থা। উনিশ শতকের পুনরুজ্জীবন-আন্দোলনে ইটালিতে এল ঐক্য আর মুক্তি, ১৮৭০ পর্য্যন্ত তার সাফল্য দেশকে উদ্দীপিত করে' রেখেছিল। তার পরের অর্দ্ধশতাব্দীতে কিন্তু ইটালীয়দের

ভাগ্যে জুট্‌ল অবসাদ ও আশাভঙ্গ। এর প্রকৃত কারণ বোধ হয় ইটালির আর্থিক, ও তার ফলে রাষ্ট্রিক দুর্ব্বলতা এবং অনুন্নত অবস্থা; মহাশক্তি হ'লেও নব্য ইটালি সামর্থ্য ও প্রতিপত্তিতে অন্যদের অনেক পিছনে রইল। আফ্রিকায় এই সময় সাম্রাজ্যস্থাপনের চেষ্টায় আশানুরূপ সাফল্যের অভাব এই দুর্ব্বলতারই সাক্ষ্য দিচ্ছে। মহাযুদ্ধের আগেই ইটালিতে অনেকের দৃঢ় বিশ্বাস হচ্ছিল যে এ-ব্যর্থতার জন্য দায়ী দুর্ব্বল নেতৃত্ব, এবং তারও মূলে রয়েছে ইংরাজ ও ফরাসীদের অনুকরণে গঠিত পার্লামেন্টিয় শাসনপদ্ধতি। অসন্তোষ এইভাবে ক্রমে ক্রমে দেশের মধ্যে জমে' উঠ্‌ছিল। আর বস্তুতঃই এ-যুগে ইটালির গণতান্ত্রিক শাসকেরা কোন দিকে কৃতিত্ব দেখাতে পারেন নি। রাজনীতি কতকগুলি লোকের ব্যবসায় কিম্বা খেলা হ'য়ে উঠেছিল। গোঁড়া ক্যাথলিক্ ও সাধারণ লোকের বিরোধে দেশ তখনও বিভক্ত, তার উপর প্রাদেশিক মনোভাবের জন্য আর সমাজতন্ত্রের আন্দোলনে ঐক্য হ'ল আরও সুদূর-পরাহত। দেশে লোকসংখ্যার দ্রুত বৃদ্ধি হচ্ছিল—অথচ নিজেদের উপনিবেশের অভাবে বিস্তর লোক বিদেশে বসতি করে' বিদেশীদের মধ্যে মিশে যাচ্ছিল। আর্থিক উদ্যমের অভাবে অন্যদের তুলনায় ইটালি দরিদ্র থেকে যায়, আর সেই জন্য রাষ্ট্রমহলে তার বিশেষ প্রতিপত্তিও ছিল না। সাম্রাজ্য গড়তে গিয়ে আবিসিনিয়ায় হ'ল দারুণ পরাজয় (১৮৯৬)—সম্প্রতি তারই প্রতিশোধ নেবার উত্তেজনা মুসোলীনির আফ্রিকায় অভিযানকে জনপ্রিয় করতে পেরেছিল। এরও আগে, ইটালির মুখের গ্রাস টিউনিস্

ফ্রান্স্ হঠাৎ নিজে দখল করে' বসে (১৮৮১) এবং অনেকটা সেইজন্যই ইটালি জার্মানির দলে যোগ দেয়। তাতে বিশেষ সুবিধা না হওয়াতে ইটালি স্বেচ্ছাবিহার আরম্ভ করে। তুরস্কের কাছ থেকে ট্রিপোলি (লিবিয়া) অধিকার (১৯১১) কিন্তু জার্মান্‌দের কাছে প্রীতিপদ হয় নি। এভাবে খানিকটা ভাসতে ভাসতে শেষে ইটালি মিত্রপক্ষে যোগ দেয় (১৯১৫)—তার কারণ অবশ্য লণ্ডনের গুপ্ত চুক্তিতে অনেক লাভের আশ্বাস।

মহাযুদ্ধের আগে এই ছিল ইটালির অবস্থা। দেশের মধ্যে বহুদিন একমাত্র প্রাণবান্ প্রচেষ্টা ছিল সোশ্যালিস্ট্-আন্দোলন, কিন্তু সে-মতবাদে দেশ অপেক্ষা শ্রেণী-স্বার্থের উপরেই বেশী জোর পড়ত। এ-অবস্থায় মুসোলীনির আগেও কতকগুলি ছোট ছোট দল নব-জাগরণের অগ্রদূত হিসাবে দেখা দিল। মারিনেত্তির ফিউচারিস্ট্-মণ্ডলী এক অভিনব ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখ্‌ল যেখানে অতীতের আবর্জ্জনা দূর এবং গণতন্ত্রের স্থানাভাব হবে; যুদ্ধবৃত্তিকে মারিনেত্তি বলেছিলেন জগতের স্বাস্থ্যরক্ষার উপায়। জেন্টিলের আদর্শবাদ চিন্তাশীল লোকদের বোঝাতে লাগ্‌ল যে স্টেটের একটা নৈতিক সত্ত্বা আছে, রাষ্ট্রশক্তি উদারনীতির শান্তিরক্ষক মাত্র কিম্বা মার্ক্স্-কথিত নিষ্পেষক নয়। কোরাডিনি লিবিয়াতে যুদ্ধবিগ্রহের সময় এক জাতীয়-দল গঠন করলেন, যার মূলমন্ত্র হ'ল দেশের জন্য আত্মত্যাগ; তিনি বল্লেন যে ইটালি দরিদ্র বলে'ই তাকে সাম্রাজ্যতন্ত্রে ব্রতী হ'তে হবে আর সে-উদ্যমে গণতন্ত্রের দ্বারা কোন কাজ হবে না। জনৈক শ্রমিক নেতা রসোনি এক জাতীয়-শ্রমিক আন্দোলন

আরম্ভ করেন—শ্রমিক-স্বার্থের সঙ্গে অন্যদের স্বার্থের অভিন্নতা প্রচার করে' তিনিই প্রথম ঘোষণা করেছিলেন যে বঞ্চিত শ্রেণীর থেকে বেশী সত্য হ'ল বঞ্চিত জাতি, আর ইটালির স্থান তাদেরই মধ্যে। সাম্রাজ্যতন্ত্রের প্রসার ইটালীয়দের মনে যে-ঝঙ্কার তুল্‌ছিল, মুসোলীনির অগ্রগামীরা এইভাবে তার প্রকাশেরই চেষ্টা করছিলেন।

মুসোলীনি তখন চরমপন্থী সোশ্যালিস্ট্। তার পরে তাঁর অনেক পরিবর্ত্তন হয়েছে কিন্তু নির্ভীক সক্রিয় স্বভাবে আগেকার সঙ্গে এখনকার মুসোলীনির সাদৃশ্য সহজেই চোখে পড়ে। মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে ইটালি অবশ্য নিরপেক্ষ ছিল, কিন্তু তখন মুসোলীনির মনে হ'ল যে অগ্নিস্নানের মধ্য দিয়েই দেশের পুনর্জীবন লাভ এবং সমাজের পুনর্গঠন সম্ভবপর হবে। অনেকখানি তাঁরই আন্দোলনে জনমত শাসকদের যুদ্ধে পাঠাল। কিন্তু সমরকালীন অভিজ্ঞতা তাঁকে আরও উত্তেজিত করে। তিনি দেখলেন যে কর্ত্তৃপক্ষের রণচালনায় ও শাসন কার্য্যে অকর্ম্মণ্যতা আর দেশের মধ্যে খণ্ডস্বার্থের সন্ধান ইটালিকে দুর্ব্বল করে'ই রাখল প্যারিস্-শান্তিসভায় ইটালি তার ন্যায্য পাওনা পেল না বলে' দেশে এবার তুমুল হুলুস্থুল পড়ে গেল। প্রেসিডেণ্ট উইল্‌সন্ কিছুতেই ফিউম্ নগরী ইটালির রাজ্যভুক্ত হ'তে দেন নি। তখন যুদ্ধান্তের নির্দ্দেশ অমান্য করার পথ প্রথম দেখালেন ইটালির কবি দানুন্‌ৎসিও—একদল স্বেচ্ছাসৈনিক নিয়ে তিনি হঠাৎ ফিউম্ দখল করে' বস্‌লেন। সমরশেষের উত্তেজনার সময় মুসোলীনি তাঁর প্রথম ক্ষুদ্র দল গড়লেন—এই সময় ও এর আগেও ১৯১৫তে মুসোলীনির অনুচরদের

ফাশিস্ট্ নাম ব্যবহার আরম্ভ হয়। তাঁর সঙ্গে সোশ্যালিস্ট্-দের পার্থক্য এর আগেই তাঁকে সে-দলছাড়া করেছিল।

১৯১৯এ কিন্তু ইটালিয়ান্ সোশ্যালিস্ট্দেরই ছিল প্রবল প্রতিপত্তি—তাদের দ্রুত দলবৃদ্ধি হচ্ছিল এবং রুষ-বিপ্লবও তখন এদের মধ্যে নূতন আশার সঞ্চার করে। নির্ব্বাচনে তাদেরই তখন প্রভূত সাফল্য হয়েছিল (১৯১৯)। এমন কি এক সময় (১৯২০) ফ্যাক্টরি ও বড় জমিদারীগুলি প্রায় শ্রমিক-সঙ্ঘদের আয়ত্তে এসে পড়ে। কিন্তু জার্মানির মতন এখানেও সোশ্যালিস্টেরা আস্ফালন করলেও প্রকৃতপক্ষে বিপ্লবের জন্য প্রস্তুত ছিল না—রাষ্ট্রশক্তি তাদের মুষ্টির মধ্যে এসেও হস্তচ্যুত হ'ল। সুচিন্তিত কর্ম্মপদ্ধতি আর সাহসের অভাবে তারা ইতস্তত করে' এসময় রাষ্ট্রযন্ত্র দখল করার সুযোগ হারাল। তারপর ১৯২১ থেকে তারা পরস্পরের নিন্দায় রত নানা দলে বিভক্ত হ'য়ে পড়ে। সুযোগ থাকলেই যে রাষ্ট্রবিপ্লব সম্পন্ন হয় না, যুদ্ধের অব্যবহিত পরে জার্মানি ও ইটালির অভিজ্ঞতা তার পরিচয় দেয়।

সোশ্যালিস্ট্দের এই সুযোগ শেষ হবার পর এল প্রতিপক্ষীয় ফাশিস্ট্দের অভিযান। বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে নানা নেতার কর্ত্তৃত্বে ফাশিস্ট্ দলগুলি নিকটবর্ত্তী সোশ্যালিস্ট্দের তখন সবলে দমন করতে আরম্ভ করল। ১৯২০র আতঙ্কের প্রতিশোধ নেবার জন্য আর ভবিষ্যৎ কণ্টকোদ্ধার করতে, ফাশিস্টেরা নিজেদের ইচ্ছা মত সমাজতন্ত্রীদের শিক্ষা দিতে লাগ্ল। একদল কর্ত্তৃক অন্যদলের এই নিপীড়নে ইটালির দুর্ব্বল শাসকেরা কোন বাধা দিলেন না, পক্ষান্তরে ধনিকদের অবশ্য সম্পূর্ণ

সহানুভূতি পায় এই ফাশিস্ট্-মণ্ডলীগুলি। ফাশিস্ট্‌দের অনেক স্থানীয় নেতা থাকলেও সারাদেশে ফাশিস্ট্-কর্ত্তা হিসাবে মুসোলীনিই অভিনন্দিত হলেন। ধনতান্ত্রিক স্টেট্ যেখানে দুর্ব্বল সেখানে দল গঠন করে' প্রহারের সাহায্যে শ্রমিকদের শান্ত করার উপায় মুসোলীনি ও তাঁর পার্শ্বচরেরা উদ্ভাবন করেন। মুখে ফাশিস্টেরা যাই বলুক কার্য্যতঃ এতে ধনিকদেরই প্রভুত্ব সুরক্ষিত হ'ল।

এর পরও কিছুদিন দেশে অরাজকতা চল্‌ল। অন্য রাষ্ট্রিক দলগুলি এবং পলিটিক্স্-ব্যবসায়ী শাসকেরা পদে পদে অকর্ম্মণ্যতা দেখাতে লাগ্‌লেন। অন্যদিকে ১৯২১ থেকে মুসোলীনি ফাশিস্ট্‌দের একটা সুসম্বদ্ধ দলে পরিণত করেছিলেন। ১৯২২-এর অক্টোবরে চারিদিক থেকে ফাশিস্ট্ দলবল রাজধানী রোমে সমবেত হ'ল—ইটালির রাজা তখন শান্তিভঙ্গের আশঙ্কায় মুসোলীনিকেই প্রধানমন্ত্রীর পদাভিষিক্ত করলেন। এইভাবে ফাশিস্ট্-দলের হাতে রাজ্যভার আসে। অবশ্য এর আগে থাকতেই সোশ্যালিস্ট্-দমনের ফলে ফাশিস্ট্-মণ্ডলীগুলিই বহু অঞ্চলে সর্ব্বেব কর্ত্তা হ'য়ে উঠেছিল। ১৯২২ থেকে ইটালির নবযুগ আরম্ভ।

প্রথম কিছুকাল রাষ্ট্রশাসনে ফাশিস্ট্‌দের সঙ্গে অন্য কয়েকটি দলও সহযোগিতা করেছিল, তাদের ফাশিস্ট্-মিত্র আখ্যা দেওয়া হয়। মুসোলীনির কর্ত্তৃত্ব তাই প্রথমদিকে বল্‌শেভিক্‌দের আধিপত্যের মতন স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল না। কিন্তু ক্রমে ক্রমে ইটালিতেও প্রকৃত একনায়কত্ব আসে। ক্যাথলিক্ রাষ্ট্রনেতা ডন্ স্টুর্‌জো ১৯২৩ সালে সম্ভবতঃ পোপের নির্দ্দেশেই সরে' দাঁড়ালেন। ১৯২৪-এ সোশ্যালিস্ট্-

নেতা মাটিয়টি নিহত হ'ন; এই হত্যাকাণ্ডে ফাশিস্ট্-নেতাদের কেউ কেউ লিপ্ত থাকায় প্রথমে মুসোলীনির প্রতিপত্তির কিছু ক্ষতি হয়, কিন্তু পরবৎসর থেকে ফাশিস্ট্‌রা খোলাখুলি ভাবে নিজেদের একেবারে বিপ্লবী বলে' পরিচয় দিতে আরম্ভ করল—নূতন ইটালি গড়বার রবও তখন থেকে আরম্ভ হয়। আরও কিছুকাল পরে নূতন শাসনপদ্ধতির উদ্ভব হ'ল এবং নূতন কর্‌পোরেটিভ্-রাষ্ট্রের আদর্শে ইটালির পুনর্গঠন সেই থেকে ফাশিস্‌মোর লক্ষ্য বলে' গণ্য হ'য়ে আস্‌ছে।

ফাশিজ্‌ম্ প্রথম থেকেই একটা বিশিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতির রূপ নেয় কিন্তু তার পিছনে সাম্যবাদের মতন কোন নির্দ্দিষ্ট মতবাদ ছিল না। মুসোলীনি নিজেই থিওরির প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করে' বলেছিলেন যে তাঁর আন্দোলন কর্ম্মপ্রধান ও সজীব, তার মধ্যে বাঁধা মতবাদের সন্ধান বৃথা। কিন্তু ক্রমশঃ দেখা গেল যে মুসোলীনির কর্ম্মপদ্ধতি অন্যত্রও সঞ্চারিত হ'চ্ছে আর জাতীয় বৈশিষ্ট্যের উপর ঝোঁক দেওয়া সত্ত্বেও বিভিন্ন দেশের ফাশিস্ট্‌দের মধ্যে একটা আন্তরিক মিলও আছে। আজকের দিনে তাই একটা সাধারণ ফাশিস্ট্-দৃষ্টিভঙ্গীর অস্তিত্ব সর্ব্বসম্মত। ফাশিস্ট্ রাষ্ট্রগুলির পারস্পরিক সমর্থনও ক্রমে একটা বিশেষ মতবাদের বিজ্ঞাপন হ'য়ে পড়ছে। নাৎসি-বিপ্লবের পর অবশ্য মুসোলীনি তাঁর তথাকথিত নেপোলিয়ান্-সদৃশ ব্যক্তিত্ব সত্ত্বেও অনেকখানি পিছিয়ে পড়েছেন। হিট্‌লারি-আন্দোলন এখন বেশী দৃষ্টি আকর্ষণ করবার বৈধ কারণ আছে—ইটালির থেকে জার্মানির স্বাভাবিক শক্তিসামর্থ্য অনেক বেশী। তবুও

ফাশিস্ট্-মতবাদের ইতিহাসে মুসোলীনি নিশ্চয়ই পথ-প্রদর্শকের আসন দাবী করতে পারেন।

ফাশিস্‌মোর প্রথম ও প্রধান বৈশিষ্ট্য—সোশ্যালিজ্‌মের বিরুদ্ধাচরণ। এইখানেই সকলজাতীয় ফাশিস্ট্-দলের মূলগত ঐক্য। ইটালি ও পরে জার্মানিতে উদীয়মান ফাশিস্ট্‌দের শ্রমিকদমন ও ধনিকদের কাছ থেকে অর্থসাহায্য আকস্মিক ব্যাপার নয়। শুধু মার্ক্সীয় ডায়ালেক্‌টিক্ নয়, মার্ক্সের প্রধান বিশ্বাস সবগুলিই ফাশিস্টেরা সগর্ব্বে ত্যাগ করেছে। শ্রেণী-প্রত্যয়ের প্রভাব, শ্রেণী-সঙ্ঘর্ষে বিশ্বাস, শ্রেণীবিহীন সমাজের আদর্শ, ইতিহাসের বাস্তব ব্যাখ্যা, আর্থিক শোষণের ধারণা, স্টেটের প্রকৃতি সম্বন্ধে মত—এককথায় মার্ক্স্‌বাদের সকল অঙ্গই ফাশিস্ট্‌দের কাছে ভ্রান্তি ও প্রমাদ মাত্র। নিরীহ সোশ্যাল্-ডেমক্রাট্‌দের সম্বন্ধেও ফাশিস্ট্‌দের কোন আস্থা নেই, কারণ সমাজতন্ত্রের সকল শাখার মূলগত ঐক্য অর্থাৎ সাধারণস্বত্ত্বের ভিত্তির উপর ভবিষ্যৎ-সমাজ গঠনের উদ্যম ফাশিস্ট্‌দের সম্পূর্ণ পরিত্যজ্য—ব্যক্তিগত সম্পত্তির পূর্ণ-অধিকার ফাশিজ্‌ম্ কার্য্যতঃ স্বীকার করে'ই নিয়েছে। এপর্য্যন্ত সুতরাং ধনতন্ত্রের পুরাতন সমর্থকদের থেকে ফাশিস্টেরা বিভিন্ন নয় এবং তাদের নূতন-সমাজ গঠনের কথা বলার সার্থকতা নেই। ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মাঝামাঝি কোন অবস্থা কল্পনা করাও সহজ নয়। কিন্তু ফাশিজ্‌মের মধ্যেও কিছু নূতনত্ব আছে। সেই নতুন ভাব উদারনীতি ও গণতন্ত্রের বর্জ্জনে দেখা যায়। ধনতন্ত্রের জয়যাত্রার সময় উদার-গণতন্ত্রেরও দিগ্বিজয় হয়েছিল—ধনিকপ্রভুত্ব প্রসারের সঙ্গেই ডেমক্রাটিক্ আদর্শ

সর্ব্বত্র স্থাপিত হয়। তার পর তাই ধনতন্ত্রের সংকোচন ও সাম্রাজ্যবাদের চাপে আসন্ন বিপদের দিনে ডিমক্রাসির বাধাপ্রাপ্তিও আশ্চর্য্য নয়। ফাশিস্ট্-থিওরিতে প্রথমতঃ মার্ক্সের শ্রেণীর সম্বন্ধে ধারণাকে ধ্বংস করবার জন্য জাতীয়-ঐক্যের আরাধনা করা হয়; শ্রমিকদের সাম্যবাদ থেকে রক্ষা করবার উদ্দেশ্যে রেস্ বা নেশনের মাহাত্ম্যের উপর জোর পড়ে; দেশের মধ্যে আর্থিক চাপ এড়াবার নিমিত্ত সাম্রাজ্য-গঠন, রাজ্যবিস্তার ও যুদ্ধের গুণগান ওঠে। দ্বিতীয়তঃ, ফাশিস্ট্দের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে গণতন্ত্রের ফলে শুধু বিপ্লবের আশঙ্কাই সর্ব্বত্র মাথা তুলতে পেরেছে। অতএব ডিমক্রাসি বর্জ্জনীয়, রাষ্ট্রব্যবস্থায় জনগণের সাক্ষাৎ-কর্ত্তৃত্ব রাখা ভুল, ব্যক্তিস্বাধীনতারও সীমা থাকা উচিত। তাই তখন শোনা যায় সমগ্রগ্রাসী স্টেটের বন্দনা, রাষ্ট্রের নৈতিক রূপ বর্ণনা আর কর্ণধার নেতার প্রয়োজন ব্যাখ্যা। ফাশিস্মোর এই প্রকৃত স্বরূপ হ'লে বোঝা সহজ কিসের জন্য ইটালি ও জার্মানির মতন যেখানে ধনতন্ত্র বিপন্ন হ'য়ে পড়ে সেখানেই ফাশিস্ট্দের অভ্যুদয় হয়েছিল।

১১

আর্থিক সঙ্কট

মহাযুদ্ধের পরবর্ত্তী কুড়ি বছরের ইতিহাস সহজেই দুই প্রায় সমান অংশে ভাগ করা যায়। এর প্রথম দিকটায় শান্তি ও সমৃদ্ধির আশা বলবতী ছিল, কিন্তু শেষের দিকে বেশী চোখে পড়ে দুরবস্থা, সঙ্ঘাত ও যুদ্ধের আতঙ্ক। মহাসমরের শেষে নিরুদ্বিগ্ন স্থিতিশীলতার ভাব ইউরোপে গড়ে' উঠতে না উঠতে অশান্তি ও অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ভাবনা সমগ্র মহাদেশ, এমন কি সারা জগতকে গ্রাস করেছে। সাম্প্রতিক ইতিহাসের এই দুই পর্য্যায়কে পৃথক করেছিল জগদ্ব্যাপী এক প্রচণ্ড আর্থিক সঙ্কট। ১৯২৯এ এর আরম্ভ, এবং কয়েক বৎসর পরে তার প্রকোপ কমে' এলেও পৃথিবী এখনও সুস্থ হ'য়ে পূর্ব্বাবস্থায় ফিরতে পারে নি।

১৯১৮ সালে মহাসংগ্রামের অবসান হ'লেও তার জের আরও তিন চার বছর চলেছিল। কিন্তু ক্রমে একদিকে তুরস্ক, অন্যদিকে সোভিয়েট্-রাশিয়া আত্মরক্ষায় সমর্থ হ'য়ে দেশ থেকে আততায়ীদের বিতাড়িত করল। ফ্রান্স্ জার্মানিকে সবলে দাবিয়ে রাখার চেষ্টার বদলে ডস্-পদ্ধতির আশ্রয় নিল। সুদূর-প্রাচ্যে শান্তি আন্‌ল ওয়াশিংটন্-চুক্তি। তারপর থেকে প্রায় ১৯৩১ পর্য্যন্ত আন্তর্জ্জাতিক শান্তি ক্রমে ব্যাপকতর হবার প্রত্যাশাই স্বাভাবিক মনে হয়েছিল। লোকার্নো (১৯২৫) পশ্চিম-ইউরোপে শান্তিভঙ্গের বাধা

হিসাবে গণ্য হ'ল ; জার্মানি যোগ দেওয়ায় বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিপত্তি বাড়ে (১৯২৬) ; জেনীভা-প্রোটোকল্ বর্জ্জিত হ'লেও অস্ত্রত্যাগের বিশদ আলোচনা তার পর আরম্ভ হয়েছিল (১৯২৭) ; আমেরিকার প্রস্তাবে কেলগ্ অথবা প্যারিস্-প্যাক্ট্ স্বাক্ষর করে' পৃথিবীর সকল দেশ আন্তর্জ্জাতিক বাদানুবাদ থেকে যুদ্ধবৃত্তির বর্জ্জন ঘোষণা করে (১৯২৮) ; জার্মানির অর্থদণ্ডের ভার আরও লাঘব করার উদ্দেশ্যে ডস্-প্ল্যান্‌কে সংশোধনের পর নূতন ইয়াং-ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ হয় (১৯২৯) আর সেই সঙ্গেই একটা বিশাল আন্তর্জ্জাতিক-ব্যাঙ্কের গোড়াপত্তন ও রাইন্‌ল্যাণ্ড্ থেকে মিত্রসৈন্য অপসারণের ব্যবস্থা হ'ল ; তারপর ফরাসী মন্ত্রী ব্রিয়াঁ কথা তুল্‌লেন (১৯৩০) যে ইউরোপের রাজ্যগুলি একত্রিত হ'য়ে একটি বিরাট সংহত-রাষ্ট্রে আবদ্ধ হোক—তাহ'লেই নাকি সারা জগতে শান্তি ও সমৃদ্ধি অচল ভাবে বিরাজ করবে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে এ-সকল ব্যবস্থার মধ্যে প্রথম থেকেই গলদ ও ফাঁক থেকে গিয়েছিল, এখন সে-দোষ ধরতে পারা অবশ্য অনেক সহজ। ওয়াশিংটনের ব্যবস্থাকে কার্য্যকরী অবস্থায় রাখার মতন ঐক্য ইংল্যাণ্ড্ ও আমেরিকার মধ্যে ছিল না। ডস্-প্ল্যান্ অনুযায়ী করপ্রদানেও জার্মানির উৎসাহের অভাব থেকে যায়, আর সে-ব্যবস্থা নির্ভর করছিল আমেরিকান্ ধনিকদের ক্রমান্বয়ে ধার দিয়ে যাবার প্রবৃত্তির উপর। লোকার্নো পূর্ব্ব-ইউরোপে শান্তিভঙ্গের উদ্বেগ নাশ করতে পারেনি ; জার্মানির লীগে প্রবেশ উপলক্ষ্যে বিস্তর মনোমালিন্য হয়েছিল ; লিট্‌ভিনভের প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়াতে প্রমাণ হয় যে অস্ত্রত্যাগের কথা সাময়িক জল্পনা মাত্র।—

কেলগ্-প্যাক্টের পিছনে ছিল রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রতিপত্তি হ্রাসের এক আমেরিকান্ অভিসন্ধি। তাছাড়া শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলি যুদ্ধত্যাগের এই প্রতিশ্রুতি থেকে কিছু কিছু ব্যতিক্রমের ব্যবস্থা দাবী করায়, সমস্ত কেলগ্-চুক্তিটা অসার হ'য়ে পড়ে। আমেরিকা জানিয়ে দেয় যে মন্‌রো-নীতি অগ্রাহ্য হ'লে তাকে যুদ্ধ করতেই হবে। ইংল্যাণ্ডের দাবী আরও চমকপ্রদ—পৃথিবীর নানা অঞ্চলে (কি কি, তার অবশ্য কোন নির্দ্দেশ ছিল না) ব্রিটিশ্ স্বার্থ-সংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা। কেলগ্-প্যাক্ট্ তাই প্রথম থেকেই হ'ল জীবন্মৃত। এক বিখ্যাত লেখক বলেছেন যে এই চুক্তির একমাত্র ফল যুদ্ধ শব্দটির ব্যবহার বর্জ্জন; এর পর থেকে অন্য দেশকে আক্রমণের সময় আর বলা হয় না যে যুদ্ধ হচ্ছে। —ইয়াং-প্ল্যানের প্রধান বৈশিষ্ট্য, আন্তর্জ্জাতিক-ব্যাঙ্কের, গোড়া কাঁচা ছিল, কেননা প্রবল দেশগুলির স্বার্থের সঙ্ঘাত জগদ্ব্যাপী আর্থিক-কর্ত্তৃত্বের অন্তরায়। যে-কারণে বর্ত্তমানে সার্ব্বভৌম-সাম্রাজ্য কষ্ট-কল্পনা, সেই কারণেই সর্ব্বময় আর্থিক প্রভুত্বের সম্ভাবনাও কম। সাম্রাজ্যতন্ত্রের স্বরূপ সহযোগিতার চাইতে বিভিন্ন রাষ্ট্রের সঙ্ঘর্ষেই বেশী প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক। ইয়াং-ব্যাঙ্ক্ স্থাপনের সময়েও নিউইয়র্ক্, লণ্ডন্ এবং প্যারিসের পারস্পরিক ঈর্ষা প্রকাশ পেয়েছিল; আর জার্ম্মান্ বিশেষজ্ঞেরা বরাবরই বলেছেন যে আর্থিক সহযোগিতা কেবল তখনই সম্ভব হবে, যখন সকলে জার্ম্মানির শ্রেষ্ঠতর কর্ম্মকুশলতার নেতৃত্ব মেনে নেবে।—সব শেষে এ-কথাও মনে রাখা উচিত যে ব্রিয়াঁর প্যান্-ইউরোপের জল্পনা অত্যন্ত ভাসা

ভাসা ছিল। তার প্রধান প্রেরণা সোভিয়েট্-রাশিয়ার বিরুদ্ধে দল গঠন মাত্র, এবং তাই ব্রিয়াঁর প্রস্তাব রাশিয়াকে পাঠানো পর্য্যন্ত হয় নি। কিন্তু সহজেই বোঝা যায় যে অন্ততঃ ব্রিটিশ্-সাম্রাজ্য এই ভাবে অন্যদের সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে সর্ব্বদাই নারাজ থাকবে; সুতরাং ব্রিয়াঁর প্রস্তাব ব্যর্থ হ'ল ব্রিটিশ্ আপত্তি ও ফরাসী-জার্মান্ সন্দেহের মধ্যে।

১৯৩১-এর আগেও তাই ইউরোপে কিছু স্বর্ণযুগ বিরাজ করে নি। তখন ও এখনকার মধ্যে অন্তর্নিহিত বিরোধে বিশেষ তফাৎ নেই, পার্থক্য শুধু প্রকাশের পরিমাণে। কিন্তু অবস্থা যে ১৯৩১-এর পর অনেকাংশেই খারাপ হয়েছে তা' অস্বীকার করা যায় না। আর্থিক সঙ্কট এর একমাত্র কারণ নাও হ'তে পারে, কিন্তু সেই থেকে সমসাময়িক ইতিহাস স্পষ্টতঃই একটা মোড় ফিরেছে। সুতরাং আর্থিক অবস্থার বিশেষ আলোচনা এখানে সম্ভবপর না হ'লেও তার কিছু উল্লেখ অনিবার্য্য। তবে এ-সম্বন্ধে ব্যাখ্যার অনৈক্য এত সুবিদিত যে বলা বাহুল্য যে, এ-বিবরণ একটা বিশিষ্ট মত মাত্র।

মধ্যযুগে ফিউডাল্-ব্যবস্থা অবসানের সময় ধনতন্ত্রের গোড়াপত্তন হয়। নগর থেকে ব্যবসায় ও বাণিজ্যের প্রভাব বিস্তার হওয়ায় উদীয়মান নূতন সভ্যতার বুর্জোয়া অথবা নাগরিক নাম দেওয়া হয়েছিল, আর বণিক ও ব্যবসায়ীরা কৃষক এবং অভিজাতবর্গের 'মধ্যস্থানীয় বলে' ইংরাজিতে মধ্যশ্রেণী কথাটির ব্যবহার হ'ল। এই প্রসঙ্গে এর বাংলা অনুবাদ মধ্যবিত্ত কথাটি অর্থহীন, কারণ বণিকদের বিত্ত অনেক সময় অভিজাতদের চাইতে বেশীই থাকত। বহুদিন

ধরে' তারপর বাণিজ্যের প্রসার চল্‌ল; এই সময় এল ইউরোপের বহির্জগতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ, উপনিবেশ-প্রতিষ্ঠা এবং তাই নিয়ে যুদ্ধবিগ্রহ। এই মার্কেণ্টাইল্ যুগের পর যন্ত্রশিল্পের অভাবনীয় উৎকর্ষ উনিশ শতকের প্রথম দিকে আর্থিক বিপ্লবের আখ্যাই পেয়েছিল। ধনতন্ত্রের পূর্ণপ্রতিষ্ঠা ও বিশ্বব্যাপ্তি গত শতাব্দীকে তার সুবর্ণযুগ করে' রেখেছে। পণ্যসামগ্রী উৎপাদনের ক্ষমতার বিপুল বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু একটা সমস্যা. প্রবলতর হ'তে লাগ্‌ল। সে-বিপদ বিক্রয়ের ব্যবস্থা। মালিকদের লাভই যখন পণ্যোৎপাদনের প্রেরণা, তখন শ্রমপদ্ধতিতে ব্যয়সংকোচ অবশ্য-কর্ত্তব্য। যেহেতু শ্রমজীবিসমাজ অর্থাৎ দেশের অধিকাংশের আয় এই ভাবে সীমাবদ্ধ থাকতে বাধ্য, সেইজন্য যে-পরিমাণে দ্রব্য নূতন যন্ত্রের সাহায্যে প্রস্তুত করা সম্ভব, দেশ মধ্যে তার ততখানি বিক্রয়ের কোন সম্ভাবনা নেই। অথচ প্রতিযোগিতার খাতিরে প্রতি কারবারের উৎপাদন-পরিমাণ বাড়াতে পারা প্রয়োজন, নয়ত ক্ষতির আশঙ্কা থাকে। এই সমস্যা এড়াবার উপায় হিসাবেই প্রতিদেশের ধনিক-সম্প্রদায়ের মধ্যে একদিকে এককর্ত্তৃত্বের একটা ঝোঁক গত শতকের শেষের দিকে দেখা গেল। কব্‌ডেনের কালের স্বাধীন প্রতিযোগিতা আধুনিকতর মনোপলির দিকে এগিয়ে এল। কিন্তু মনোপলির ব্যবস্থায় শ্রমিকদের দাবিয়ে রাখার চেষ্টা বাড়ে বই কমে না। অগ্রসর দেশ মাত্রেই তাই আজ ধনিক-শ্রমিকের স্বার্থ-সম্মিলন দীর্ঘস্থায়ী রাখা দুষ্কর হ'য়ে উঠেছে। অন্যদিকে প্রথম থেকেই অবশ্য ধনিকদের বহির্বাণিজ্যের উপরও নির্ভর

করতে হয়েছিল, লাভের পরিমাণ বজায় রাখার জন্য। ধনতন্ত্রের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে প্রথমে বহির্বাণিজ্যেরও শ্রীবৃদ্ধি হয়, কারণ কাঁচামাল আনয়ন ও যন্ত্রনির্ম্মিত পণ্যদ্রব্যের বিক্রয়, এই দুই ব্যাপারেই বিদেশে ক্রয়বিক্রয়ের ব্যবস্থা অপরিহার্য্য হ'য়ে পড়ে। তাছাড়াও ব্যয়সঙ্কোচের খাতিরে দেশমধ্যে অধিকাংশের উপার্জ্জিত আয় সীমাবদ্ধ থাকাতে, প্রতিদেশকেই প্রস্তুত পণ্য বাইরে চালানের প্রচণ্ড উদ্যম করতে হয়। এ-অবস্থায় বিদেশী বাজার নিয়ে কিছু দিনের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে যাওয়া বিচিত্র না। এক দেশের মধ্যে আর্থিক এককর্ত্তৃত্ব স্থাপন ট্রাস্ট্ ইত্যাদির মধ্য দিয়ে অনেকখানি সম্ভব, নানা রাষ্ট্রে বিভক্ত পৃথিবীতে সে-ব্যবস্থার সম্ভাবনা কম। সে-কর্ত্তৃত্ব কোন না কোন মণ্ডলীর স্বার্থপ্রণোদিত হবে, আর শক্তিশালী অন্য ধনিক-সম্প্রদায়েরা বহুদিন সে-প্রভুত্ব কিছুতেই সহ্য করবে না। তাই আর্থিক রেষারেষি আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্কে এখন প্রধান কথা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। আর্থিক চাপ এইভাবে প্রধান রাষ্ট্রগুলিকে পরস্পরের বিরোধী করে' রাখ্ছে; সে-বিরোধের যুদ্ধ বা চুক্তির ফলে মাঝে মাঝে সাময়িক প্রশমন হ'লেও, প্রকৃতিগত দ্বন্দ্ব আবার ফুটে বের হচ্ছে। জটিলতা বেড়েছে আর একদিক থেকেও। সঞ্চিত মূলধন খাটিয়ে সাময়িকভাবে বেশী লাভের প্রত্যাশায় ধনিকেরা অনেক সময় অনুন্নত বিদেশে টাকা ধার দেয়। সে-টাকায় অবশ্য হয় সেখানকার যন্ত্রশিল্পেরই উৎকর্ষ। কিছুদিন পর সেই দেশজাত পণ্যদ্রব্যই স্বদেশের বাজারে উত্তমর্ণদের দেশাগত সামগ্রী বিক্রয়ের বাধা হ'য়ে দাঁড়ায়। এই ভাবে নানাদিক

থেকে ধনিক-আমল জটিল রূপ নেওয়াকেই আজকালকার ভাষায় আর্থিক-সাম্রাজ্যতন্ত্রের নামে অভিহিত করা হয়। গত ষাট সত্তর বছরের ইতিহাসের এই হচ্ছে মূল উপাদান।

ধনতন্ত্রের প্রগতি এইভাবে হ'য়ে থাকলে বুঝতে হবে যে সাম্প্রতিক আর্থিক সঙ্কট আকস্মিক বিপর্য্যয় কিম্বা যুদ্ধের সাময়িক ফল মাত্র নয়। মহাসংগ্রামের আগেই ধনিক-ব্যবস্থার সমস্যা প্রকট হ'য়ে উঠ্‌ছিল, তার প্রকোপ এখন শুধু বৃদ্ধি পেয়েছে। আগেও মাঝে মাঝে হঠাৎ আর্থিক সঙ্কট দেখা দিত, তবে এখন আর বিপর্য্যয়ের বিশৃঙ্খলার পর সমৃদ্ধির পুনরুদ্ধার আগের মতন সম্পূর্ণ হচ্ছে না। একটা বিশাল যন্ত্রের বিকলোন্মুখ অবস্থার সঙ্গে এখনকার সাদৃশ্য মনে আসা তাই স্বাভাবিক। যুদ্ধের অব্যবহিত পরে স্বভাবতঃই অবশ্য আর্থিক দুরবস্থা দেখা গিয়েছিল। শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার প্রচণ্ড চেষ্টার সে-সময় লক্ষ্য ছিল যুদ্ধ-পূর্ব্বের অবস্থার পুনর্প্রতিষ্ঠা। আর্থিক জগতে ভারসাম্য তারপর অনেকখানি ফিরে এলেও কিন্তু ঠিক আগেকার স্বাস্থ্য তখন পুনরুদ্ধার হয় নি। আমেরিকার হাতে অধিকাংশ বিজয়ী দেশ যুদ্ধশেষে ঋণজালে জড়িত হ'য়ে পড়ে, ওদিকে স্বাভাবিক সম্পদের প্রাচুর্য্যে এবং ব্যবসায়ে কৃতিত্বের ফলে আমেরিকার মোট রপ্তানি আমদানীর চাইতে বেশী ছিল। এর ফলে কিছুদিন যুক্তরাষ্ট্রে সারা পৃথিবীর সোনা গিয়ে সঞ্চিত হ'তে লাগ্‌ল। এক বিচক্ষণ লেখকের কথায় আমেরিকার অবস্থা দাঁড়াচ্ছিল মাথায় অতিরিক্ত রক্ত চলে' যাবার অনুরূপ। ফলে আমেরিকার অপর্য্যাপ্ত মূলধন

অন্যত্র চালাবার প্রয়োজন হয়—১৯২৪এর ডস্-প্ল্যান্ তারই প্রতীক। জার্মানিতে এবং অন্যত্র এইবার সহজে টাকা ধার পাওয়ার কল্যাণে ব্যবসা-বাণিজ্যে একটা সাড়া পড়ে' গেল। বছর পাঁচেক ধরে' এর পর চারিদিকেই দ্রুত উন্নতির চিহ্ন দেখা যায়। মনে হ'ল যে সামরিক অবসাদ এতদিনে কেটে গেল, এবার থেকে ক্রমোন্নতির পথ বোধ হয় উন্মুক্ত ও অবাধ। তৎকালীন চিন্তার রাজ্যে এর প্রতিধ্বনি পাওয়া সহজ। ধনতন্ত্র এতদিনে সংগঠিত হ'ল, অগ্রসর দেশগুলিতে অন্ততঃ দারিদ্র্য এবার ধ্বংস পাবে, আমেরিকায় শ্রমিকদের উচ্চ বেতনের হার কিম্বা জার্মানিতে যন্ত্রশক্তির নূতন নূতন প্রয়োগ ধনিকজগতে নবযুগের সূত্রপাত করছে—এই সব ছিল সেদিনকার কথা। এতে অভিভূত হ'য়ে হিল্‌ফার্‌ডিং ও কাউট্‌স্কি মার্ক্স্‌ভক্ত হ'য়েও বল্লেন যে এবার অতিকায় সার্ব্বভৌম সাম্রাজ্যতন্ত্র আসন্ন প্রায়।

কিন্তু এ-সমৃদ্ধির মূল দৃঢ় ছিল না। পূর্ব্ব ঋণের নিয়মিত সুদ দেবার জন্য ক্রমাগত নূতন ঋণের বন্দোবস্ত বেশীদিন চলে না। ঋণের বোঝা স্তূপাকার হ'য়ে উঠতে থাকলে এক সময় মহাজন টাকা ধার দিতে ভয় পাবে, আর তখন সমস্ত ব্যবস্থা হঠাৎ ভেঙ্গে পড়বার সম্ভাবনা। ১৯৩০ আন্দাজ জার্মানির বেলায় আমেরিকার থেকে অর্থস্রোত প্রায় বন্ধ হ'য়ে গেল। ডস্-প্ল্যান্ ও এমনকি ১৯২৯-এর ইয়াং-ব্যবস্থাও প্রায় আশী বছর ধরে' জার্মানির অর্থদণ্ড দেবার বন্দোবস্ত করেছিল, অকস্মাৎ সব হ'য়ে গেল ওলোটপালট। জার্মানির আর তখন টাকা দেবার অবস্থা রইল না। বার্ষিক দেয়ের থেকে সাময়িক অব্যাহতি তখন জার্মানিকে

দিতেই হয়—এই সিদ্ধান্তের নাম হুভার্ মোরেটরিয়াম্ (১৯৩১)। ততদিনে নানা কারণে আর্থিক প্রলয় এমন ঘনিয়ে এসেছিল যে ধনিকতন্ত্রের ধ্বংসপ্রাপ্তির আতঙ্কের ছায়ায় লসান্-বৈঠকে যে-চুক্তি হ'ল (১৯৩২), জার্মানির কাছ থেকে ক্ষতিপূরণের সকল দাবীর এতদিন পর সম্পূর্ণ বর্জ্জনই তার চূড়ান্ত ফল দাঁড়ায়। কিন্তু মিত্রশক্তিরা বরাবর বলে' এসেছিল যে জার্মানির কাছ থেকে অর্থদণ্ড আদায় ছাড়া তাদের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের ঋণশোধ অসম্ভব। অবশ্য ন্যায্যতঃ সাধারণ ঋণ পরিশোধ আর পরাজয়ের শাস্তি হিসাবে অর্থদণ্ড—এদের মধ্যে বিস্তর প্রভেদ। তবুও ১৯৩৪-এর মধ্যে ইংল্যাণ্ড্ পর্য্যন্ত আমেরিকার কাছে ঋণশোধের দায়িত্ব অস্বীকার করল।

সমরঋণ অথবা ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়ার চাইতে আর্থিক সঙ্কট অবশ্য অনেক বেশী ব্যাপক ছিল—তার কবল থেকে সে-সময় সম্ভবতঃ রাশিয়া ছাড়া কোন দেশই বাদ পড়েনি। উত্তরসামরিক তথাকথিত সমৃদ্ধির সময়ও সব চেয়ে সম্পন্ন দেশ আমেরিকাতে পর্য্যন্ত জাতির আর্থিক সামর্থ্যের এক পঞ্চমাংশের কিছুই করবার ছিল না (ব্রুকিংস্ ইন্স্টিটিউশনের হিসাব)। আর্থিক সঙ্কট উপস্থিত হবার পরের অবস্থা সুতরাং সহজেই অনুমেয়। আপেক্ষিক সমৃদ্ধির সময়ে প্রত্যেক দেশে লাভের তাড়নায় উৎপন্ন সামগ্রী বেড়ে চললেও ধনিকতন্ত্রের পুরানো সমস্যা লোপ পায় নি, কিছু দিনের মধ্যে তার তাই পুনরাবির্ভাব ও বিস্তারলাভ হ'ল। পণ্যদ্রব্য-ক্রেতার অভাব দেখা গেল, বিশেষ করে' খাদ্য-সামগ্রী ও কাঁচা মালের। পৃথিবীর

লোকদের তখন অবশ্য হঠাৎ অভাব মিটে যায় নি কিন্তু কিনবার আর্থিক ক্ষমতা না থাকলেই বাজারে চাহিদা কমে যায় অর্থনীতির এ-প্রস্তাব সুবিদিত। তাই দেশে দেশে মাল সঞ্চিত এমন কি বিনষ্ট হ'তে থাকল, অথচ লোকদের অভাব থেকেই গেল। ওদিকে ধনতন্ত্রের মূলব্যবস্থা অনুযায়ী অধিকাংশ লোকের আয় সীমাবদ্ধ ; লাভ বাড়াবার জন্য ব্যয়-সংকোচের প্রচণ্ড চেষ্টায় সে-সীমা আরও নীচে নেমে আসে। অথচ ব্যয়সংকোচের চেষ্টা হ'য়ে পড়ে অপরিহার্য্য, কারণ বেতন-বৃদ্ধির ফলে হবে ব্যবসায়ে অধিক ব্যয় আর দেশস্থ কিম্বা বিদেশী প্রতিযোগিতার কাছে সম্পূর্ণ পরাজয়। ১৯২৯এ সমস্যা আমেরিকাকে বিচলিত করতে আরম্ভ করে, দুই বছরের মধ্যে সমস্ত পৃথিবী আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ে। ১৯৩১এ মধ্য-ইউরোপে ক্রেডিট্ আন্স্টাল্ট্ ব্যাঙ্কের পতন খণ্ড-প্রলয়ের সৃষ্টি করল। আমেরিকার অর্থশক্তির কেন্দ্র ওয়াল্ ষ্ট্রীট্ পর্য্যন্ত তারপর মুহ্যমান হ'য়ে আসে। তখনকার দুর্দ্দৈব ও অবসাদ আজ পর্য্যন্ত সকলের স্মরণে আছে। যুদ্ধের পর নিউইয়র্ক্ ও লণ্ডনের মধ্যে আর্থিক প্রাধান্য নিয়ে একটা প্রচণ্ড রেষারেষি আরম্ভ হয়। অশেষ কষ্টস্বীকারের পর ১৯২৫এ ইংল্যাণ্ডে স্বর্ণমান ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। এই বহুনিন্দিত বন্দোবস্তের মূলে ছিল ব্রিটিশ্-ডোমিনিয়ান্‌গুলির আমেরিকার কাছে সোনার শিকলে বাঁধা পড়বার ভয় এবং সে-ভয় নিরাকরণের প্রবল প্রচেষ্টা। ছয় বছর চেষ্টার পর স্বর্ণমান বজায় রাখা অসম্ভব বোধে ১৯৩১এ সঙ্কটের সময় ইংল্যাণ্ডে এ-ব্যবস্থা পরিত্যক্ত হ'ল।

সর্ব্বনাশের সময় অর্দ্ধেক ত্যাগ করা পণ্ডিতদের উপদেশ। সঙ্কটের পর ভাগ্য ফেরাবার চেষ্টা সেই মর্ম্মেই হয়েছিল, যদিও তারপর ভবিষ্যতের জন্য ভরসা ক্ষীণতর হ'তে বাধ্য। দুর্দ্দিনে বাইরের সম্পর্ক গুটিয়ে এনে কোণে আশ্রয় নেবার প্রবৃত্তি-ও দেখা যায়। তাই আর্থিক ব্যাপারে আত্মনির্ভর হবার চেষ্টা—অটার্কি—এখন নানাদিকে রূপ নিল। ১৯৩২এ সাধের অবাধ-বাণিজ্য বিসর্জ্জন দিয়ে ইংল্যাণ্ড্ সংরক্ষণনীতির পূর্ণ আশ্রয় নেয়। সেই বছরই সাম্রাজ্যের চারিদিকে বেড়া তোলবার চেষ্টা হ'ল অটোয়া-চুক্তিতে। কিন্তু বাজার নিয়ে কাড়াকাড়ি এত সহজে মেটে না, বিদেশের সঙ্গে যোগ ছিন্ন হ'লে আর্থিক ব্যবস্থাও বিকল হ'য়ে পড়ে। স্বর্ণমান ত্যাগের পর আমেরিকার থেকে সস্তায় পণ্যবিক্রয় ইংরাজদের পক্ষে সহজ হয়েছিল। তারই উত্তরে ১৯৩৩এ যুক্তরাষ্ট্রের কর্ত্তৃপক্ষেরা ডলার্‌কে স্বর্ণমান থেকে চ্যুত করলেন। মহাশক্তিগুলির মধ্যে এ-জাতীয় বিরোধ ভয়ের কারণ না হ'লে দর্শকদের যথেষ্ট আনন্দ দিতে পারত, একথা নিঃসন্দেহ।

আর্থিক সঙ্কটের পর গত পাঁচ বছরে পৃথিবী অনেকটা সাম্‌লে নিয়েছে অবশ্য, কিন্তু দশ বছর আগেকার আশা ও আত্মস্থ ভরসা এখন সুদুর্ল্লভ। প্রচণ্ড কোন ধাক্কার পর ভবিষ্যতের জন্য ভয় থাকাও স্বাভাবিক। তাছাড়া, এ-কথা মনে রাখা উচিত যে এখন অবস্থা কিছু ফিরলেও তার অনেকখানির জন্য দায়ী যুদ্ধের আয়োজন। অস্ত্রসজ্জার ব্যাপক উদ্যোগে আর্থিক অবসাদ কিছু কাটে এ-কথা পরীক্ষিত সত্য, কিন্তু সে-বিরাম সাময়িক, আর তার ফলে শেষ পর্য্যন্ত বিপদ আরো বাড়বারই আশঙ্কা থাকে।

১২

হ্বাইমার্-আমলের শেষ

জার্মানিতে মহাসমরের অবসান হয়েছিল বিপ্লবে। এর পঞ্চাশ বছর আগে বিস্মার্কের নেতৃত্বে প্রাশিয়া যখন জার্মান্-সাম্রাজ্য গড়ে' তোলে, তখন পূর্ব্বতন যুগের উদার-মতবাদীদের সম্পূর্ণ পরাজয় হয়েছিল। বিস্মার্ক্ নিয়মতন্ত্র-বাদকে সদম্ভে পদদলিত করেছিলেন। নূতন সাম্রাজ্যে জনসাধারণ-নির্ব্বাচিত রাইশ্স্টাক্-মহাসভার সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু শাসনপদ্ধতিতে প্রতিনিধিদের মন্ত্রিসভা নিয়োগ বা বিতাড়নের কোন ক্ষমতা থাকে নি। তাই সোশ্যাল্-ডেমক্রাট্ দল দেশমধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ হ'লেও ১৯১৮র আগে শাসনযন্ত্রে তাদের কোন স্থানই ছিল না। রাজ্যশাসন তখন চল্‌ত সম্রাটের নির্দ্দেশে তাঁর আশ্রয়াধীন মন্ত্রীদের দিয়ে, এবং ব্যাভেরিয়া প্রমুখ খণ্ডরাজ্যের অধিপতিদেরও নিজের দেশে ক্ষমতা ও সাম্রাজ্য-চালনেও কিছু প্রভাব দেখা যেত। উনিশ শতকের প্রচলিত উদার-মত সাম্রাজ্যশাসনকার্য্যে বর্জ্জিত হ'লেও কিন্তু দেশমধ্যে একেবারে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় নি। জার্মান্ সোশ্যালিস্ট্-মহলে গণতন্ত্রের আদর্শ সজীব রইল। বস্তুতঃ নামে গোঁড়া মার্ক্স্‌বাদী হ'লেও সোশ্যাল্-ডেমক্রাট্ দলই তখন কার্য্যতঃ দেশে উদারনীতির নিদর্শন-হিসাবে বিরাজ করত। রোসা লুক্সেম্‌বুর্গ্ ও লেনিনের তীব্র সমালোচনার আগে মার্ক্সীয়দের মধ্যে উদার-গণতন্ত্র সম্বন্ধে

এই প্রীতির যুক্তিযুক্ততার বিষয়ে সন্দেহ ওঠে নি। ফরাসী শ্রমিকনেতা জরে একবার বিদ্রূপ করেছিলেন যে জার্মান্ সোশ্যালিস্ট্‌রা যাই করুক না কেন, পণ্ডিত কাউট্‌স্কি তার মার্ক্সীয় ব্যাখ্যা বের করে' ফেল্‌বেন।

১৯১৮ পর্য্যন্ত জার্মান্-সাম্রাজ্যের এই প্রথম দশা টিক্‌ল—তখন পর্য্যন্ত সম্রাট্ ও তাঁর পার্শ্বচরদের ক্ষমতা প্রায় অব্যাহত ছিল। অবশ্য এ-প্রভুত্ব শুধু কয়েকটি ব্যক্তির নয়, এদের নেতৃত্ব মুখ্যতঃ প্রাশিয়ায় য়ুঙ্কার্ নামে খ্যাত জমিদারবর্গের প্রতিভূস্বরূপ। পূর্ব্ব-প্রাশিয়ার ভূস্বামীদের সঙ্গে পশ্চিম-জার্মানির ধনিকপ্রবরদের কিছু প্রভেদ থাকলেও তাদের মূলগত স্বার্থের সঙ্ঘাত প্রবল ছিল না। তাই ব্যবসায়ী ধনকুবেরদের স্বার্থসন্ধানও কাইজার্‌তন্ত্রের লক্ষ্য হ'য়ে ওঠাতে বাধে নি। তাছাড়া প্রাশিয়া-রাষ্ট্রের অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশক্তির উপাসনা আর স্টেট্-পূজাও জার্মান্‌দের বৈশিষ্ট্য হ'য়ে উঠেছিল, আজ পর্য্যন্ত জার্মানিতে সে-ঐতিহ্যের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ফ্রান্স্ বা ইংল্যাণ্ডের তুলনায়, আধুনিক আর্থিক ও রাষ্ট্রিক আবহাওয়ায় জার্মানি নবাগত, তাই তার নিজের অবস্থান সুদৃঢ় করে' নেবার প্রয়োজনেই এ-বৈশিষ্ট্য গড়ে' উঠেছে—নতুবা জার্মানির মধ্যযুগে এ-ঐতিহ্যের অভাবই লক্ষিত হয়। অনেকটা রাশিয়ার মতনই, গণতন্ত্র ও উদারনীতি তাই প্রাক্‌সামরিক জার্মানিতে বদ্ধমূল হ'তে পারে নি।

১৯১৮ সালের শেষে জার্মানিতেও রাশিয়ার অনুরূপ বিপ্লব সম্ভব ছিল, কিন্তু নানা কারণে এখানে বিপর্য্যয় ভিন্ন আকার ধারণ করল। তবুও ১৯১৮র নভেম্বরে জার্মান্

রাইশ্‌ বা রাজ্যের দ্বিতীয় দশার আরম্ভ হয়। যুদ্ধাগমে সোশ্যাল্‌-ডেমক্রাট্‌রা সম্রাটকে সমর্থন করে' থাকলেও, তাদের মধ্যে এক দল হাসের নেতৃত্বে যুদ্ধবিরোধী হ'য়ে পড়েছিল (১৯১৬)। যুদ্ধ-জয়ের আশা ক্ষীণ হ'তে থাকলে ত্ব'দিকেই চরমপন্থার আবির্ভাব দেখা যায়। ফরাসী-বিপ্লবের পর থেকে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে বাম, দক্ষিণ ও মধ্য এই তিনটি নাম মত-বিশ্বাসের নির্দ্দেশক হিসাবে ব্যবহৃত হ'য়ে এসেছে। যারা আমূল পরিবর্ত্তনে অনুরাগী তাদের বামপন্থী, আর যারা ঠিক তার বিরোধী হিসাবে প্রচলিত ব্যবস্থার পূর্ণ সংরক্ষণ অথবা অতীতে প্রত্যাবর্ত্তন-চেষ্টার সমর্থক তাদের দক্ষিণমার্গীয় বলা হয়। আর এই উভয় জাতীয় চরম মনোভাব যারা এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে, তাদের পরিচয় মধ্য বিশেষণটিতে। ১৯১৬ সালে জার্মানিতে একদিকে কার্ল্‌ লাইব্‌নেক্‌ট্‌ ও রোসা লুক্সেম্‌বুর্গের নেতৃত্বে চরম বামপন্থীগণ স্পার্টাসিস্ট্‌-দলের সূত্রপাত করে, অন্যদিকে আড্‌মিরাল্‌ টির্‌পিট্‌স্‌ সোশ্যালিজ্‌মের ঘোর শত্রু পিতৃভূমি-দলের ভিত্তিস্থাপন করলেন। মহাযুদ্ধের শেষের দিকে ক্রমশঃ বামমার্গীয় দলগুলি পুষ্টিলাভ করতে লাগ্‌ল—রুষ-বিপ্লব অবশ্য তাদের মধ্যে নূতন উৎসাহ এনে দেয়। যুদ্ধে পরাজয় অবশ্যম্ভাবী হ'য়ে পড়লে, সম্রাট শেষে (অক্টোবর্‌, ১৯১৮) প্রিন্স্‌ ম্যাক্সের নূতন মন্ত্রিসভায় সোশ্যালিস্ট্‌ নেতাদের আসন দিলেন—বামপন্থার সঙ্গে শাসনযন্ত্রের এতদিনে প্রথম সংযোগ হ'ল। কিয়েলে নাবিক-বিদ্রোহের পর দেশের সর্ব্বত্র শ্রমিক-সমিতির উদয় হ'তে লাগ্‌ল রুষ সোভিয়েটের অনুকরণে। ব্যাভারিয়ায় কুর্ট্‌ আইস্‌নারের নেতৃত্বে এক রেপাব্লিক্‌ স্থাপিত হ'ল ৮ই

নভেম্বর্। পরদিন সোশ্যাল্-ডেমক্রাট্ নেতা শাইড্মান্ দেশব্যাপী ধর্ম্মঘট ও বিপ্লবের ভয় দেখিয়ে কাইজার্কে সিংহাসন ছাড়তে বাধ্য করলেন। মূল সোশ্যাল্-ডেমক্রাট্ ও স্বতন্ত্র-সোশ্যালিস্ট্ এই দুইটি বামপন্থীদলের তিন তিন জন নেতা মিলে একটি সমিতি তারপর রাজ্যভার নিয়ে যুদ্ধবিরতির প্রস্তাব গ্রহণ করে (১১ই নভেম্বর, ১৯১৮)। এইভাবে রাশিয়ার ঠিক এক বছর পরে জার্মানিও সোশ্যালিস্ট্দের করায়ত্ত হ'ল।

কিন্তু সাদৃশ্যের শেষ এইখানেই। লেনিনের দল মার্ক্স্ ও এঙ্গেল্সের প্রকৃত নির্দ্দেশ অনুযায়ী দেশে শ্রমিক-অধিনায়কত্ব স্থাপন করে। জার্মানিতে স্পার্টাসিস্ট্দের খানিকটা সেই অভিপ্রায় ছিল, আর হাসের স্বতন্ত্র-সোশ্যালিস্ট্ দলও দ্বিধাভরে সেই দিকেই ঝুঁক্ছিল। কিন্তু বিশাল সোশ্যাল্-ডেমক্রাট্ দলের এতদিনকার শিক্ষা দীক্ষা হ'ল তার বিরোধী। বিপ্লবের পরও এককর্ত্তৃত্বের ব্যবস্থা কাউট্স্কি প্রভৃতির কাছে মার্ক্স্বাদের বিকৃতিই মনে হয়েছিল। তাছাড়া জার্মানিতে সোভিয়েট্তন্ত্র স্থাপন মিত্রশক্তিরা কতদূর হ'তে দিত সে কথাও বিবেচ্য। সে যাই হোক, বল্শেভিকী অভদ্রতা জার্মান সমাজতন্ত্রীরা সযত্নে বর্জ্জন করল। সোশ্যাল্-ডেমক্রাট্ নেতারা ঠিক করলেন যে যত শীঘ্র সম্ভব সমস্ত জনগণের ভোটে নির্ব্বাচিত এক মহাসভা আহ্বান করা হবে দেশের ভবিষ্যৎ শাসনপদ্ধতি নির্দ্ধারণ করবার জন্য। ১৯১৯ সালে এই জাতীয়-মহাসভা অনেক আলোচনার পর পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক আদর্শে এক শাসন-পত্রিকা প্রস্তুত করে। সভার অধিবেশন-ক্ষেত্র হ্বাইমার্ নগরীর নাম

থেকে হ্বাইমারি শাসনপদ্ধতি, পন্থা, আমল ইত্যাদি কথার উদ্ভব।

সাম্যবাদীদের মতে শাইড্মান্, এবার্ট্ প্রভৃতি নেতার দারুণ ভুল হয়েছিল। বিপ্লবের পর ক্ষমতা হাতে পেয়েও তাঁরা অম্লানবদনে শ্রমিকদের তরফ থেকে রাজদণ্ড অধিকার-চ্যুত হ'তে দিলেন। অথচ রাষ্ট্রশক্তি কেড়ে নেওয়াই হ'ল বিপ্লবের গোড়ার কথা। আসলে জোর করে' শাসনতন্ত্র হাতে রাখা সোশ্যাল্-ডেমক্রাট্দের কাছে অন্যায় মনে হয় আর ১৯১৯এ প্রমাণ হ'ল যে দেশের অধিকাংশ লোক সমাজতন্ত্রে দীক্ষিত হয় নি, তারা তখনও পরিচিত গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পেলেই সন্তুষ্ট থাকবে। বিপ্লবের পূর্ব্বে বা অব্যবহিত পরে জনমতের এই অবিচলিত আনুগত্য সাম্যবাদীদের কাছে বুর্জোয়া আদর্শ কিম্বা তার ভান মাত্র। ১৯১৯এ জার্মানিতে সমাজতন্ত্র গঠনচেষ্টার এ-সুবিধা ছাড়া সেই থেকে মার্ক্স্-পন্থীদের নিন্দিত হ'য়ে এসেছে। দুঃখের বিষয় সোশ্যাল্-ডেমক্রাট্দের জনমত ও গণতন্ত্রে এত নিষ্ঠা পরিণামে দক্ষিণ-পন্থীদের হাতে শুধু নির্য্যাতনই লাভ করেছিল। বিপ্লবের উদ্দীপনা নিবে এলে ক্রমে শাসনযন্ত্র থেকেও সোশ্যালিস্ট্ দলের নেতারা বিতাড়িত হলেন। নিঃশ্বাস ফেলবার অবসর পেয়ে দক্ষিণমতবাদীরাও নিজেদের শক্তি সঞ্চয় ও সংগঠন করতে পারল। জার্মানির ধনিকেরা ১৯১৯এ অতর্কিত ভাবে শ্রমিকদের হাতে গিয়ে পড়ে। ভবিষ্যতে যাতে এমন বিপদ আর না হয় তার জন্য তারা এর পর সাবধান হয়। হিট্লারি দলের সোশ্যালিস্ট্-দমনে কৃতিত্ব একবার প্রমাণিত হবার পর এদের সে-আন্দোলনের অকুণ্ঠ সমর্থন এইজন্যই।

স্পার্টাসিস্ট্‌দের অসন্তোষ প্রথম থেকেই শান্তিভঙ্গের সূত্রপাত করেছিল, এবার্ট্‌ প্রভৃতি নেতার বিরুদ্ধে তারা তখন শ্রমিকদের উত্তেজিত করছিল। স্বতন্ত্র-সোশ্যালিস্ট্‌ দলের প্রতিনিধিরাও ক্ষুব্ধ হ'য়ে পদত্যাগ করলেন। এই দলটি পরে ভেঙ্গে যায়—কিছু সোশ্যাল্‌-ডেমক্রাট্‌দের সঙ্গে যোগ দিল, আর বাকী স্পার্টাসিস্ট্‌দের মতন জার্মান্‌ সাম্যবাদীদলের অঙ্গ হ'য়ে পড়ে। সোশ্যাল্‌-ডেমক্রাট্‌ নেতারা এর পর স্পার্টাসিস্ট্‌দের সবলে দমন করতে আরম্ভ করলেন। লাইব্‌নেক্‌ট্‌ ও লুক্সেম্‌বুর্গ্‌ নিহত হলেন (১৯১৯)। ব্যাভিরিয়ায় আইস্‌নারও প্রাণ হারান। নোস্‌ক্‌ নামে এক সোশ্যাল্‌-ডেমক্রাট্‌ নেতা চরমপন্থী বামমার্গীয়দের শিক্ষা দেবার জন্য একদল স্বেচ্ছাসৈনিক পর্য্যন্ত সংগ্রহ করেন। মিউনিকে সোভিয়েট্‌-স্থাপনের চেষ্টা অস্ত্রবলে নির্ম্মূল করা হ'ল। শান্তিরক্ষার খাতিরে এই সময় যে-সব দল গড়ে' ওঠে তাদের হাতের অস্ত্র কিছুদিন পর দক্ষিণপন্থীদের অশেষ কাজে লেগেছিল। জার্মান্‌ শ্রমিক-সাধারণের তখনও সঙ্ঘবদ্ধ শক্তি প্রচুর ছিল। ১৯২০তে রেপাব্লিকের বিরুদ্ধে কাপের বিদ্রোহ শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘটের সাহায্যেই অঙ্কুরে নাশ করে। মিউনিকে হিট্‌লারের বিদ্রোহচেষ্টাও ব্যর্থ হ'ল ১৯২৩এ। কিন্তু জার্মান্‌ শ্রমিক-সমাজ সোশ্যাল্‌-ডেমক্রোট্‌ নেতাদের নির্দ্দেশ শান্তভাবে মেনে চলেছিল যদিও শাসনকার্য্যে সমাজতন্ত্রীদের কর্ত্তৃত্ব ক্রমশঃ ক্ষীণ হ'য়ে পড়ে। অন্যদিকে স্যাক্সনি, তুরিঙ্গিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে কমিউনিস্ট্‌দের দমন ধীরে ধীরে দেশে দক্ষিণপন্থীদের শক্তি বাড়িয়ে চল্‌ল।

জার্মানিতে হ্বাইমারি-আমল এইভাবে আরম্ভ হয়। প্রথমে কিছুদিন সোশ্যালিস্ট্ মন্ত্রীরা রাজ্যশাসন করেছিলেন কিন্তু তাঁরা নিজেদের মতবিশ্বাস অন্যদের উপর চাপাবার চেষ্টা থেকে সযত্নে বিরত থাকলেন। দেশে একটা আর্থিক-সংসদ গঠন, ফ্যাক্টরিতে শ্রমিক-সমিতি স্থাপন, ইত্যাদি নবযুগের যে-সব আভাস শাসনপত্রিকায় প্রথমে স্থান পেয়েছিল, ক্রমে সে-সমস্তই অচল হ'য়ে পড়ে। সোশ্যাল্-ডেমক্রাট্দের দুর্ভাগ্যবশতঃ তাদের শাসনকালে অনেক ঝড় বয়ে যায়। ভের্সায়ির সন্ধি স্বাক্ষর করা ছাড়া তাদের অন্য উপায় ছিল না, অথচ এর জন্য জনসাধারণের কাছে তাদের অপ্রিয়তার অন্ত রইল না। সন্ধিসর্ত্ত প্রতিপালনের জন্য মিত্রশক্তিরা বলপ্রয়োগ করাতে জার্মানির তৎকালীন সোশ্যালিস্ট্ শাসকেরা আরও বিপন্ন হ'য়ে পড়েন। মার্কের মূল্যহ্রাস আরম্ভ হ'লে, আর্থিক দুর্দ্দৈবের দায়িত্বও চাপানো হয়েছিল তাঁদের উপর। আভ্যন্তরিক ও বহিরাগত বিপদের সামনে সকল শ্রেণীর মিলনের ভিতর দিয়ে জাতীয় ঐক্যের রব ওঠা স্বাভাবিক। হ্বাইমারের গণতান্ত্রিক আমলে এ-অবস্থায় শ্রমিকদের পৃথক স্বার্থ-সন্ধানের সম্ভাবনা কমে' এল। তখন শাসনভারও তাদের কাছ থেকে মধ্যপন্থী দলদের হাতে গিয়ে পড়ে। ক্যাথলিক্ সেণ্টার্-পার্টির প্রভাব তখন এইভাবে জার্মানিতে বেড়ে যায়। নির্ব্বাচনের ব্যবস্থানুসারে, সমস্ত দেশের মধ্যে ভোটের মোট পরিমাণ অনুযায়ী প্রতি দলের জাতীয় পরিষদে সভ্য পাঠাবার অধিকার ছিল। বহু রাষ্ট্রিক দলের মধ্যে তাই কোনও এক দলের সে-সভাতে সংখ্যাধিক্য থাকবার সম্ভাবনা ছিল কম। সুতরাং নানা দলের সহযোগিতায় মন্ত্রিসভা-গঠনও অনিবার্য্য

হ'য়ে পড়ে। ফ্রান্সের মত জার্মানিতেও এর ফলে সে-সময় কোনও মন্ত্রিসভা দীর্ঘস্থায়ী হ'তে পারে নি।

অবস্থা-বিপর্য্যয়ে তাই জার্মান্-বিপ্লব ফরাসী বা রুষ-বিপ্লবের মতন ঘরে বাইরে বিশাল পরিবর্ত্তনের সূচনা করতে পারল না। গণতান্ত্রিক শাসন-স্থাপনই এর প্রধান কীর্ত্তি। আর্থিক জগতেও ১৯২৩-এর পর জার্মান্ ধনতন্ত্রের আয়তন স্ফীত হ'তে থাকে, অন্ততঃ ১৯৩০-এর সঙ্কট পর্য্যন্ত। সোশ্যাল্-ডেমক্রাট্‌দের শাসন-কর্ত্তৃত্ব অবসানের পর কয়েক বছর বুর্জোয়াদলগুলির মিলনে রাষ্ট্র-পরিচালনা সুচারু ভাবেই সম্পন্ন হ'ল। এই সময়টিকে স্ট্রেস্‌মানের যুগ বলা চলে। দেশের মধ্যে তিনি ঐক্যের পক্ষপাতী ছিলেন, আর তাঁর বৈদেশিক-নীতি ছিল রাশিয়ার উপর ভরসা না রেখে মিত্রশক্তিদের সঙ্গে সদ্ভাব স্থাপন। তাঁর নেতৃত্বে মনে হ'ল যে প্রাথমিক বিপদ কেটে গিয়ে অবশেষে হ্বাইমার্-আমল জার্মানিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে চলেছে। ডস্-প্ল্যানের কল্যাণে এল সাময়িক শান্তি ও আর্থিক উন্নতি। লোকার্নো পশ্চিমের মহাশক্তিদের সঙ্গে মৈত্রী আন্‌ল। রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রবেশ জার্মানির মর্য্যাদা বাড়াল। অস্ত্রত্যাগের আলোচনা আরম্ভ হওয়াতে মনে হ'ল যে অন্যদেশও জার্মানির মত এবার নিরস্ত্র হবে। ইয়াং-প্ল্যানে (১৯২৯) ক্ষতিপূরণের দেয় দেবার পথ আরও সুগম হয়। ১৯৩০এ রাইন্‌ল্যাণ্ড্ থেকে বিদেশী সৈন্য অপসারিত হ'ল। স্ট্রেস্‌মানের মৃত্যুর পরও ১৯৩০ পর্য্যন্ত চরমপন্থীদের সমালোচনা তুচ্ছ করে', গণতান্ত্রিক হ্বাইমার্-পদ্ধতি দেশে বিরাজ করে। প্রথম প্রেসিডেন্ট্ এবার্টের পর প্রাচীনপন্থী

সেনাপতি হিণ্ডেন্‌বুর্গ্ তাঁর স্থলাভিষিক্ত হ'লেও তিনি প্রথমে নূতন শাসন-পদ্ধতির কোনও ক্ষতি করেন নি।

কিন্তু ১৯৩০ সালের মধ্যে স্ট্রেস্‌মান্-যুগের শান্তি প্রায় লোপ পেতে বস্‌ল। ১৯২৮ থেকে জার্মান্ সাম্যবাদী-দল টেল্‌মান্, ক্লারা সেট্‌কিন্ প্রভৃতির নেতৃত্বে ক্রমশঃ শক্তিশালী হ'য়ে উঠ্‌ছিল; অন্যদিকে হুগেন্‌ব্যর্গ্ ও ড্যুয়েষ্টর্‌ব্যর্গের ন্যাশনালিস্ট্-দল অভিজাত সমাজের মুখপাত্র হিসাবে হ্বাইমার্-পন্থার প্রকাশ্য নিন্দা ও লৌহশিরস্ত্রাণ-বাহিনী নামে সশস্ত্র সঙ্ঘ গঠন করে' শান্তিভঙ্গের উপক্রম করছিল। উদার-গণতান্ত্রিক আদর্শের এক তৃতীয় শত্রু হিসাবে হিট্‌লারি-দল প্রথম দৃষ্টি আকর্ষণ করে, ১৯৩০-এর মধ্যে এরাই দ্রুত বৃদ্ধির ফলে রেপাব্লিকের প্রধান ভয় হ'য়ে ওঠে। এই নাৎসি অথবা ন্যাশনাল্-সোশ্যালিস্ট্-দল জাতীয়তা ও সমাজতন্ত্রের আদর্শ সমন্বয়ের দাবী করলেও ইটালির ফাশিস্ট্‌দের মতন তাদেরও কোন সুচিন্তিত মতবাদ ছিল না। ১৯১৯এ ফেডার্ নামক নেতার দ্বারা আকৃষ্ট হ'য়ে হিট্‌লার্ নামে একজন সৈনিক একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রিক দলে যোগ দেন; সেই দলই তখন নাৎসি নামে পুনর্গঠিত হয়েছিল। সোশ্যালিস্ট্ নাম আজ পর্য্যন্ত ব্যবহার করলেও, হিট্‌লার্ প্রথম থেকেই সমাজতন্ত্রী আদর্শ খর্ব্ব করে' উৎকট জাতীয়তার প্রশ্রয় দিতে থাকেন—নিজের জীবনের সাধনা ও অভিযান সম্বন্ধে তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ এর সাক্ষ্য। রাইশ্‌ওয়েরর্ অর্থাৎ যুদ্ধান্তের জার্মান্ সেনাবলের সঙ্গে হিট্‌লারের প্রথম থেকেই যোগ ছিল, পরে টিসেন্ প্রমুখ ধনিককুবেরেরা তাঁর দলকে অর্থ সাহায্য করতে আরম্ভ করেন। স্ট্রেস্‌মানের আমলে

হিট্‌লারি-আন্দোলন নগণ্য রইল—মিউনিকে ১৯২৩-এর বিপ্লবচেষ্টা তখন প্রহসনই মনে হয়েছিল। কিন্তু ১৯৩০এ সেই নাৎসি-দল দেশ গ্রাস করতে উদ্যত হয়।

ভের্সায়ি-ব্যবস্থার প্রতিবাদ করে'ই হিট্‌লার্ বিখ্যাত হ'ন, তাঁর অভ্যুদয় খানিকটা তাই ফ্রান্সের দমননীতির প্রতিক্রিয়া। কিন্তু ১৯২৪ থেকে ফরাসীরা জার্মানির সঙ্গে সদ্ভাবেরই চেষ্টা করছিল অথচ ১৯৩০-এই নাৎসিরা প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ল। আসলে ১৯২৯-এর পর থেকে আর্থিক দুরবস্থার সূত্রপাত হয়। জার্মানিতে তখন ত্রাস ও আতঙ্ক আবার দেখা দিচ্ছিল। তার মধ্যে সাম্যবাদীদের শক্তিবৃদ্ধি ধনিক ও মধ্যশ্রেণীর কাছে প্রলয়ের আভাস মনে হ'ল। অসংখ্য লোক তাই ক্রমে নাৎসি-আন্দোলনে আকৃষ্ট হয়। জাতির গৌরবের পুনরুদ্ধার-প্রতিশ্রুতি দেশ মধ্যে বিপ্লব আটকাবার অস্ত্ররূপেই তখন গণ্য হ'ল। জার্মান্ ন্যাশনালিস্ট্‌দের থেকে একাজে নাৎসিদের যোগ্যতা অনেক বেশী। স্ট্রেসার্ প্রভৃতি নেতাদের নতুন সমাজ গঠনের অনেক জল্পনা ছিল—দুঃস্থ মধ্যশ্রেণী, বিপন্ন কৃষক ও এমন কি অসন্তুষ্ট শ্রমিক-ও এ-আন্দোলনে তাই আকৃষ্ট হচ্ছিল। য়িহুদি-বিদ্বেষ ও নর্ডিক্ মহিমা-কীর্ত্তি নাৎসিদের জনপ্রিয় করতে থাকে; ঝঞ্ঝা-বাহিনীর সাজসজ্জা, শোভাযাত্রা, উৎসব তরুণদের দলে টান্‌ল। নানা ভাবধারার অপূর্ব্ব সংমিশ্রন হিসাবে নাৎসি-দল প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করল, অথচ তখন সোশ্যাল্-ডেমক্রাট্ ও সাম্যবাদীদের পরস্পর বিদ্বেষ শ্রমিক-সমাজকে করে' রাখ্‌ল বিভক্ত ও দুর্ব্বল।

কিন্তু নাৎসিদের সংখ্যাবৃদ্ধি হ'লেও পুরাতন দলগুলি

তখনও এদের সন্দেহের চোখে দেখে। তাছাড়া উদার-গণতন্ত্রে বিশ্বাসীরাও একেবারে লোপ পায় নি। ১৯৩০ থেকে ১৯৩২-এর আরম্ভ পর্য্যন্ত তাই হিট্‌লার্‌কে আটকাবার চেষ্টা হ'ল। সাম্যবাদীরা তখন ভুল করে' নাৎসিদের সাহায্যে শাসনযন্ত্র বিকল করার চেষ্টায় ব্যস্ত। কোথাও এই মারাত্মক ভুল আর যাতে না হয় সেইজন্যই পরে সাম্যবাদী ও গণতান্ত্রিকদের ইউনাইটেড্ ফ্রন্টের আদর্শ খাড়া হয়েছিল। রাইশ্‌স্টাকে গণতন্ত্রের বিরোধী দলের সংখ্যাধিক্য হবার সম্ভাবনাতে নিয়মতন্ত্রের অনুসরণ প্রায় অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। তখন বাধ্য হ'য়ে প্রধান মন্ত্রী ব্রুইনিং (মার্চ্চ্, ১৯৩০ থেকে জুন্, ১৯৩২) প্রেসিডেন্টের নামে অর্ডিনান্স্ জাহির করে' শাসনকার্য্য চালাতে থাকলেন। অবস্থা-বিপর্য্যয়ে এইভাবে হ্বাইমারের নিয়মতান্ত্রিক অনুশাসন অচল হ'য়ে পড়ে।

ব্রুইনিং-এর নিজহাতে ক্ষমতা রাখবার চেষ্টা কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বিফল হ'ল। তিনি বড় ভূস্বামীদের অধিকার কিছু খর্ব্ব করতে উদ্যত হ'লে, রাষ্ট্রপতি হিণ্ডেন্‌বুর্গের পার্শ্বচরেরা তাঁকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করলেন। তারপর ছয় মাস প্রথমে ফন্ পাপেন্, পরে সেনাধ্যক্ষ শ্লাইশার্ প্রধান মন্ত্রীর কাজ চালান। অর্ডিনান্স্ দিয়ে শাসন করলেও রাইশ্‌স্টাকে ও দেশে যথেষ্ট সমর্থকের অভাবে এঁদের অবস্থাও ক্রমশঃ দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ল। শেষ পর্য্যন্ত তাই হিণ্ডেন্‌বুর্গের হিট্‌লারের বিরুদ্ধে আপত্তি আর টিক্‌লো না। ১৯৩৩-এর জানুয়ারির শেষে এক মিলিত মন্ত্রিসভায় হিট্‌লার্ প্রধান সচিবের পদ এবং তাঁর দুই অনুচর আসন পেলেন। নাৎসি-বিপ্লব এর পর থেকেই দ্রুত অগ্রসর হ'তে থাকে।

১৩

রাষ্ট্রিক অশান্তির পুনরাগমন

উনিশ শতকের শেষ পাদে সাম্রাজ্যতন্ত্রের আধুনিক রূপ পরিস্ফুট হবার পর থেকে, ইউরোপে শান্তি ও নিরুদ্বেগের অবসরগুলি ক্ষণস্থায়ী হ'য়ে এসেছে। স্ট্রেস্‌মানের যুগের দ্রুত অবসানও তাই বিচিত্র নয়। যে-ভারসাম্য বহু কষ্টে গড়ে' উঠেছিল, আর্থিক সঙ্কটের ত্রাসের পর সে-ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হ'ল। আন্তর্জ্জাতিক সহযোগিতার ঝোঁক যুদ্ধান্ত থেকে ১৯৩০ পর্য্যন্ত সহজে চোখে পড়ে—সে-বছর ব্রিয়াঁর ইউরোপীয় মহামিলনের পরিকল্পনা চল্‌ছিল যদিও তার মূল বরাবরই ছিল শিথিল। কিন্তু এর পরই আবার পূর্ব্বাবস্থা ফিরে আসবার উপক্রম হয়। গত শতাব্দীর গোড়ার দিকে ক্যানিং গর্ব্ব করে' বলেছিলেন যে সব চেয়ে স্বাস্থ্যকর ব্যবস্থা হচ্ছে প্রত্যেক রাষ্ট্রের স্বকীয় স্বার্থসন্ধান। ধনতন্ত্রের আমলে আন্তর্জ্জাতিক সম্পর্কের এই বোধহয় প্রাণের কথা। অস্ট্রিয়া ও জার্মানির মধ্যে আর্থিক এক-কর্ত্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার প্রস্তাবে (১৯৩১) ফ্রান্স্‌ তাই বাধা দিল। অস্ত্রত্যাগের আলোচনায় বড় রাষ্ট্রগুলির স্বার্থ দুস্তর বাধার সৃষ্টি করতে থাকল। প্রথমে প্রস্তাব ছিল যে সকলের সামরিক শক্তি সমান পরিমাণে হ্রাস করা হবে; কিন্তু তখন সে-শক্তি মাপবার কোনও সর্ব্বস্বীকৃত উপায় পাওয়া গেল না। তারপর কোন কোন অস্ত্রের ব্যবহার নিষেধ

করার কথা ওঠে; কিন্তু সকল অস্ত্রকেই তখন কোন না কোন দেশ আত্মরক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ বলে' দাবী করল। ইংল্যাণ্ড্ ও আমেরিকার সাব্‌মেরিন্ বর্জ্জনের প্রস্তাবে ফ্রান্স্ ও জাপান বাধা দেয়; রণতরীর আয়তন হ্রাস ইংরাজদের ইচ্ছা হ'লেও আমেরিকার অনুমোদন পেল না; অপেক্ষাকৃত ছোট যুদ্ধজাহাজের সংখ্যা কমানোতে যুক্তরাষ্ট্র রাজি হ'লেও ব্রিটেনের তাতে আপত্তি হ'ল। শান্তিরক্ষার জন্য আন্তর্জ্জাতিক-বাহিনী গঠন ফরাসীরা বহুকাল চেয়েছে—অন্যদের মতে এ-প্রস্তাব সম্পূর্ণ অবাস্তব। এদিকে নাৎসিদের চাপে জার্মানির সুর বদলাতে আরম্ভ করে। ১৯৩২-এর বৈঠকে জার্মানি অস্ত্রের সমতা দাবী করে—হয় সকলেই অস্ত্রত্যাগ করুক নয়ত জার্মানিকে আবার আগের মত সশস্ত্র হবার অধিকার দেওয়া হোক। এ-দাবী যুক্তিসঙ্গত হ'লেও প্রস্তাব অগ্রাহ্য হওয়াতে জার্মানির সভাত্যাগ সমর্থন করা অসম্ভব। জেদ বজায় না থাকা মাত্র অসহযোগ অবলম্বন সকল মিলিত চেষ্টার ক্ষেত্রে মারাত্মক। এর ব্যাখ্যা অবশ্য খুবই সহজ। আন্তর্জ্জাতিক মিলনের ফলে স্বার্থহানির ভয় সাম্রাজ্যগুলিকে সর্ব্বদা সন্ত্রস্ত করে' রেখেছে। সে-প্রসঙ্গে ন্যায়ের দোহাই একটা আবরণ মাত্র। জার্মানির আচরণও কিছু এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম নয়।

কিন্তু এ-সময়ে ব্যাপক ভাবে অশান্তি প্রথম এল জাপানের ব্যবহারে। ওয়াশিংটন্-চুক্তির পর প্রায় দশ বছর চীনে অনেকটা শান্তি থাকে। এর মধ্যে ইংল্যাণ্ড্, জাপান, এমন কি রাশিয়া পর্য্যন্ত মাঝে মাঝে চীনের কোন

কোন অঞ্চলে সৈন্য পাঠিয়ে নিজেদের স্বার্থরক্ষা করে বটে কিন্তু সে-আচরণ ক্ষুদ্রসীমাবদ্ধ থাকাতে বিশেষ শান্তি ভঙ্গ হয় নি। অন্য দিকে চীনের জাতীয়-দল কুয়োমিন্‌টাং-এর পুনর্গঠন ও দ্রুত প্রসার এক সবল স্বাধীন চীন রাজ্যের কল্পনা বাস্তবে পরিণত করতে উদ্যত হয়। স্থন্‌-ইয়াৎ-সেনের সান্‌-মিন্‌-নীতির তিন প্রস্তাব—পূর্ণস্বরাজ, গণতন্ত্র এবং জনসাধারণের অবস্থার উন্নতি—কুয়োমিন্‌টাং-এর প্রেরণা ছিল ; চিয়াং-কাই-শেকের রণচাতুর্য্য দক্ষিণে ক্যাণ্টন্‌-প্রদেশ থেকে মধ্য ও উত্তর-চীন পর্য্যন্ত এ-দলের অধীনে আন্‌ল ; নান্‌কিংএ রাষ্ট্রকেন্দ্র করে' পুনর্গঠিত চীন-রেপাব্লিক্‌ এইভাবে নূতন আশার আশ্রয় হ'য়ে ওঠে।

চীনের পুনরুজ্জীবন কিন্তু জাপানের কাছে আশঙ্কার কারণই মনে হ'ল। চীন-অঞ্চলে প্রাধান্যই জাপানের মহাশক্তি-সমাজে পদমর্য্যাদার কারণ। ক্ষুদ্রায়তন জাপানের স্বকীয় সম্পদ প্রচুর না থাকায় তার দ্রুত লোকবৃদ্ধি ভাবনার কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। নূতন ইটালি বা জার্ম্মানির মতন জাপানীরাও জন্মনিরোধের চেষ্টা জাতির পক্ষে অকল্যাণকর ভাবে। আমেরিকা বা ব্রিটিশ্‌-ডোমিনিয়ান্‌-সমূহে স্থান থাকলেও সেখানে জাপানীদের বসবাস প্রায় নিষিদ্ধ হ'য়ে গেছে, আর বিদেশে বসবাসে স্বদেশের শক্তিক্ষয় হওয়াই স্বাভাবিক। জাপানী ধনিকতন্ত্র ক্রমশঃই দেশ ছাপিয়ে অন্যত্র ছড়িয়ে পড়ার প্রয়োজন অনুভব করছিল। বাণিজ্যে শ্রীবৃদ্ধির জন্য কতক অঞ্চলে পূর্ণ কর্ত্তৃত্ব আবশ্যক মনে হয়। চীনে জাপানের উপনিবেশ গঠনের স্থানাভাব হ'লেও আর্থিক শোষণের একাধিপত্য থাকলে তারই

সাহায্যে জাপানী ধনিকদের অভাব মোচন ও দেশের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক প্রতিপত্তির রক্ষা ও প্রসার সম্ভব হবে। আর এ-উদ্যমে জাপানের প্রাচীন সুবিদিত দেশভক্তিকে নিযুক্ত করতে পারলে শ্রমিক-অসন্তোষ ও আভ্যন্তরিক বিপ্লব-প্রচেষ্টারও হ্রাস পাওয়া সম্ভব এবং এও কম লাভ নয়। জাপানের সাম্প্রতিক আচরণ সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের চমৎকার নিদর্শন।

জাপানের রাজ্যশাসকেরা কতদূর এভাবে চিন্তা করেছিলেন বলা শক্ত, কিন্তু সৈন্যদলের কর্ত্তৃপক্ষদের এবিষয়ে ধারণা খুবই পরিষ্কার ছিল। জাপানের সেনাবল ও নৌবহর সাক্ষাৎ সম্রাটের অধীনে, মন্ত্রীদের এদের উপর বিশেষ কর্ত্তৃত্ব নেই। দেশের মধ্যেও এদের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট এক অর্দ্ধ-ফাশিস্ট্ মতবাদের উদ্ভব হয়েছে—এদলের হাতে আপেক্ষিক শান্তির পক্ষপাতী রাজনীতিজ্ঞদের মাঝে মাঝে জীবন সংশয় পর্য্যন্ত হয়, ১৯৩৬এ যেমন হয়েছিল। উর্দ্ধতন-পরিচালনার বেলায় তাই দ্বিধা ও দুর্ব্বলতার পরিচয় থাকলেও, জাপানের প্রগতির পিছনে তাড়নার স্বরূপ বোঝা সহজ। ১৯৩১ থেকে জাপানী সাম্রাজ্যতন্ত্র কূল ছাপিয়ে পড়েছে।

প্রথমেই মাঞ্চুরিয়ার তিনটি প্রদেশের উপর জাপানের প্রকোপ দেখা গেল। ১৯০৫ ও ১৯১৫র সন্ধির ফলে এ-অঞ্চলে জাপানের প্রভূত কর্ত্তৃত্ব থাকলেও, মাঞ্চুরিয়া তখনও চীনের অন্তর্গত আর ১৯২৭-এর পর থেকে নূতন চীন সুপ্তোত্থিত হচ্ছিল। বিবাদের উপলক্ষ্যের কখনও অভাব হয় না। জাপানী প্রতিষ্ঠান, দক্ষিণ-মাঞ্চুরিয়া-রেলওয়ের, ক্ষতি ক'রে চীনেরা নাকি নূতন রেলপথের পরিকল্পনা করছিল।

মাঞ্চুরিয়ার দস্যুদের হাত থেকে স্বদেশীয়দের সম্পত্তি ও প্রাণরক্ষার অজুহাতে জাপানের সৈন্যবাহিনী সমস্ত দেশ অধিকার ক'রে বস্‌ল (সেপ্টেম্বর্, ১৯৩১)। তৎক্ষণাৎ চীনে সর্ব্বত্রই জাপানী দ্রব্যের বয়কট্ হয়। সামান্য উপলক্ষ্যে জাপান তখন শাঙ্ঘাই বন্দর অধিকার করে। পরে শাঙ্ঘাই থেকে জাপানী সৈন্য অপসৃত হ'লেও, মাঞ্চুরিয়া তদবধি বস্তুতঃ জাপানের মুষ্টির মধ্যেই রয়েছে। মাঞ্চুকুয়ো নামে এখানে এক নূতন রাষ্ট্রের স্থাপন রাজনীতির খেলা মাত্র (১৯৩২)।

মাঞ্চুরিয়া-অধিকার জাপানের তিন তিনটি সন্ধিভঙ্গের জ্বলন্ত নিদর্শন—কেলগ্ প্যাক্ট্ (১৯২৮), নয় রাষ্ট্রের চুক্তি (১৯২২) এবং লীগ্ কভেনাণ্ট্ (১৯১৯)। জাপানের স্বপক্ষে এক্ষেত্রে স্বার্থসন্ধান ভিন্ন প্রকৃত কোন যুক্তি নেই। আন্তর্জ্জাতিক বিবাদে অন্যায়ের প্রতিশোধে সামান্য বল-প্রয়োগের যে-ব্যবস্থা আছে, ১৯৩১-এর বিশাল অভিযান তার মধ্যে পড়ে না—সুতরাং জাপান যুদ্ধে নামে নি, এ-যুক্তি হাস্যাস্পদ। অরাজক হিসাবে চীনের কোন অধিকার থাকতে পারে না, এ কথাও অসঙ্গত ; কারণ চীন তখন আগের চাইতে ঢের বেশী আত্মপ্রতিষ্ঠ ; অথচ প্রকৃত অরাজকতার সময় (১৯২২) জাপান তার অধিকার মেনে নিয়েছিল। মাঞ্চুকুয়োর স্বাধীনতার দাবী কষ্টকল্পনা আর সে-ভাবনা জাপানের পক্ষে অবান্তর। কিন্তু জাপানের অনাচার বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ ঠেকাতে পারে নি। সঙ্ঘ কার্য্যকরী হ'তে পারে একমাত্র প্রধান রাষ্ট্রগুলির সমবেত চেষ্টায়। ১৯৩১-এর সঙ্কটে যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে আটকাবার জন্য লীগের চেষ্টার সহায়তায় রাজি ছিল ; মাঞ্চুকুয়োকে নূতন রাজ্য-

হিসাবে কোন দেশ মানবে না, এ প্রস্তাব মার্কিন্ মন্ত্রী স্টিম্‌সনের নীতি রূপেই পরিচিত। কিন্তু ইংল্যাণ্ড্ এসময় ভিতরে ভিতরে জাপানের সমর্থন করে; অন্ততঃ রাষ্ট্রসজ্যের নিরীহতার জন্য প্রধানতঃ দায়ী ব্রিটিশ্-সচিব সাইমন্। অনেক ইংরাজ আমেরিকার সঙ্গে সহযোগের পক্ষপাতী হ'লেও, ব্রিটিশ্ রণ-বিভাগে কর্ত্তৃপক্ষদের জাপানের সঙ্গে সম্প্রীতি ১৯২২-এর পরেও লোপ পায়নি। আমেরিকাকে পূরোপূরি বিশ্বাস ইংল্যাণ্ডের পক্ষে সহজ নয়। নূতন সিঙ্গাপুর বন্দরের যুদ্ধ-ব্যবস্থা সত্ত্বেও জাপানের সঙ্গে ইংরাজদের পূর্ব্ব-সমুদ্রে যুদ্ধ চালানো শক্ত। অথচ জাপানের সহিত সদ্ভাব থাকলে, পৃথিবীর অন্যত্র ইংরাজদের নৌবল অপ্রতিহত রাখার সম্ভাবনা আছে। ব্রিটেনের এই স্বার্থপ্রণোদিত নিশ্চেষ্টতায় জাপান তাই মাঞ্চুরিয়ায় সহজেই বিজয়ী হ'ল। সজ্যের বিধানপত্রিকার এ-লঙ্ঘন অবশ্য একেবারে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব ছিল। আপোষে নিষ্পত্তির চেষ্টায় তাই লীট্‌ন্-সমিতির নিয়োগ হয়। কিন্তু এ-সমিতির সিদ্ধান্তও জাপানের অনুকূল হ'তে পারে নি। মাঞ্চুরিয়া-অধিকার তাই শেষ পর্য্যন্ত লীগ্ কর্ত্তৃক নিন্দিত হয় যদিও জাপানকে কার্য্যতঃ কিছু বাধা দেওয়া হ'ল না। তবুও এই নিন্দার প্রতিবাদ স্বরূপ জাপান রাষ্ট্রসজ্যের থেকে পদত্যাগ করল (১৯৩৩)। বিশ্বরাষ্ট্রসজ্যের প্রতিপত্তি-নাশ এবং পতনও এর পর সহজ হ'য়ে আসে, কারণ জাপানের অনাচার অবাধে সম্পন্ন হয়েছিল।

সাম্রাজ্যতন্ত্রে প্রসারের যুগে থামা শক্ত। এর পর থেকে জাপানের অগ্রগতি ইংল্যাণ্ড্‌কে পর্য্যন্ত সন্ত্রস্ত করে' তুল্‌ল।

মাঞ্চুরিয়া-আক্রমণ (১৯৩১), মাঞ্চুকুয়ো-স্থাপন (১৯৩২) ও রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগের (১৯৩৩) পর জাপান জেহোল্-প্রদেশ দখল করে (১৯৩৩)। ১৯৩৪এ জাপান ঘোষণা করল যে অবস্থা-বিপর্য্যয়ে নয় রাষ্ট্রের চুক্তির আর কোন মূল্য নেই এবং উত্তর ও দক্ষিণ-আমেরিকায় যুক্তরাষ্ট্র মন্‌রো-নীতির প্রয়োগে যেমন নিজের প্রাধান্য বজায় রেখেছে, ভবিষ্যতে চীন-অঞ্চলে জাপান তদ্রূপ কর্ত্তৃত্বের দাবী করবে। সে-বছরের শেষে জাপান জানাল যে ওয়াশিংটন্-সন্ধিপত্রে রণতরী নির্ম্মাণের যে-সীমা নির্দ্দিষ্ট হয়েছিল জাপান অতঃপর আর সে-বাধা মেনে চল্‌বে না। জাপান ম্যাণ্ডেট্-প্রথায় যে-দ্বীপগুলির উপর অধিকার স্থাপন করেছিল, লীগ্ ত্যাগ করার পরও সে সেগুলি হাতছাড়া করে নি ; ওদিকে ১৯৩৫-১৯৩৬-এর মধ্যে জাপানীরা দক্ষিণ-মঙ্গোলিয়ায় প্রভাব বিস্তার এবং উত্তর-চীনে চাহার-হোপি অঞ্চলে নিজেদের ছায়াশ্রিত স্বতন্ত্র রাজ্য-শাসনের বন্দোবস্ত করে। ফাশিস্ট্-প্রভাব জাপানে আরও প্রবল হ'লে, ১৯৩৬এ জাপানী কর্ত্তৃপক্ষরা নিজেদের তিনটি লক্ষ্য নির্দ্দেশ করলেন — চীন জাপানের একজোটে বল্‌শেভিক্-দের অগ্রগতি রোধ ; জাপানের অনুজ্ঞা ব্যতীত চীনের বিদেশের সহিত রাষ্ট্রিক যোগ বর্জ্জন ; এবং চীন ও জাপানের উপর একই আর্থিক কর্ত্তৃত্ব স্থাপন। এর অর্থ অবশ্য প্রকারান্তরে চীনের পক্ষে সম্পূর্ণভাবে জাপানের বশ্যতা স্বীকার। চিয়াং-কাই-শেক্ চীনের রাষ্ট্রপতি হিসাবে অনেকটা জাপানী প্রভাব মেনে চল্‌লেও দেশের জন-মত স্বভাবতঃই এর ঘোর বিরোধী ছিল। বিশেষ করে' কোন কোন প্রদেশ চীনে সাম্যবাদীদলের হস্তগত হবার পর এই দল জাপানীদের

বিরুদ্ধে উত্তেজনা বিস্তার করতে লাগল। ১৯৩৭এ তাই চীন জাপানে যুদ্ধ বাধে এবং আজকে জাপান প্রতিবেশীদের দমন করবার জন্য চীনের অনেকখানি গ্রাস করতে উদ্যত।

কিন্তু সাম্রাজ্যবিস্তার অবাধ হওয়াও দুষ্কর। আমেরিকা রণসজ্জা বাড়িয়েই চলেছে অনেকখানি জাপানের দিকেই লক্ষ্য রেখে। ১৯৩৬এ লণ্ডন্-বৈঠকে জাপানীদের নৌবলের সমতার দাবী গৃহীত হ'ল না; তার পর থেকে ওয়াশিংটন্-চুক্তির সীমানির্দ্দেশ সকলেই বর্জ্জন করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ১৯৩৩এ এতদিন পর সোভিয়েট্-রাশিয়াকে বৈধ রাষ্ট্র বলে' স্বীকার করল জাপানকে বাধা দেবার জন্যই। ফিলিপাইন্ দ্বীপ-মালাও আমেরিকা তাই শেষ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করেনি। —ইংল্যাণ্ড্ও জাপানের সাম্প্রতিক আচরণে বিচলিত হয়েছে। লিথ্-রসের দৌত্যে ১৯৩৫এ ইংরাজেরা চীনের কারেন্সির নূতন বন্দোবস্তের মধ্য দিয়ে নিজেদের প্রভাব বাড়াবার চেষ্টা করে। সম্প্রতি জাপানী দ্রব্য পৃথিবীর সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে; জাপানী জিনিষের স্বল্পমূল্যতার কারণ অনেকখানি স্টেটের অকুণ্ঠ সাহায্য ও শ্রমিকদের কাছ থেকে অন্যায় পরিমাণে অতিরিক্ত শ্রম আদায়ের ব্যবস্থা। ব্রিটিশ্-সাম্রাজ্যে এখন জাপানী পণ্য আটকাবার চেষ্টা চলেছে। ব্রিটিশ্-ডোমিনিয়ানেরা জাপানের ভয়ে আমেরিকার সঙ্গে মৈত্রীর পক্ষপাতী। ১৯২৭-এর টানাকা-পত্রে, ১৯২৫এ ইসিমারুর গ্রন্থে জাপানীরাই পরিণামে ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে সঙ্ঘর্ষের অবশ্যম্ভাবীতা স্বীকার করেছে। কিন্তু পশ্চিমের মত পূর্ব্বেও ব্রিটিশ্-নীতি হ'ল দুর্দ্দিনকে ঠেকিয়ে রাখার চেষ্টা। ইউরোপে ফ্রান্স্ ও জার্মানি, প্রশান্ত মহাসাগরে আমেরিকা ও

জাপান—যথা সম্ভব দুই নৌকায় পা রাখা ইংরেজদের কাছে রাজনীতির পরাকাষ্ঠা মনে হয়।—এদিকে জাপানের প্রগতি সোভিয়েট্-রাশিয়ার মহা আশঙ্কার কারণ। জাপানীদের এশিয়ার ভিতরে প্রসারলাভ এক সময়ে রুষদের বৈকাল-হ্রদের পূর্ব্বস্থিত সমস্ত ভূভাগ ছেড়ে দিতে বাধ্য করতে পারে। রাশিয়া বিবাদ এড়াবার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছে—উত্তর-মাঞ্চুরিয়ার রুষ রেলপথ জাপানকে বিক্রয় করে' দেওয়া তার নিদর্শন। কিন্তু দুই প্রতিবেশীর মধ্যে শেষ পর্য্যন্ত যুদ্ধ বেধে ওঠাও আশ্চর্য্য নয়। স্টালিন্ ১৯৩৬এ বলেছিলেন যে উত্তর-মঙ্গোলিয়া গ্রাস করতে জাপানকে দেওয়া হবে না। সাইবেরিয়ায় সৈন্য-সঞ্চালনের সুবিধার জন্য নূতন রেলনির্ম্মাণ চলেছে—এশিয়ার তুষারাবৃত উত্তর উপকূল দিয়ে যাতায়াতের রাস্তা খোলার বর্ত্তমান রুষ চেষ্টারও বিশেষ সামরিক উদ্দেশ্য থাকতে পারে। তা'ছাড়া জাপানের আক্রমণের বিরুদ্ধে চীনকে যে রুষেরা গোপনে সাহায্য করছে, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ কম।

চীনকে যুদ্ধে পরাস্ত করলেও গ্রাস করা সহজ নয়। প্রাথমিক প্রসারের পর কুয়োমিনটাং অন্তর্বিভক্ত হ'য়ে পড়ে। তখন সাম্যবাদভাবাপন্ন চীনেদের দমন করবার বিধিমত চেষ্টা চিয়াং-কাই-শেক্ করেছিলেন; তাঁর নেতৃত্বেই কুয়োমিন্টাং-এর মধ্যে জাতীয় ভাব জয়লাভ করে সমাজতন্ত্রী ঝোঁকের উপর। কিন্তু ক্রমে চীনের অভ্যন্তরে কোন কোন প্রদেশে কমিউনিস্ট্‌দের কর্ত্তৃত্ব স্থাপিত হ'ল—সোভিয়েট্-চীন নামে সে-অঞ্চল এখন খ্যাত। চিয়াং-কাই-শেক্ সাম্যবাদী চীনকে জয় করতে না পেরে শেষ পর্য্যন্ত তারই নির্দ্দেশে জাপানের

সঙ্গে শক্তি পরীক্ষায় প্রবৃত্ত হয়েছেন। কুয়োনিটাং-এর প্রথম উত্তর-জয়ের সময় বরোডিন্ প্রমুখ রুষ মন্ত্রণাদায়ক ছিলেন; তার পর রাশিয়ার সঙ্গে যোগ ছিন্ন হয়; এখন আবার দুর্দ্দিনে সে-যোগ পুনর্গঠিত হচ্ছে। চীনের উপর কর্ত্তৃত্ব নিয়ে জাপান ও রাশিয়ার এক প্রকার দ্বন্দ্ব চলেছে। তাই আমেরিকার চাইতেও বোধ হয় রুষ-ভীতিই ইংরাজদের জাপানের পূর্ণ পরাজয় কামনার পথে প্রতিবন্ধক।

১৪

ইটালির অভিযান

মুসোলীনির শাসনে ইটালির খানিকটা ভাগ্য ফিরেছিল। প্রথমেই দেশের মধ্যে শান্তি ফিরে আসে, ফাশিস্ট্-আমলে ইটালির বাহ্যিক উন্নতি বিদেশী পর্য্যটক মাত্র লক্ষ্য করেছেন। শাসনযন্ত্র আগের চাইতে কর্ম্মকুশল হয়েছে আর দেশমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে একটা আত্মনির্ভরের ভাব। ফাশিস্ট্দের প্রবল উৎসাহ অনেক দুঃসাধ্য সাধনে ব্রতী হয়েছে। অনেকেরই তাই মনে হওয়া বিচিত্র নয় যে পরিণাম যাই হোক না কেন, এক্ষেত্রে সাময়িক লাভই যথেষ্ট। আর্থিক উদ্যমের অভাব আর আগের মতন ইটালিতে দেখা যায় না— কৃষিকার্য্যে বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীর প্রয়োগ, নদীস্রোতের থেকে বৈদ্যুতিক শক্তি সঞ্চার এর উদাহরণ। শ্রমিকদের অধিকার বিধিবদ্ধ করে' এক লিপিপত্রিকা প্রস্তুত হয়েছে। ধর্ম্মঘট নিষিদ্ধ করার উদ্দেশ্যে শ্রমিক-ধনিকের দ্বন্দ্বনিষ্পত্তির জন্য বিচারালয় স্থাপন এই পত্রিকার অন্যতম ব্যবস্থা। কর্ম্মক্লান্ত শ্রমজীবীদের আনন্দ ও শিক্ষার কিছু আয়োজন হ'ল। বিভিন্ন ব্যবসায়কে সঙ্ঘবদ্ধ করে' দেশের আর্থিক জীবনকে সমর্থ ও সুগঠিত রূপ দেবার সংকল্প হয়েছে আর ইটালির কর্পোরেটিভ্-রাষ্ট্র বা নূতন শাসনপদ্ধতির প্রতিষ্ঠা থাকবে এই নবীন আর্থিক সংগঠনের উপর। মুসোলীনি অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য দেশনায়ক কিন্তু জাতির পরিচালনার

জন্য নেতৃস্থানীয় সুসম্বদ্ধ দলের প্রয়োজন—সেই অভাব ফাশিস্ট্-দল পূরণ করছে। নানা দেশে এইরূপ সর্ব্বব্যাপী দলের উদ্ভব অবশ্য যুদ্ধান্তের ইতিহাসে একটা বিশিষ্ট স্থান নিয়েছে। ফাশিস্টেরা আসলে স্টেট্-উপাসক, অবশ্য যতক্ষণ সে-স্টেট্ নিজেদের আয়ত্তে থাকে। কিন্তু ইটালিতে প্রচলিত ক্যাথলিক্ ধর্ম্মের সঙ্গে ফাশিস্টেরা মোটের উপর সদ্ভাব রেখে চলেছে। পোপের সঙ্গে ফাশিস্ট্ ইটালির ১৯২৯ সালের বন্দোবস্ত উল্লেখযোগ্য। ধর্ম্মগুরু পোপের স্বাধীন রাজ্য কেড়ে নেওয়ার অপরাধে ষাট বছর ধরে ইটালি গোঁড়া ক্যাথলিক্দের বিরাগ ভাজন হয়েছিল ; এখন পোপের নিবাস ভ্যাটিকান্-অঞ্চল তাঁরই স্বতন্ত্র রাজ্য স্বীকার করে' নিয়ে মুসোলীনি একটা অশান্তি দূর করে' দিলেন।

ইটালিতে ফাশিজ্ম্ এইভাবে দৃঢ়প্রতিষ্ঠ হ'তে থাকলে ক্রমে তার একটা বিশিষ্ট মতবাদও দেখা দিল। ফাশিজ্ম্-এর প্রকৃত স্বরূপ অবশ্য সোশ্যালিজ্মের বিরুদ্ধাচরণ এবং যেখানে ধনতন্ত্র দুর্ব্বল হ'য়ে পড়ে সেখানে গণতান্ত্রিক উদারনীতি পরিত্যাগ করে' সবলে ধনিককর্ত্তৃত্বের সংরক্ষণ। কিন্তু চিন্তার রাজ্যে এই আন্দোলনকে স্বভাবতঃই আকর্ষক রূপ দেবার চেষ্টা হয়। তাই প্রচার হ'তে লাগ্ল যে ফরাসী-বিপ্লবের পর থেকে জগৎ ভুলপথে চলেছে—কারণ তখন যে-উদার গণতন্ত্রের আদর্শ ছড়িয়ে পড়ে তারই বিষময় ফল হচ্ছে সমাজতন্ত্রের হিংসাদ্বেষ। গণতন্ত্র ও সোশ্যালিজ্ম্ উভয়েই নাকি আসলে ব্যক্তিত্ব বোধের প্রকাশমাত্র কিন্তু মানুষের প্রকৃত আদর্শ হওয়া উচিত সমষ্টির স্বার্থ। সমগ্রগ্রাসী রাষ্ট্রের কল্পনা এর থেকেই আসে অবশ্য। ফ্যাশিস্ট মতে শ্রেণীবিভাগ

থাকবেই কিন্তু শ্রেণীদের উচিত সমগ্র জাতির মিলিত স্বার্থে নিজেদের ক্ষুদ্র স্বার্থ বিসর্জ্জন। আর্থিক ব্যবস্থায় উৎপাদন-সামগ্রীতে ব্যক্তিবিশেষের অধিকার বজায় থাকবে, কিন্তু ধনতন্ত্রকে সীমাবদ্ধ করে' রাখা যেতে পারে নিম্নতন শ্রেণীর মঙ্গলের জন্য। রাষ্ট্রিক ব্যাপারে জনগণের কর্ত্তৃত্ব অথবা সমানাধিকার অর্থহীন, প্রয়োজন হচ্ছে শ্রেষ্ঠলোকদের শাসন নির্ব্বিবাদে মেনে নেওয়া; দেশনেতা হচ্ছেন সেই সত্যিকারের আভিজাত্যের প্রতীক। এই আদর্শানুযায়ী গঠিত রাষ্ট্রের একটা নৈতিক সত্ত্বা আছে, আর তার অনুজ্ঞাপালন চরিত্র গঠনেরই সহায়ক। জাতিগৌরব শ্লাঘার কথা, জাতিভক্তিই প্রকৃত ধর্ম্ম। প্রসার জীবনীশক্তির লক্ষণ, জাতিবাদের পরিণতি সাম্রাজ্যে। এর জন্য যুদ্ধ অগৌরবের কথা নয়, জাতিগত সঙ্ঘর্ষই বরং প্রকৃতির বিধান।

এ সব কথা আপাতমধুর শোনালেও, বস্তুতঃ ফাশিজ্‌মের প্রকোপে পরিণামে অধিকাংশের ভাগ্যে নির্য্যাতন আসাই অনিবার্য্য। দেশের মধ্যে এই বিধানে জনসাধারণ রাষ্ট্রব্যাপারে শুধু অর্দ্ধদাস হ'য়ে থাকবে তা' নয়, অধিকসংখ্যকের আর্থিক ক্লেশও শুধু মন্ত্রবলে অন্তর্দ্ধান হ'তে পারে না। ফাশিস্ট্‌দের মুখে সমগ্র জাতির স্বার্থ কার্য্যতঃ শুধু তাদের মিত্র-শ্রেণীদের স্বার্থে পরিণত হয়। ধনতন্ত্রকে শৃঙ্খলিত রাখা শুধু কথার কথা, ইটালি বা জার্মানিতে ফাশিস্ট্‌-আমলে তার স্বাভাবিক গতি বিন্দুমাত্র ব্যাহত হয়েছে কিনা সন্দেহ, বরং শ্রমিক-সমিতিরূপ কণ্টকোদ্ধারে ধনিকদেরই লাভ হয়েছে। সোভিয়েট্‌-রাশিয়ায় হয়ত অত্যাচার কিছু কম হয় নি, কিন্তু তার পিছনে ভবিষ্যতের নূতন শ্রেণীবিহীন

সমাজ গড়বার যে একটা বিপুল আশা আছে ফাশিস্টেরা তার আদর্শ সম্পূর্ণ ত্যাগ করেছে। ফাশিস্ট্-অত্যাচার তাই বর্ত্তমানের নানা ত্রুটিসম্বলিত আর্থিক ব্যবস্থা সংরক্ষণের চেষ্টা মাত্র। ইতিহাসের একটা স্বাভাবিক গতি থাকলে, কালে ধনতন্ত্রের আমূল বিরাট পরিবর্ত্তন হওয়াও বিচিত্র নয়। সর্ব্বপ্রকার সমাজতন্ত্রের মুখ সেই ভবিষ্যতের দিকে, কিন্তু ফাশিজ্ম্-এর আর্থিক আদর্শ কিছু থাকলে তা' লুপ্ত অতীতের অনুসন্ধান আর তার ব্যবহারিক আচরণ প্রচলিত ধনতন্ত্রের রক্ষণাবেক্ষণ মাত্র। প্রতিবেশী দেশের বেলায় ফাশিজ্ম্ আরও অমঙ্গলের উৎস। ইটালি, জার্মানি, জাপান—ফাশিস্ট্-ভাবাপন্ন এই তিন মহাশক্তিই গত কয়েক বছর জগতের শান্তিভঙ্গের উপক্রম করেছে। আর্থিক তাড়না এর জন্য দায়ী হ'লেও, নূতন-সমাজ গঠনের মধ্যে দুরবস্থার সমাধান হয় কিনা সে-চেষ্টা এ দেশবাসীরা করে' দেখে নি। ইংল্যাণ্ড্, ফ্রান্স্, আমেরিকা সমৃদ্ধ আর এরা বঞ্চিত, এই কথা সর্ব্বত্র শোনা যায়। কিন্তু প্রথমতঃ এ-বিচার আপেক্ষিক মাত্র, বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পূর্ণ সমতা সম্ভব নয়। দ্বিতীয়তঃ, বাহুবলে এ-অসাম্য দূর করতে গেলে, এই ভাষাতেই বলতে হবে যে এক অন্যায়ের স্থান নিচ্ছে অন্য অন্যায়। তাছাড়া বঞ্চিত কারা? ইটালীয়, জার্মান্ বা জাপানী ধনিকপ্রবরদের দাবী মেটানো প্রকৃতপক্ষে ন্যায্য হ'তে পারে না, কারণ ক্ষুদ্র রাষ্ট্র বা অনুন্নত জাতিদের কি কোন অধিকার নেই? অথচ এদের উপর কর্তৃত্ব নিয়েই ত' বিবাদের সৃষ্টি। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব্ব যুগের অবাধ-ধনতন্ত্র যেমন ক্রমে এককর্ত্তৃত্বাভিলাষী সাম্রাজ্যতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল,

ফাশিজ্‌ম্‌ও তেমনি সঙ্কটাপন্ন সাম্রাজ্যতন্ত্রের আধুনিকতম প্রকাশমাত্র, মূল প্রকৃতিতে এদের বিশেষ পার্থক্য নেই।

রাষ্ট্রের মর্য্যাদা ও আর্থিক ক্ষমতা, এই উভয়েরই বিকাশ মুসোলীনির বৈদেশিক-নীতির লক্ষ্য, আর এ-পথে সাফল্যের প্রয়োজন ফাশিস্ট্‌-রাজত্বের পক্ষেই সমধিক; কারণ এর অভাবে দেশের আভ্যন্তরিক সমস্যা আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারার ভয় রয়েছে। মুসোলীনি ফিউম্‌ এবং ডোডোকানিস্‌-দ্বীপমালা ইটালির মুষ্টিচ্যুত হ'তে দিলেন না। কর্ফু-দ্বীপের ব্যাপারে, রাষ্ট্রসঙ্ঘকে উপেক্ষার পথ তিনিই প্রথম দেখান। টিরানা-চুক্তিতে (১৯২৬) আল্‌বানিয়া ইটালির আশ্রিত রাজ্য হ'য়ে পড়ল। আরব-উপকূলে ইমেন্‌-অঞ্চলে ইটালীয় প্রভাব মাথা তুল্‌তে লাগ্‌ল। ফ্রান্সের সঙ্গে জলপথে সমবল হবার অধিকার ১৯২২-এর চুক্তিতে আসে। ইটালির শক্তি বৃদ্ধির ফলে ব্রিটেন্‌ বা ফ্রান্স্‌ তাকে আর উপেক্ষা করতে সাহস পায় না। ১৯৩৪-এ অষ্ট্রিয়া পর্য্যন্ত অনেকখানি ইটালির ছায়ায় এসে পড়ল। কিন্তু এ-সব কিছুতেই ইটালির যথেষ্ট লাভ হয় নি। সম্প্রতি তাই আবিসিনিয়া ও স্পেন্‌কে মুসোলীনির প্রকোপ সইতে হয়েছে।

ইটালির প্রসারচেষ্টা কয়েকটি বিশেষ দিকে হওয়াই স্বাভাবিক। মধ্য-ইউরোপে তার প্রভাব জার্মানিকে ছাড়িয়ে যাওয়া দুষ্কর, কিন্তু ফ্রান্স্‌ ও ইংল্যাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও আফ্রিকায় সাম্রাজ্যগঠনের কাজে ইটালির কিছু সুবিধা আছে। আফ্রিকা-অঞ্চলে প্রাচীন রোম্‌-সাম্রাজ্যের গৌরব ফিরিয়ে আনার আদর্শ ইটালিতে জনপ্রিয় হ'তে বাধ্য। উনিশ

শতকের শেষ থেকে আফ্রিকার উত্তরপূর্ব্ব কোণে এরিট্রিয়া ও সোমালিল্যাণ্ড্ নামে দুটি প্রদেশ ইটালির উপনিবেশ রূপে গণ্য হয়েছে—আর উত্তর-উপকূলে লিবিয়া অথবা ট্রিপলি ১৯১১ সালে বিজিত হয়। প্রথমোক্ত দেশ দুটির মাঝখানে আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া-রাজ্য আফ্রিকার শেষ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে খ্যাত; কারণ পশ্চিম-উপকূলে লিবেরিয়া নামে স্বাধীন হ'লেও কার্য্যতঃ আমেরিকার ছায়াশ্রিত। ইথিওপিয়ায় এতদিন ফিউডাল্ সামন্ততন্ত্র বিদ্যমান ছিল, দেশবাসীরাও বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মে বিভক্ত। নানা অঞ্চলের সর্দ্দারদের উপর অবশ্য আবিসিনিয়ার রাজারা রাজচক্রবর্ত্তীর অধিকার দাবী করতেন। গত শতাব্দীর শেষে সম্রাট মেনেলেক্ শক্তিশালী হ'য়ে ওঠেন, এবং ১৮৯৬ সালে ইটালির আক্রমণ তাঁর হাতে একেবারে বিধ্বস্ত হয়। দুর্গম পর্ব্বতমালা এই ভাবেই আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা বহু শতাব্দী রক্ষা করে' এসেছে, যদিও ১৮৬৮ সালে ইংরাজ সেনাপতি নেপিয়ারের এ-অঞ্চলে অভিযান দেখিয়েছিল যে যন্ত্রযুগে অনুন্নত জাতিদের আত্মরক্ষা কত দুঃসাধ্য। বিংশ শতাব্দীতে বহু দিন মনে হ'ল যে ইংল্যাণ্ড্, ফ্রান্স্ ও ইটালির বিরোধী স্বার্থ ইথিওপিয়ার রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারবে—ইথিওপিয়ার বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘে সভ্যপদ তারই নিদর্শনরূপে গণ্য হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের তাড়নায় কিন্তু ইটালিকে শেষ পর্য্যন্ত এ-অঞ্চলে বেশী সচেষ্ট হ'তে হ'ল—ফ্রান্স্ বা ইংল্যাণ্ডের মত তার বিস্তৃত সাম্রাজ্য কিম্বা অন্যত্র প্রসারের সুবিধা ছিল না। বিনাযুদ্ধে প্রভাব বিস্তারে ইটালির বিশেষ আপত্তি না থাকলেও হাব্শী সম্রাট হাইল্ সেলাসির তাতে উৎসাহ

ফাশিজ্‌ম্‌ও তেমনি সঙ্কটাপন্ন সাম্রাজ্যতন্ত্রের আধুনিকতম প্রকাশমাত্র, মূল প্রকৃতিতে এদের বিশেষ পার্থক্য নেই।

রাষ্ট্রের মর্য্যাদা ও আর্থিক ক্ষমতা, এই উভয়েরই বিকাশ মুসোলীনির বৈদেশিক-নীতির লক্ষ্য, আর এ-পথে সাফল্যের প্রয়োজন ফাশিস্ট্‌-রাজত্বের পক্ষেই সমধিক; কারণ এর অভাবে দেশের আভ্যন্তরিক সমস্যা আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে পারার ভয় রয়েছে। মুসোলীনি ফিউম্‌ এবং ডোডোকানিস্‌-দ্বীপমালা ইটালির মুষ্টিচ্যুত হ'তে দিলেন না। কর্ফু-দ্বীপের ব্যাপারে, রাষ্ট্রসঙ্ঘকে উপেক্ষার পথ তিনিই প্রথম দেখান। টিরানা-চুক্তিতে (১৯২৬) আল্‌বানিয়া ইটালির আশ্রিত রাজ্য হ'য়ে পড়ল। আরব-উপকূলে ইমেন্‌-অঞ্চলে ইটালীয় প্রভাব মাথা তুল্‌তে লাগ্‌ল। ফ্রান্সের সঙ্গে জলপথে সমবল হবার অধিকার ১৯২২-এর চুক্তিতে আসে। ইটালির শক্তি বৃদ্ধির ফলে ব্রিটেন্‌ বা ফ্রান্স্‌ তাকে আর উপেক্ষা করতে সাহস পায় না। ১৯৩৪-এ অস্ট্রিয়া পর্য্যন্ত অনেকখানি ইটালির ছায়ায় এসে পড়ল। কিন্তু এ-সব কিছুতেই ইটালির যথেষ্ট লাভ হয় নি। সম্প্রতি তাই আবিসিনিয়া ও স্পেন্‌কে মুসোলীনির প্রকোপ সইতে হয়েছে।

ইটালির প্রসারচেষ্টা কয়েকটি বিশেষ দিকে হওয়াই স্বাভাবিক। মধ্য-ইউরোপে তার প্রভাব জার্মানিকে ছাড়িয়ে যাওয়া দুষ্কর, কিন্তু ফ্রান্স্‌ ও ইংল্যাণ্ডের প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও আফ্রিকায় সাম্রাজ্যগঠনের কাজে ইটালির কিছু সুবিধা আছে। আফ্রিকা-অঞ্চলে প্রাচীন রোম্‌-সাম্রাজ্যের গৌরব ফিরিয়ে আনার আদর্শ ইটালিতে জনপ্রিয় হ'তে বাধ্য। উনিশ

শতকের শেষ থেকে আফ্রিকার উত্তরপূর্ব্ব কোণে এরিট্রিয়া ও সোমালিল্যাণ্ড্ নামে দুটি প্রদেশ ইটালির উপনিবেশ রূপে গণ্য হয়েছে—আর উত্তর-উপকূলে লিবিয়া অথবা ট্রিপলি ১৯১১ সালে বিজিত হয়। প্রথমোক্ত দেশ দুটির মাঝখানে আবিসিনিয়া বা ইথিওপিয়া-রাজ্য আফ্রিকার শেষ স্বাধীন রাষ্ট্ররূপে খ্যাত; কারণ পশ্চিম-উপকূলে লিবেরিয়া নামে স্বাধীন হ'লেও কার্য্যতঃ আমেরিকার ছায়াশ্রিত। ইথিওপিয়ায় এতদিন ফিউডাল্ সামন্ততন্ত্র বিগুমান ছিল, দেশবাসীরাও বিভিন্ন জাতি ও ধর্ম্মে বিভক্ত। নানা অঞ্চলের সর্দ্দারদের উপর অবশ্য আবিসিনিয়ার রাজারা রাজচক্রবর্ত্তীর অধিকার দাবী করতেন। গত শতাব্দীর শেষে সম্রাট মেনেলেক্ শক্তিশালী হ'য়ে ওঠেন, এবং ১৮৯৬ সালে ইটালির আক্রমণ তাঁর হাতে একেবারে বিধ্বস্ত হয়। দুর্গম পর্ব্বতমালা এই ভাবেই আবিসিনিয়ার স্বাধীনতা বহু শতাব্দী রক্ষা করে' এসেছে, যদিও ১৮৬৮ সালে ইংরাজ সেনাপতি নেপিয়ারের এ-অঞ্চলে অভিযান দেখিয়েছিল যে যন্ত্রযুগে অনুন্নত জাতিদের আত্মরক্ষা কত দুঃসাধ্য। বিংশ শতাব্দীতে বহু দিন মনে হ'ল যে ইংল্যাণ্ড্, ফ্রান্স্ ও ইটালির বিরোধী স্বার্থ ইথিওপিয়ার রাষ্ট্রিক স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখতে পারবে—ইথিওপিয়ার বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘে সভ্যপদ তারই নিদর্শনরূপে গণ্য হয়েছিল। সাম্রাজ্যবাদের তাড়নায় কিন্তু ইটালিকে শেষ পর্য্যন্ত এ-অঞ্চলে বেশী সচেষ্ট হ'তে হ'ল—ফ্রান্স্ বা ইংল্যাণ্ডের মত তার বিস্তৃত সাম্রাজ্য কিম্বা অন্যত্র প্রসারের সুবিধা ছিল না। বিনাযুদ্ধে প্রভাব বিস্তারে ইটালির বিশেষ আপত্তি না থাকলেও হাব্শী সম্রাট হাইল্ সেলাসির তাতে উৎসাহ

না থাকারই কথা। ব্রিটিশ্ স্বার্থ ও রাষ্ট্রসঙ্ঘের অস্তিত্ব ইটালিকে আটকাতে পারবে এই আশায় সম্রাট ইটালির প্রতিপত্তি বাড়াবার চেষ্টায় বাধা দিতে লাগ্‌লেন। এই জন্যই ইটালীয়রা তাঁর বিরুদ্ধে তাদের অধিকার খর্ব্ব-প্রচেষ্টার অভিযোগ আনে। ওয়াল্‌ওয়ালের শান্তিভঙ্গের দোষ ইটালীয়দের, কিন্তু সে-ঘটনা উপলক্ষ্য মাত্র, সঙ্ঘর্ষের প্রকৃত কারণ সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত তাড়নায় ইটালির প্রসারকামনা। ১৯৩৫-এ আবিসিনিয়ার যুদ্ধ আরম্ভ হয়। হাইল্ সেলাসি অনেকখানি বাইরের সাহায্যের উপর নির্ভর করেছিলেন, কিন্তু তাঁকে হতাশ হ'তে হ'ল। দেশের মধ্যেও সকল অঞ্চলে তিনি সম্পূর্ণ সহায়তা পেয়েছিলেন কিনা সন্দেহ। আধুনিক আবহাওয়ায় প্রাচীন সামন্ততন্ত্রের দুর্ব্বলতা আবার প্রকাশ পেল; অভিনব যুদ্ধব্যবস্থার কল্যাণে ইটালীয় সেনাপতি বাদোলিও হাব্‌শী রাজধানী আডিস্ আবেবা দখল করলেন (১৯৩৬)। ইথিওপিয়ার সম্রাট আজ পলাতক, যদিও শোনা যায় যে কয়েকটি অঞ্চলে আজ পর্য্যন্ত খণ্ড-যুদ্ধের বিরাম হয় নি। আবিসিনিয়ার এত দ্রুত পরাজয় খানিকটা অপ্রত্যাশিত—বিষাক্ত গ্যাস্, বিমানবিহার ও মোটরযানে সৈন্য ও কামান চালানের সাহায্যেই এই বিস্তৃত ভূখণ্ড এত সহজে ইটালির রাজ্যভুক্ত হ'ল। ইটালির রাজা সম্রাট আখ্যাতে ভূষিত হয়েছেন, আফ্রিকার শৃঙ্গাকৃতি উত্তর-পূর্ব্ব কোণ এখন ইটালির আয়ত্ত। এখান থেকে লোহিত-সাগর ও ভারত-মহাসাগরে ইটালির প্রতাপ ছড়িয়ে পড়তে পারে। আবিসিনিয়ার পরপারে আরব-উপকূলে ইটালীয়দের দৃষ্টি আছে, এবং এ-অঞ্চলে নৌবলের কেন্দ্র

গড়ে' তোলবার জল্পনার কথাও এখন শোনা যাচ্ছে। ইংরাজদের বিব্রত করে' তোলবার জন্য আরবজগতে ফাশিস্ট্‌দের চেষ্টাও এরপর প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ল।

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের এক সভ্যকে আক্রমণ করে' অন্য সভ্যের যুদ্ধচালনার পথ দেখায় জাপান (১৯৩১) ; ১৯৩৫-এ ইটালি তার অনুসরণ করল। মাঞ্চুরিয়ার বেলায় লীগ্‌কে নিষ্ক্রিয় করে' রাখেন ইংল্যাণ্ডের কর্ত্তৃপক্ষেরা ; তার মূলে আমেরিকা ও রাশিয়ার সুবিধা-সাধনে ইংরাজদের যে-অনিচ্ছা ছিল সাম্রাজ্যবাদী নীতির স্বাভাবিক বৈশিষ্ট্যই তাই। আবিসিনিয়া-সম্পর্কে ইংল্যাণ্ডের হঠাৎ পরিবর্ত্তন দেখা গেল ; ইংরাজ নেতৃত্বে রাষ্ট্রসঙ্ঘ ইটালিকে দোষী সাব্যস্ত করে' কভেনাণ্টের ষোলো ধারা অনুসারে আর্থিক চাপে আততায়ীকে নিরস্ত করতে চাইল। ইংল্যাণ্ডের এই আকস্মিক উৎসাহের কারণ সহজেই অনুমেয়। উত্তর-আবিসিনিয়া স্থিত টানা-হ্রদ থেকে জলপ্রবাহ নীলনদে সঞ্চালিত হ'য়ে ঈজিপ্টের উর্ব্বরতা বাড়ায়—ইটালীয় কর্ত্তৃত্বে সে-প্রবাহে কোন বাধা সৃষ্টি হ'লে দারুণ ক্ষতির সম্ভাবনা। স্বার্থপ্রণোদিত হ'লেও কিন্তু ইংরাজ-নেতৃত্বে ঠিক এই মুহূর্ত্তে জগতের মঙ্গলের সম্ভাবনা আনে। কিন্তু বাধা আবার এল সাম্রাজ্যতন্ত্রের ব্যবস্থার মধ্যে। জাপান এর আগেই লীগ্‌ ত্যাগ করেছিল, জার্মানিও তখন সরে' দাঁড়িয়েছে ; ফাশিস্ট্‌-ভাবাপন্ন উভয় দেশই তাছাড়া ইটালির জন্য সমবেদনা অনুভব করে। তাছাড়া আমেরিকা সুদূর আবিসিনিয়ার ব্যাপারে উদাসীন রইল। আর ফ্রান্স্‌ও এই সময় ইংরাজদের পূর্ণ সমর্থন করে নি। ইংরাজ-ফরাসীর অনৈক্য ইথিওপিয়ার পতনের অন্যতম

প্রধান কারণ। কিছুদিন থেকে ইংল্যাণ্ড্ হিট্লার্কে বিধিমত প্রশ্রয় দিয়ে আসছিল। এতে উদ্বিগ্ন হ'য়ে ফরাসীরা ইটালিকে হাতে রাখতে চায়; তাই মুসোলীনির সঙ্গে তাদের একটা বন্দোবস্ত হয়েছিল (জানুয়ারি, ১৯৩৫) যার মধ্যে সম্ভবতঃ একটা গুপ্ত সর্ত্ত থাকে যে আবিসিনিয়ায় ইটালির কর্ত্তৃত্ববিস্তারে ফ্রান্স্ বিশেষ আপত্তি করবে না। মুসোলীনি তারপর তাঁর অভিযানে প্রবৃত্ত হন। ইংরাজেরা রাষ্ট্রসঙ্ঘের মধ্য দিয়ে তাঁকে আটকাতে উদ্যত হ'লে, ফ্রান্স্ তখনও ইংরাজদের পূর্ণ সাহায্য করবার পুরস্কারস্বরূপ শুধু একটি প্রতিশ্রুতি চায়। কিন্তু হিট্লার্ কোন দেশ আক্রমণ করা মাত্র তাঁকে আটকাবার জন্য ইংল্যাণ্ড্ তৎক্ষণাৎ ফ্রান্সকে সাহায্য পাঠাবে, এই অঙ্গীকারে ইংরাজ মন্ত্রীরা রাজি হলেন না (সেপ্টেম্বর্, ১৯৩৫)। সুতরাং এর পর ইটালির বিরুদ্ধে ফ্রান্সের পূর্ণ সহায়তা পাওয়া-ও শক্ত হ'ল। তখন মুসোলীনিকে নিরস্ত করার চেষ্টা শুধু ভয়প্রদর্শনে পর্য্যবসিত হয়। আর্থিক চাপ সফল হ'তে হ'লে, সকল দেশ থেকে ইটালিতে পেট্রল্ চালান বন্ধ করার প্রয়োজন ছিল। ইটালির স্বদেশজাত পেট্রলের অভাবে তখন তার পক্ষে যুদ্ধ অসম্ভব হ'য়ে উঠ্‌ত, কিন্তু তার আগে ইটালি নিশ্চয়ই একবার অন্যদের আক্রমণ করে' জিতবার শেষ চেষ্টা দেখত। সে-অবস্থায় তাকে সবলে বাধা দেবার দায়িত্ব ইংল্যাণ্ড্ একা নিতে চায় নি, আর মহাশক্তি ছাড়া অন্যদের সে-সামর্থ্যও ছিল না। পেট্রল্ চালান তাই বন্ধ হ'ল না, এবং কিছুদিনের মধ্যেই সেই জন্য ইটালির বিজয়ের পথে আর কোন বাধা থাকে নি (১৯৩৬)।

আবিসিনিয়ার স্বাতন্ত্র্যলোপের সঙ্গে সঙ্গে স্পেনের দুর্দ্দিন ঘনিয়ে এল। স্পেনের রাষ্ট্র ও সমাজে ফিউডাল্ প্রভাব প্রায় আজ পর্য্যন্ত চলে' এসেছে—অভিজাত ভূস্বামীদের বিস্তীর্ণ অধিকার, ক্যাথলিক্ ধর্ম্ম-প্রতিষ্ঠানের বিশাল প্রতিপত্তি, প্রাচীনপন্থী সৈন্যদলের প্রচণ্ড প্রতাপ, এর নিদর্শন। ধনতন্ত্রের গোড়ার দিকে স্পেন্ পিছিয়ে পড়ে, ইউরোপের অধিকাংশ অঞ্চলে তখন যেমন মধ্যশ্রেণীর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হয়, এখানে তার অভাব হ'ল। মধ্যশ্রেণীর বাঞ্ছিত উদার-নীতিও তাই স্পেনে বহুদিন মাথা তুল্‌তে পারে নি। কিন্তু যন্ত্রশিল্পের দ্রুতবিস্তারের পর, পূর্ব্বথেকে প্রস্তুত না থাকলেও, সব দেশকে বর্ত্তমান ধনিকতন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়তে হয়েছে। স্পেনে তাই একদিকে ফিউডাল্ প্রভাব এখন পর্য্যন্ত বিরাজ করলেও, অন্যদিকে ধনতন্ত্রের ফলহিসাবে শক্তিশালী শ্রমিক সম্প্রদায়েরও উদ্ভব হয়েছিল। শেষ বুর্বন্‌রাজ আল্‌ফন্‌সোর অক্ষমতার জন্য, ১৯২৩-এ সেনাধ্যক্ষ প্রিমো ্‌দে রিভেরা স্পেনের প্রকৃত শাসক হ'য়ে পড়েন, কিন্তু পুঞ্জীভূত অসন্তোষের ফলে কিছুদিনের মধ্যেই ডিক্‌টেটরের পতন হ'ল (১৯৩০)। ১৯৩১-এর এপ্রিলে সহসা আল্‌ফন্‌সোকে বিতাড়িত করে' জনগণের আনন্দোচ্ছ্বাসের মধ্যে রেপাব্লিক্ স্থাপিত হয়েছিল। এর পর শাসনকার্য্য মধ্যপন্থীয় দলগুলির হাতে থাকলেও, দক্ষিণমার্গীয়দের দৃঢ় বিশ্বাস হ'ল যে স্পেন্ বল্‌শেভিজ্‌মের রসাতলে ডুব্‌তে চলেছে; ১৯৩১-এর বিপ্লব ঠেকাতে না পারলেও তারা তাই প্রাচীন-সমাজ সংরক্ষণে কৃতসংকল্প হয়। নূতন আমলে স্পেনে এতদিনকার নিরুদ্ধ সংস্কারকামনা প্রবল

হ'য়ে ওঠাতে, দক্ষিণপন্থায় বিশ্বাস প্রতিবিপ্লবের চেষ্টার আকার নিল। ১৯৩৬-এ বিদ্রোহ আরম্ভ হয় সৈন্যসমষ্টির মধ্য থেকে—সেনাপতি ফ্রাঙ্কোর নেতৃত্বে উচ্চতন প্রায় সকল সেনানী বিদ্রোহে যোগ দিয়েছিল। দেশের মধ্যে ফ্রাঙ্কোর প্রধান সহায় ছিল জমিদারবর্গ এবং ক্যাথলিক্ পুরোহিতসম্প্রদায়, এবং এই জন্যই এই দুই শ্রেণীর লোকেরা স্থানবিশেষে বিপন্ন গণতন্ত্রের সমর্থকদের হাতে বিস্তর নির্য্যাতন ভোগ করে। ক্যাথলিক্ ধর্ম্মের মতবিশ্বাস সকল সংস্কার-কামনার ঘোর প্রতিবন্ধক ; সুতরাং ১৯৩১-এর বিপ্লবের পর সে মত-প্রচারের অবাধ স্বাধীনতায় কিছু হস্তক্ষেপ করা হয়েছিল। মধ্যমার্গীয় শাসকেরা পর্য্যন্ত তখন জেসুইট্-সঙ্ঘকে ভেঙ্গে দেবার আদেশ দেন এবং ক্যাথলিক্ সাম্প্রদায়িক বিদ্যালয়গুলিকে অবৈধ ঘোষণা করা হয়। ক্যাথলিক্ পুরোহিতেরা তাই অনেকদিন থেকেই নূতন রেপাব্লিকের পতন চাচ্ছিল। অন্যদিকে জমিদারদের ত্রাসের কারণ জমি পুনর্বণ্টনের প্রস্তাব। গিল্ রব্লেসের নেতৃত্বে ক্যাথলিক্ আক্সিয়ন্-পপুলার্ দল প্রথমে সাধারণতন্ত্রকে নানাভাবে ব্যতিব্যস্ত করে' তোলে। ফ্রাঙ্কো-বিদ্রোহের আগে রেপাব্লিকের পাঁচবৎসর জীবনের প্রথমার্দ্ধ এই ভাবে কাটে—এ হ'ল সেনর্ আজানার যুগ, তখন মধ্যপন্থীয় শাসকেরাও বামমার্গীয় সোশ্যালিস্ট্দের উপর খানিকটা নির্ভর করে' চলেছিলেন। দ্বিতীয়ার্দ্ধে, রেপাব্লিক্ টিকে থাকলেও দক্ষিণপন্থীয়দের কর্টেজ্ বা জাতীয় মহাপরিষদে প্রাবল্য থাকায়, মন্ত্রীরা অনেকখানি এদের দ্বারা চালিত হ'ন—এই সময়টা সেনর্ লেরুর যুগ। তখনকার নির্য্যাতনের

ফলে আস্টুরিয়া প্রভৃতি অঞ্চলে শ্রমিক-বিদ্রোহ হয় এবং শ্রমিকদের সবলে দমন করাও হয়েছিল। ১৯৩৬-এর প্রথমে সাধারণ নির্ব্বাচনে উন্নতিকামী সকল দলগুলি একজোট হয়, তার ফলে ভোট্ সংখ্যায় দক্ষিণমার্গীয়দের হ'ল সমূহ পরাজয়। সংখ্যাগণনায় পরাস্ত হবার কিছুদিন পর ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহ আরম্ভ হ'ল। নামে বল্‌শেভিজ্‌ম্-এর বিরুদ্ধে অভিযান হ'লেও, নির্ব্বাচন-ফলকে অগ্রাহ্য করার নিমিত্ত ফ্রাঙ্কোর বিদ্রোহ বস্তুতঃপক্ষে গণতন্ত্র ও উদারনীতিকে অস্বীকারের সামিল। জনসাধারণের সম্মেলনের আদর্শে তাই সোশ্যালিস্ট্‌রা এখন রেপাব্লিক্‌কে রক্ষা করতে উদ্যত হ'ল। স্পেনের অন্তর্বিরোধের স্বরূপ এই।

এ-অবস্থায় বিদেশ থেকে অন্তর্যুদ্ধে হস্তক্ষেপ নিতান্ত অসঙ্গত। কিন্তু প্রথম থেকেই ফ্রাঙ্কো ইটালির সাহায্য পেলেন, এমন কি বিদ্রোহের পূর্ব্বেও সাহায্যের বন্দোবস্ত হ'য়ে থাকা বিচিত্র নয়। স্পেন্ ইটালি বা জার্মানির তুলনায় অনুন্নত, স্পেনে ফাশিস্ট্-দলও তাই জনসাধারণের চাইতে জমিদার, পুরোহিত ও সেনানীদের উপরই বেশী নির্ভর করে। কিন্তু ফাশিস্ট্‌দের মূল উদ্দেশ্য—সোশ্যালিজ্‌মের বিরুদ্ধাচরণ—সর্ব্বত্রই এক। রাশিয়ার সঙ্গে স্পেনের অবস্থার সাদৃশ্য লেনিনের চোখে পড়েছিল। স্পেনে বামপন্থার প্রসার রোধই তাই ফ্রাঙ্কোর লক্ষ্য হ'ল। ইটালি বা জার্মানির সে-উদ্যমে পূর্ণ সহানুভূতি আছে। তাছাড়া স্পেনের মতন দুর্ব্বল দেশেই সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সুযোগ আসে। ভূমধ্য-সাগরকে ইটালীয়রা বলে' আমাদের সমুদ্র ; এখানে কর্ত্তৃত্বের ফলে নূতন রোমান্-সাম্রাজ্যের সঙ্গে ইটালির

যোগ নিরাপদ হবে, আর সেইসঙ্গে বিপন্ন করে' তোলা যাবে ইংল্যাণ্ডের থেকে প্রাচ্যে যাতায়াতের ব্যবস্থা ও ফ্রান্সের সঙ্গে তার আফ্রিকাস্থিত রাজ্যের যোগাযোগ। ব্যালেরিক্-দ্বীপমালার উপরও তাই ইটালির চোখ আছে। স্পেনে ফাশিস্ট্-রাজত্ব স্থাপিত হ'লে সে-দেশ বাধ্য হ'য়ে ইটালির অনুগত হ'য়ে পড়বে। ইটালির অভিযানের মূল এই সব জল্পনায়। জার্মানিরও স্পেনে কিছু স্বার্থ আছে। উত্তর-স্পেনের খনিজ পদার্থ অতি মূল্যবান; মরক্কো-অঞ্চলে জার্মানির পূর্ব্ব প্রভাবের পুনরুদ্ধার বাঞ্ছনীয়; কেনারি-দ্বীপমালায় সাব্মেরিন্ বা বিমান স্থাপনের ব্যবস্থার সুবিধা যুদ্ধের সময় ব্রিটিশ্ বাণিজ্যকে বিপদসঙ্কুল করে' ফেলতে পারে; এসব দিকে গোলযোগের সৃষ্টি হ'লে ইংল্যাণ্ড্ শান্তি-রক্ষার খাতিরে কিছু উপনিবেশ জার্মানিকে ফিরিয়ে দেবেও হয়ত। স্পেনে বিদ্রোহীদের সাফল্য প্রধানতঃ ইটালি ও জার্মানির সহায়তায় হয়েছে, এবং বিদেশ থেকে এই সাহায্য গ্রহণে নিঃসন্দেহে ফ্রাঙ্কোর দলই ছিল অগ্রণী। অন্যদিকে শ্রমিক-প্রগতির খাতিরে রাশিয়া এবং অন্ততঃ নিজের দক্ষিণ-সীমান্তেও ফাশিস্ট্-বিপদ এড়াবার বাসনায় ফ্রান্স্ পরেস্পেনে রেপাব্লিক্কে কিছু সাহায্য করেছে। সারা জগতের দক্ষিণ ও বামপন্থার বিরোধ তাই স্পেনের অন্তর্বিরোধে মূর্ত্তি নিল, আর উভয়পক্ষকে সাহায্যের ছলে ফাশিস্ট্ ও ফাশিস্ট্-বিরোধী শক্তিরা খানিকটা পরস্পরের সম্মুখীন হয়। এখানেও ইংল্যাণ্ডের পরিপূর্ণ সহায়তা থাকলে ফ্রান্স্ ও রাশিয়া স্পেনের রেপাব্লিক্কে সহজে বাঁচাতে পারত; এমন কি যদি বিদেশ থেকে কোন পক্ষকেই সাহায্য নিতে

না দেওয়া হ'ত, তাহলেও ফ্রাঙ্কোর পরাজয় নিঃসন্দেহ ছিল। কিন্তু ইংল্যাণ্ডের বৈদেশিক-নীতির সুবিদিত সুবিধাবাদ এক্ষেত্রেও সে-আশা ব্যর্থ করেছে। পূর্ব্ব পরাজয়ের ফলে রাষ্ট্রসঙ্ঘও এতদিনে গতাসুপ্রায়।

হিট্‌লার্ ও নাৎসি-প্রকোপ

লক্ষ্য এক থাকলেও অন্যের উপর কর্ত্তৃত্বের লোভ ছাড়া সহজ না। তাই সোশ্যালিস্ট্‌দের আটকে রাখার কাজে নাৎসি-দলের কৃতিত্ব বহু-স্বীকৃত হ'লেও, প্রেসিডেণ্ট্ হিণ্ডেন্‌বুর্গের পার্শ্বচরেরা সহজে হিট্‌লার্‌কে প্রধান মন্ত্রীর পদ ছেড়ে দিতে রাজি হ'ন নি। হিট্‌লার্ চান্সেলার্ হবার পরও হুগেন্‌ব্যর্গ্ প্রভৃতি ন্যাশনালিস্ট্ নেতারা ভেবেছিলেন যে তাঁকে হাতে রাখতে পারবেন। কিন্তু হিট্‌লারের পিছনে তখন প্রভূত শক্তি—নাৎসি-দলের অগ্রগতি তখন অপ্রতিহত। অন্তর্বিভক্ত নিশ্চেষ্ট জার্মান্ শ্রমিক-সমাজ কর্ত্তব্য স্থির করবার আগেই রাষ্ট্রিক ক্ষমতা হিট্‌লারি-দলের হাতে সম্পূর্ণভাবে এসে পড়ল। নূতন আভ্যন্তরিক-সচিব নাৎসিনেতা ডক্টর্ ফ্রিক্ শাসনযন্ত্রের সর্ব্ববিভাগে নাৎসি-কর্ত্তৃত্ব স্থাপন করলেন। গোয়রিং প্রাশিয়ার অধ্যক্ষ হ'য়ে পুলিশ-বিভাগকে নিজেদের সম্পূর্ণ আয়ত্ত করে' ফেলেন। নাৎসি-দলের ঝঞ্চাবাহিনী একেবারে সরকারী সৈন্যদলের পদমর্য্যাদা ও অধিকার লাভ করল; সমাজতন্ত্রী কাগজগুলির প্রকাশ নানা অছিলায় বন্ধ করা হ'ল। অনেক শ্রমিক নেতা বিনা বিচারে আটক হ'লেন। মার্চ্চে সাধারণ নির্ব্বাচনের ঠিক আগে (১৯৩৩) ব্যবস্থাসভা রাইশ্‌স্টাকের বাড়ী হঠাৎ ভস্মীভূত হয়। রব উঠল যে এর কারণ সাম্যবাদী চক্রান্ত—সে-উত্তেজনাতেই

হিট্‌লারের দল লক্ষ লক্ষ ভোট সংগ্রহ করে' নূতন পরিষদে নিজেদের সংখ্যাধিক্য জোগাড় করতে পারল। ইংল্যাণ্ডের ১৯২৪-এর নির্ব্বাচনে দক্ষিণপন্থীরা রুষ-বিপ্লবী জিনোভিয়েভ্‌-এর নামে এক জাল চিঠি হঠাৎ প্রচার করে' শ্রমিকদলকে অপদস্থ ও পরাস্ত করেছিল। রাইশ্‌স্টাকে অগ্নিকাণ্ড আসলে তারই অনুরূপ ব্যাপার। বিচারে এক অর্দ্ধোন্মাদ লোকের আগুন লাগাবার অপরাধে প্রাণদণ্ড হ'লেও, সাম্যবাদীদলের দায়িত্বের কোন প্রমাণ-ই পাওয়া গেল না। বিদেশী জনমত উত্তেজিত হওয়ায় লাইপ্‌জিগে বন্দীদের প্রকাশ্য বিচার করতে হয়েছিল—আদালতে অভিযুক্ত সাম্যবাদীরা তখন ডিমিট্রভের নেতৃত্বে সকল অভিযোগ মিথ্যা প্রতিপন্ন করে; এমন কি শেষ পর্য্যন্ত অগ্নিকাণ্ডটি নাৎসিদলেরই গুপ্ত কীর্ত্তি এ-সন্দেহ অন্ততঃ বিদেশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু ততদিনে নাৎসিদের অভীষ্ট সিদ্ধ হয়েছিল। ষড়যন্ত্রের সন্দেহ মাত্র সাম্যবাদী-দল বেআইনী ঘোষিত হয়, জার্মানির প্রতি অঞ্চলে এক একজন নাৎসি অভিভাবকের পূর্ণকর্ত্তৃত্বও এই উপলক্ষ্যে স্থাপিত হয়েছিল। মার্চ্চের শেষে নূতন রাইশ্‌স্টাক্‌ চার বৎসরের জন্য শাসনকার্য্যের সমস্ত অধিকার হিট্‌লারের হাতে সমর্পণ করে' অবসর গ্রহণ করল। প্রতিনিধি-সভার এইভাবে নির্ব্বাণলাভ হয়—বলা বাহুল্য যে তারপর হিট্‌লারি কর্ত্তৃত্বের মেয়াদ বিনা বাক্যব্যয়ে বাড়িয়ে দেওয়া হয়েছে।

নাৎসি-কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের ইতিহাস হ'ল এই। এর পরবর্ত্তী কালের নাৎসি-শাসনের কথা বোধ হয় সুবিদিত। সাম্যবাদীদের উচ্ছেদ সাধনের পর নিরীহ সোশ্যাল্‌-ডিমক্রাসিও ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল। এই দলের এতদিনকার

নিয়মানুগত্য ও বিপ্লবে পরাঙ্মুখতা দক্ষিণপন্থীদের হাতে কোন পুরস্কারই পায় নি। বিশাল শ্রমিক-সঙ্ঘগুলি এদের আয়ত্তে থেকে এতদিন নিশ্চেষ্টভাবে হিট্‌লারের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠা হ'তে দিয়েছিল। এখন সঙ্ঘগুলি সব সহসা ভেঙ্গে দেওয়া হ'ল। মার্ক্সের মতবাদ তাঁর স্বদেশে এইভাবে দণ্ডনীয় হ'য়ে পড়ে, কোন মার্ক্সীয়-মণ্ডলীর প্রকাশ্য অস্তিত্ব আজ সেখানে অসম্ভব। শ্রমিক-বিপ্লবের ধারণা পর্য্যন্ত দমন করাই জার্মান্ ফাশিজ্‌ম্‌এর প্রধান উদ্যম। শক্তিশালী সশস্ত্র দলের সাহায্যে শাসনযন্ত্রের উপর পূর্ণকর্ত্তৃত্ব স্থাপন, সেই ক্ষমতা ব্যবহারের ভিতর দিয়েই বিরোধীদের উচ্ছেদ-সাধন, দেশব্যাপী প্রোপাগাণ্ডার উত্তেজনায় জনসাধারণের চিত্তাকর্ষণ—নাৎসি-বিপ্লবের স্বরূপ হ'ল এই। এর পর যে-উগ্র বৈদেশিক-নীতি অবলম্বিত হয়েছে তার উদ্দেশ্য খানিকটা জনপ্রিয়তার অর্জ্জন, আর বাকীটা বিস্তারের মধ্য দিয়ে আর্থিক দুরবস্থা কাটিয়ে ধনিকদের লাভের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। নাৎসি-অভিযানের মূলরূপকে অবশ্য আবৃত করে' রেখেছে অনেক অবান্তর উত্তেজনা; জার্মানির মতন উন্নত দেশকে দাবিয়ে রাখা কষ্টসাধ্য বলে'ই, সেখানে ডক্টর্ গোয়্‌ব্‌ল্‌স্-এর একনিষ্ঠ নাৎসি-প্রোপাগাণ্ডার এত প্রয়োজন। নূতন জার্মানির বৈদেশিক-নীতিতে তাই এত ন্যায়ধর্ম্ম, আত্মসম্মান ও জাতিপ্রীতির ছড়াছড়ি; ভের্সায়ির অবিচার আজ প্রায় অতীতের কথা হ'য়ে দাঁড়ালেও তাই নিয়ে এইজন্য এত অভিযোগ ও আস্ফালন চলেছে। ইউরোপে নানা দেশের মধ্যে য়িহুদিদের প্রতি বিদ্বেষ মধ্যযুগ থেকে লোক ক্ষেপাবার অস্ত্র হিসাবে ব্যবহৃত

হয়েছে ; জনসাধারণের মজ্জাগত সেই বিদ্বেষে আহুতি দিয়ে জার্মানিতে এখন প্রচারিত হ'ল যে মার্ক্স্‌বাদ আসলে শ্রমিকদের ঠকাবার জন্য য়িহুদি ষড়যন্ত্র মাত্র। বলা হ'ল যে নাৎসিদের মতামতই নাকি খাঁটি সোশ্যালিজ্‌ম্, যদিও মূলসূত্র ধরলে দুয়ের মধ্যে বিন্দুমাত্র মিল নেই। কয়েকটি য়িহুদি ধনিক ও ততোধিক য়িহুদি দোকানদারকে নির্য্যাতিত করতে পারলেই প্রমাণ হ'ল যে নাৎসি-আমল ধনিকতন্ত্র নয়। আর্য্যামির অহঙ্কার য়িহুদিবিদ্বেষবুদ্ধির অপরদিক। নগণ্য জনসাধারণ পর্য্যন্ত যে বিধাতার অপূর্ব্ব সৃষ্টি এই স্তোকবাক্য হিসাবেই নর্ডিক্-মাহাত্ম্যকীর্ত্তনের সার্থকতা। ইটালি ও জাপান নর্ডিক্ নয়—তবে সেখানকার ফাশিস্ট্‌দেরও গৌরব করবার উপলক্ষ্যের অভাব সহজে হবে না ; ইটালির আছে প্রাচীন রোম্-সাম্রাজ্য, জাপানের আছে মধ্যযুগের ক্ষত্রিয় (সামুরাই) গুণাবলী। অনুরূপ অবস্থায় সকল দেশেই অতীতগৌরববাহিণী অথবা বর্ত্তমানবৈশিষ্ট্যপ্রচারিণী এইজাতীয় অহঙ্কারের আশ্রয় পাওয়া যায়।

মুসোলীনির ইটালির মতন হিট্‌লারের আমলে জার্মানিরও অনেক বাহ্যিক উন্নতি হয়েছে। পরাজিতের যে-মনোভাব যুদ্ধান্তে জার্মান্‌দের পেয়ে বসেছিল আজ তার সম্পূর্ণ তিরোধান ঘটেছে। হ্বাইমার্-যুগে যে-দলাদলি দেশকে অভিভূত করেছিল তার বদলে এসেছে নূতন আশা, জাতীয় ঐক্যের আদর্শ, ভবিষ্যতের ভরসা। মহাশক্তিদের মধ্যে জার্মানি আবার প্রবল হয়েছে ; অস্ত্রবল সম্ভবতঃ তারই আবার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; আত্মরক্ষা, রাজ্যবিস্তার ও অন্যদের উপ অত্যাচার করবার ক্ষমতা আবার ফিরে এসেছে। কর্ম

শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করে' দেশের দরকারী কাজে লাগানো ও সমস্ত জাতির কর্ম্মকুশলতার বৃদ্ধিসাধন এ-সকলই উপস্থিত শক্তির পরিচায়ক। কিন্তু এ-সমস্তই সাময়িক বিচার মাত্র, ইতিহাসে তার চেয়েও ব্যাপক একটা বিচারের প্রয়োজন এসে পড়ে, যদিও সে-বিচারে সর্ব্বস্বীকৃত মাপকাঠির অভাব আছে। বর্ত্তমান আর্থিক বিধিব্যবস্থা পরিবর্ত্তনের কোন প্রয়োজন থাকলে স্বীকার করতেই হবে যে জার্মানিতে সে-সমস্যা সমাধানের কোন চেষ্টাই হয় নি, ইটালির কর্পোরেটিভ্-রাষ্ট্রের মতন নাৎসি-আমলে জার্মান্-রাইশের তথাকথিত তৃতীয় অবস্থাতেও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এই সম্পর্কে কোন স্থায়ী আশার চিহ্নমাত্র নেই। তখন প্রশ্ন ওঠে যে তাহ'লে জার্মান্ জাতির নাৎসি-প্রভুত্ব সহ্য করবার সার্থকতা কি? অথচ ইউরোপ্ ও সারা জগতের পক্ষে হিট্‌লারি-জার্মানি যে বিষম ভয়ের কারণ হ'য়ে দাঁড়িয়েছে সে-কথাও এ-প্রসঙ্গে মনে পড়তে বাধ্য।

শ্রমিকদমন ছাড়াও অবশ্য হিট্‌লারের জার্মানিতে অন্য ব্যাপার চোখে পড়ে। উৎপীড়নের ফলে জার্মানির জগদ্বিখ্যাত সংস্কৃতিরও সমূহ ক্ষতি হ'ল—বহু বিখ্যাত লোককে এজন্য দেশত্যাগী হ'তে হয়। তাছাড়া শত শত সাধারণ লোক এখন পর্য্যন্ত বিনা বিচারে আটক রয়েছে। সর্ব্বগ্রাসী স্টেটের বন্দনা ও নেতার আনুগত্যের আধ্যাত্মিক মূল্যকীর্ত্তন এখন প্রবলতর হয়েছে। ইটালির মতন সমস্ত জার্মান্-জাতির এক ধর্ম্ম না থাকায়, ফাশিস্ট্-স্টেট্ ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের দ্বন্দ্ব জার্মানিতে দেখা দেওয়া স্বাভাবিক। কে জার্মান্ ক্যাথলিক্ জনসাধারণ খাঁটি নাৎসিদের

মতন অতখানি স্টেট্‌-উপাসক হ'তে পারে নি—অন্যদিকে প্রটেস্টাণ্ট্‌ যাজকদের মধ্যেও একটা অপ্রত্যাশিত স্বাতন্ত্র্যের স্পৃহা দেখা গেছে। তার উত্তরে ফাশিস্ট্‌-নেতারা কেউ কেউ এক নূতন ধর্ম্মের প্রশ্রয় দিচ্ছেন—প্রাচীন টিউটন্‌-ধর্ম্মবিশ্বাসের সঙ্গে এত শতাব্দীর পরে তার যোগের চেষ্টা অবশ্য নিতান্তই হাস্যাস্পদ। কিন্তু হিট্‌লারি-আমলে নূতন নূতন সাফল্য ও বিজয়ের নেশা জার্মানিকে পেয়ে বসেছে —ঐতিহাসিকের চোখে তাই প্রাক্‌সামরিক জার্মানির চিত্র যেন আজ আবার সজীব হ'য়ে উঠছে। সেই সঙ্গেই মনে পড়া স্বাভাবিক যে সাম্রাজ্যবাদের পরিচালনায় জার্মানির অদৃষ্টে সে বার দুর্গতিই জুটেছিল। এই নেশায় জার্মান্‌ জাতি হিট্‌লার্‌কে এখন পর্য্যন্ত পূর্ণ সমর্থন করছে। হিট্‌লার্‌ তাই মাঝে মাঝে ভোট্‌ নিয়ে জগতকে তাঁর ক্ষমতার প্রভাব দেখান। এই জনপ্রিয়তার জন্য হিট্‌লার্‌ ও তাঁর অনুচরদের প্রতাপ হ'য়ে উঠেছে অপ্রতিহত। পুরাতন ন্যাশনালিস্ট্‌দের অবস্থা এখন খানিকটা হঠাৎনবাবদের গরীব আত্মীয়ের মতন। হিণ্ডেনবুর্গের মৃত্যুর পর হিট্‌লার্‌ প্রেসিডেণ্ট্‌ ও চান্স্‌লার্‌ উভয় পদ নিজের হাতে রেখে রাষ্ট্রনেতা আখ্যায় পরিচিত হন। ফন্‌ পাপেন্‌ এখন নূতন শাসকদের অনুগত ভৃত্য। কিন্তু প্রভুত্ব যেই করুক, ধনিকতন্ত্র অব্যাহতই থাকছে; ধনিকপ্রবর, জমিদারগোষ্ঠী ও রাইশ্‌ওয়েরের সেনানীবৃন্দের প্রকৃত কোন স্বার্থহানির লক্ষণ এখনও দেখা যায় নি। ১৯৩৪-এর জুনে যে-আকস্মিক হত্যাকাণ্ড হয়েছিল, তার কোনও প্রকৃত অর্থ থাকলে সংস্কারচেষ্টার দমনের মধ্যেই তাকে খুঁজতে হবে। রোয়েম্‌, আর্ন্স্ট্‌, হাইন্‌স্‌ প্রভৃতি নিহত নাৎসি-

নেতারা ঝঞ্ঝা-বাহিনীর মধ্যে সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার সংস্কারক হিসাবেই গণ্য হতেন—তাঁদের কেউ কেউ হয়ত ভাবছিলেন যে নাৎসি-আমলে কোন প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন হচ্ছে না। স্ট্রেসার্ ১৯৩২-এর আগে পর্য্যন্ত নাৎসি-দলকে ঘোর সংস্কারক বলে' বরাবর বর্ণনা করতেন; এখন তাঁর হত্যায় সংস্কার-সংকল্পই শক্তি হারাল। হিট্লার্ যখন তাঁর কোন কোন সঙ্গীকে এমন নির্ম্মম ভাবে ধ্বংস করেন, তখনকার গণ্ডগোলের সুবিধা নিয়ে হয়ত ব্যক্তিগত কারণেও কারো কারো প্রাণনাশ হয়। কিন্তু সেনাপতি শ্লাইশারের অপঘাত মৃত্যুতে হিট্লারেরই এক শক্তিশালী প্রতিদ্বন্দ্বীর লোপ হ'ল। এর পর সম্প্রতি রাইশ্ওয়ের্-এর কোন কোন নেতার পদচ্যুতি হিট্লারের ব্যক্তিগত প্রতাপের পরিচয় হ'লেও তাতে নাৎসি-শাসনের প্রকৃতির কোন বদল হয়েছে মনে করবার বৈধ কারণ নেই।

হিট্লারের আত্মসাধনার স্বরচিত বিবরণের সম্পূর্ণ ভাষান্তর বিদেশে পাওয়া দুর্লভ—সমগ্র গ্রন্থের ফরাসী অনুবাদের প্রচলন জার্মান্-সরকার বন্ধ করবার চেষ্টা পর্য্যন্ত করেন। অথচ এই বই জার্মানিতে এখন নাকি শিক্ষার অপরিহার্য্য অঙ্গ। হিট্লারের মতে জার্মানির প্রধান কর্ত্তব্য অন্য সকলের চাইতে বেশী সামরিক শক্তি অর্জ্জন, অস্ত্রবলে সমকক্ষ কারো অস্তিত্ব জার্মানির সহ্য করা উচিত নয়। প্রতিদ্বন্দ্বী বিনাশের প্রধান উপায় যুদ্ধ, আর যুদ্ধ নাকি কিছু অমঙ্গলের আকর না। রাজ্যবিস্তার জার্মানির ধর্ম্ম, কিন্তু লক্ষ্য শুধু ১৯১৪ সালের সীমান্ত ফিরিয়ে পাওয়া নয়। প্রসারের উদ্দেশ্য এমন কি শুধু সকল জার্মান্ভাষীদের একত্র

করাও না, উদ্দেশ্য জার্মান্‌ জাতির আর্থিক ও রাষ্ট্রিক পূর্ণ পরিণতি সম্ভব করে' তোলা। মধ্য ও পূর্ব্ব-ইউরোপে বিস্তারলাভ নাকি জার্মানির ভাগ্যলিপি ও বিধাতার বিধান। তাই রাশিয়ার কাছ থেকে জার্মান্‌দের এ-অঞ্চলে ভূখণ্ড কেড়ে নেওয়া অবশ্যম্ভাবী। এর জন্য আবশ্যক ফ্রান্স্‌কে একক অবস্থায় দুর্ব্বল করে' রাখা—অতএব ইটালি ও ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে প্রথমে সখ্যবন্ধন প্রয়োজন। কিন্তু সে-ব্যবস্থাও সাময়িক—পরিণামে সারা জগতে শ্রেষ্ঠ জাতি হিসাবে জার্মানির প্রভুত্ব স্থাপিত হওয়াই স্বাভাবিক।—এই প্রত্যেকটি মত হিট্‌লারের গ্রন্থে বিশদভাবে বর্ণিত আছে, এবং হিট্‌লার্‌ নিজে এখন পর্য্যন্ত এর কোনটি প্রকাশ্যে প্রত্যাহার করেন নি। তাছাড়া ফেডার্‌ বলেছিলেন যে বিদেশে প্রত্যেক জার্মান্‌কে জার্মানির প্রজা করতে হবে—সেই সঙ্গে যে সহস্র সহস্র বিদেশী জার্মানির পদানত হ'য়ে পড়বে সেকথা তুচ্ছ ভেবেই তিনি উল্লেখযোগ্য মনে করেন নি। রোজেন্‌ব্যর্গের মতে নর্ডিক্‌দের ভোগের জন্য নিকৃষ্ট জাতির জমি ছেড়ে দিতেই হবে।

এই দুর্দ্দম প্রসার-প্রবৃত্তির পিছনে সাম্রাজ্যতন্ত্রের চালক শক্তিই রয়েছে মনে হয়—তারও প্রকৃতি এইভাবে কূল ছাপিয়ে পড়া। নাৎসি বৈদেশিক-নীতি এই প্রবৃত্তির অনুসরণ করে' চলেছে, আর এক্ষেত্রেও ইংরাজ মন্ত্রীরা অনাগত ভবিষ্যৎকে অবজ্ঞা করে' শুধু মুহূর্ত্তের সুবিধা খুঁজে বেড়াচ্ছেন। শুভাদৃষ্টে বিশ্বাস ইংরাজদের বোধ হয় মজ্জাগত। তাই অধ্যাপক কেন্‌স্‌ পর্য্যন্ত লিখেছেন যে কোনও ক্রমে এখন যুদ্ধের আশঙ্কা এড়াতে পারলেই হ'ল—অর্থাৎ ভবিষ্যতের

ভাবনা ভবিষ্যৎই ভাববে। শান্তিবাদীদের আবার এক স্থির নীতি, যে কোন ক্রমেই যুদ্ধ করা উচিত না। অতএব এদের মতে ইটালির উপর আবিসিনিয়া-প্রসঙ্গে আর্থিক চাপ দেওয়া অন্যায় হয়েছিল, আর জার্মানি যা চায় তাই তাকে ছেড়ে দিলেই গোল চোকে। কয়েক বৎসর ধরে' ইংল্যাণ্ডের আচরণ এবং এই চমৎকার যুক্তির নানাদিকে প্রচলন সঙ্কটকে বাড়িয়েই চলেছে। সম্মিলিত চেষ্টায় শান্তিরক্ষার সকল ব্যবস্থা তাই আজ ধূলিসাৎ। এতে করে' জগতে শান্তির সম্ভাবনা বেড়েছে এ-বিশ্বাসের সমর্থক এত প্রচণ্ড শুভবাদী বোধ হয় কেউ নেই।

ইংল্যাণ্ডে শাসকশ্রেণী, এবং এমন কি ফ্রান্সেও লাভাল্, টার্দিউ, ফ্লাদ্যাঁ প্রভৃতি নেতারা, অর্থাৎ উভয় দেশেই প্রচ্ছন্ন-ফাশিস্ট্‌গণের মনে হিট্‌লারি-আন্দোলনের সঙ্গে একটা গোপন সহানুভূতিই নাৎসি-অগ্রগতির সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ। সে-অগ্রসর নীতির সংক্ষিপ্ত উল্লেখই শুধু এখানে সম্ভব। কিন্তু তার স্বরূপ বোঝার পক্ষে সেই বিবরণটুকুই যথেষ্ট। নাৎসি-আমলের আগেই জার্মানি অস্ত্রবর্জ্জনের সভা ত্যাগ করেছিল, হিট্‌লারের হাতে রাজ্যভার আসা মাত্র জার্মানির সমরসজ্জার বিস্তৃত আয়োজন আরম্ভ হ'ল। তারপর জাপানের অনুসরণে জার্মানিও বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ থেকে পদত্যাগ স্থির করে (১৯৩৩)। পোল্যাণ্ডের সঙ্গে জার্মানির, যুদ্ধান্তে বিস্তর অসদ্ভাবের কারণ ঘটে, কিন্তু পোল্যাণ্ডে প্রবীণ নেতা পিল্‌সুড্‌স্কির কল্যাণে এক অর্দ্ধফাশিস্ট্ শাসকসম্প্রদায় গড়ে' উঠেছিল। এই ঝোঁক বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে এখানে ফ্রান্সের উপর আগের মতন নির্ভর

করার চাইতে জার্মানির সঙ্গে একটা আপোষে নিষ্পত্তির ইচ্ছার উদয় হয়। হিট্‌লার্‌ তাই সহজেই পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সখ্যস্থাপন করলেন (জানুয়ারি, ১৯৩৪), যদিও পোলেরা বুদ্ধিমান বলে' এখনও সম্পূর্ণ ধরা দেয় নি। পূর্ব্ব-বৈরীদের এই মিলন অবশ্য সাধারণ-শত্রু রাশিয়ার বিরুদ্ধেই চক্রান্ত।—১৯৩৪-এর জুলাই মাসে নাৎসিরা চেষ্টা করল অস্ট্রিয়া-দখলের। এই ক্ষুদ্র রাষ্ট্রটিতে কিছুদিন আগে সোশ্যালিস্ট্‌-প্রাধান্য সম্ভবপর হওয়াতে ফাশিস্ট্‌-প্রতিক্রিয়ার উদয় হয়। তখন কিন্তু সোশ্যালিস্ট্‌-নেতা বাওয়ারের সুবিদিত শান্তিপ্রিয় সোশ্যাল্‌-ডেমক্রাটিক্‌ কার্য্যপদ্ধতি দক্ষিণ-পন্থীদের বিনা বাধায় শক্তি বৃদ্ধি করতে দিয়েছিল। ক্রমে খর্ব্বাকৃতি ডক্টর ডল্‌ফুস্‌ অস্ট্রিয়ায় একনায়কত্ব স্থাপন করলেন (মার্চ্চ্‌, ১৯৩৩)। পর বৎসর (ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৪) শেষ পর্য্যন্ত সশস্ত্র সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়; সোশ্যালিস্টেরা তখন বিধ্বস্ত ও ভিয়েনার নবনির্ম্মিত বিখ্যাত শ্রমিকনিবাসগুলি গোলাবর্ষণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হ'ল। কিন্তু দক্ষিণপন্থীদের মধ্যেও বিবাদ ছিল—তাই বিদেশী অর্থাৎ জার্মান্‌-নাৎসিদের বিরুদ্ধে স্বদেশী পিতৃভূমি দল গড়ে' ওঠে। ডল্‌ফুস্‌ এই সঙ্ঘর্ষে নাৎসিদের হাতে প্রাণ হারান (জুলাই, ১৯৩৪); কিন্তু ইটালির সাহায্য প্রতিশ্রুতি পেয়ে তাঁর বন্ধু শুস্‌নিগ্‌ তখনকার মত জার্মানির হাত থেকে অস্ট্রিয়ার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে পেরেছিলেন।—নাৎসিদের এর পরবর্ত্তী কীর্ত্তি হ'ল, পূর্ব্ব-ইউরোপে লোকার্নোর অনুযায়ী শান্তিরক্ষার এক চুক্তিতে যোগ দিতে অস্বীকার করা (১৯৩৫)। হিট্‌লার্‌ বল্লেন (মে, ১৯৩৫) যে যুদ্ধকে ছড়াতে দেওয়া উচিত না, অতএব

পরস্পরকে সাহায্যের কোন অঙ্গীকার না করাই মঙ্গল। এর প্রকৃত অর্থ অবশ্য সহজেই বোঝা যায়। এই বৎসরের প্রথমে সার্-অঞ্চল, পনের বছর পর, জনগণের মত গ্রহণের ফলে, জার্মানির সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়। ১৯৩৫-এর মার্চ্চ্ মাসে হিট্‌লার্ ভের্সায়িয়র সন্ধি অগ্রাহ্য করে' উপযুক্তবয়স্ক সকল জার্মান্‌কেই অস্ত্রশিক্ষা নিতে আইনতঃ বাধ্য করলেন। নাৎসিদের সন্ধিভঙ্গের সাফাই হিসাবে মাঝে মাঝে বলা হয় যে ভের্সায়িয়র ব্যবস্থা জার্মানি স্বেচ্ছায় স্বীকার করে নি। কিন্তু এ-যুক্তি অবান্তর, কারণ পরাজিত পক্ষ কখনই স্বেচ্ছায় সন্ধি স্বাক্ষর করে না। স্ট্রেসার-বৈঠকে জার্মানির এ-আচরণ অন্য শক্তিদের দ্বারা মুখে নিন্দিত হ'ল বটে, কিন্তু ইংরাজ মন্ত্রীরা তারপর জার্মানিকে প্রকারান্তরে উৎসাহ-ই দিলেন। নৌবল নির্দ্ধারণের এক ইংরাজ-জার্মান্ চুক্তিতে (জুন্, ১৯৩৫), ইংল্যাণ্ড্ স্বীকার করে যে জার্মানি ইংরাজ নৌ-বহরের শতকরা ৩৫ ভাগ পর্য্যন্ত রণতরী রাখতে পারবে। এই চুক্তিও এক হিসাবে ভের্সায়িয়র ব্যবস্থা ভঙ্গের বন্দোবস্ত—সুতরাং ইংরাজদের এ-আচরণকে নাৎসিদের প্রশ্রয় দেওয়াই বলা চলে। ফরাসীরা এতে উদ্বিগ্ন হ'য়ে আবিসিনিয়ার ব্যাপারে ইটালির বিরুদ্ধে ইংরাজদের পূর্ণ সহায়তা করল না, অন্যদিকে ইংল্যাণ্ড্ও তখন কোন দেশ জার্মান্‌দের দ্বারা আক্রান্ত হ'লে তৎক্ষণাৎ সাহায্যে পাঠাবার প্রতিশ্রুতি দিতে অস্বীকার করে।

১৯৩৬-এর মার্চ্চে জার্মানি লোকার্নো-চুক্তি অগ্রাহ্য করে' রাইন্‌ল্যাণ্ডে আবার সৈন্যস্থাপন করল। লোকার্নো-সন্ধি

অবশ্য জার্মানি স্বেচ্ছায় স্বাক্ষর করেছিল, কিন্তু এতদিনে সন্ধিভঙ্গ যেন একটা অভ্যাসে পরিণত হ'য়ে পড়ে। এই সময় হিট্‌লার্ এক শান্তির প্রস্তাব আনেন। তার প্রধান বৈশিষ্ট্য হ'ল এই যে জার্মানি পশ্চিমে কোন দেশ আক্রান্ত হ'লে তার সাহায্যে প্রস্তুত থাকলেও, পূর্ব্বের দেশগুলির বেলায় (অস্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, লিথুয়ানিয়া ইত্যাদি) সে-অঙ্গীকার দিতে রাজি নয়। এই পার্থক্য মনে সন্দেহই আনে, এবং তাছাড়াও বলা যায় যে নাৎসি-জার্মানির পক্ষে কোনও সন্ধির সর্ত্তপালন ক্রমে দুরাশায় পরিণত হচ্ছে। ১৯৩৬-এর শেষের দিক থেকে জার্মানি স্পেনে ফ্রাঙ্কোর সাহায্যে প্রবৃত্ত হয়েছে, আর সেখানে অল্প দোষে গণতান্ত্রিক পক্ষের উপর মাঝে মাঝে চণ্ডনীতির প্রয়োগ জার্মান্ জাতির সুনাম বাড়ায় নি।

এর পর জার্মানি ও ইটালির মধ্যে সখ্যস্থাপন হয়েছে, বার্লিন্ ও রোমের এই সদ্ভাবকে এখন বিশ্বরাষ্ট্রলীলার মেরুদণ্ড হিসাবে কল্পনা করা হচ্ছে। স্পেনে এ-সখ্যই ফ্রাঙ্কোকে সাফল্যের দিকে এগিয়ে দিয়েছে, অন্যদিকে সাম্যবাদের বিরোধী দলসংগঠনের প্রয়াস হিসাবে জাপানের সঙ্গেও এ দুই শক্তির মৈত্রী স্থাপিত হয়েছে। পৃথিবীর এই তিনটি ফাশিস্ট্-ভাবাপন্ন মহাশক্তির মধ্যে বন্ধুত্ব আন্তর্জ্জাতিক শান্তিভঙ্গের আশঙ্কাস্থল, কারণ তিনটি রাজ্যই প্রসারোন্মুখ। তারপর হিট্‌লার্ ও মুসোলীনির সহযোগে অস্ট্রিয়ার স্বাতন্ত্র্যলোপ হ'ল। অস্ট্রিয়াতে সোশ্যাল্-ডেমক্রাট্ ও সাম্যবাদী-দলের মিলনের পরই প্রতিক্রিয়া হিসাবে নাৎসি-প্রভাবও বাড়তে থাকে। শেষ পর্য্যন্ত শুস্‌নিগ্‌কে সরিয়ে

অষ্ট্রিয়াকে জার্মান্-রাজ্যভুক্ত করা সহজেই সম্পন্ন হ'ল (১৯৩৮)। তারপর থেকে নাৎসিরা চেকোস্লোভাকিয়ার উপর দৃষ্টি দিয়েছে—এ-রাজ্যের সুদেৎ-প্রদেশে অনেক জার্মানের বাস। চেক্-রাজ্য আজ তাই সমূহ বিপন্ন।

১৬

ট্রট্‌স্কি ও স্টালিন্‌

যুদ্ধান্তের জগতে সব চেয়ে আশ্চর্য্য ঘটনা—সোভিয়েট্‌-ইউনিয়ানের সৃষ্টি; ১৯৩৭-এর নভেম্বরে তার কুড়ি বছর পূর্ণ হয়েছে। বিপ্লবের পর থেকে রাশিয়া শ্রমিক-রাষ্ট্ররূপে গণ্য হয়েছে এবং অন্য সকল দেশ থেকে তার পার্থক্য এইখানেই। এর পূর্ব্বগামী অনুরূপ রাষ্ট্র ১৮৭১-এর প্যারিস্‌-কমিউন্‌ আকারে ক্ষুদ্র ও ক্ষণস্থায়ী ছিল। চারিদিকের পৃথিবীব্যাপী ধনতন্ত্রকে ছাড়িয়ে নূতন আর্থিক ব্যবস্থা ও নবীন শ্রেণীবর্জ্জিত সমাজ গড়ে' তোলবার প্রচেষ্টা সোভিয়েট্‌-রাশিয়ার বৈশিষ্ট্য। মার্ক্সের মতে সাম্যতন্ত্রগঠন একটা সম্পূর্ণ যুগের কাজ, ধনিকতন্ত্রও যেমন একদিনে ফিউডাল্‌-ব্যবস্থার স্থান নিতে পারে নি। রাশিয়ায় তাই এখনই সাম্যতন্ত্রী সমাজ দেখার প্রত্যাশা, আদর্শ কতখানি কৃতকার্য্য হ'ল এরমধ্যে তার সঠিক পরিমাণ নির্দ্দেশ, কিম্বা শুধু রুষ অভিজ্ঞতার থেকে সে-আদর্শের সম্ভাবনীয়তা অথবা দোষগুণ সম্বন্ধে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত—এ-সমস্তই অনেকখানি অবান্তর আলোচনা ও পণ্ডশ্রম মাত্র। ঐতিহাসিকের চোখে পড়ে শুধু একটা বিরাট সুসম্বদ্ধ উদ্যম, তার ফলাফল এখনও ভবিষ্যতের গর্ভে। সে-উদ্যমের প্রাণ হচ্ছে মার্ক্সের দৃষ্টিভঙ্গীতে বিশ্বাস। বল্‌শেভিকেরা থিওরি এবং প্র্যাক্‌টিসের অঙ্গাঙ্গী যোগ মানে, তাই তাদের আচরণের বিচার শেষ পর্য্যন্ত একটি

প্রশ্নে গিয়ে দাঁড়ায়—মার্ক্সের নির্দ্দিষ্ট পন্থা থেকে তারা ভ্রষ্ট হচ্ছে কি না। রুষবিপ্লবের পর, গোঁড়া মার্ক্সীয় নামে খ্যাত কাউট্‌স্কি অভিযোগ আনলেন যে লেনিন্ মার্ক্স্‌বাদকে বিকৃত করেছেন। তখন বহু বাদানুবাদ হয়েছিল, তার ফলে আজকের দিনে আর কেউ এ-কথা বলেন না। কিন্তু গত কয়েক বছর বার বার কথা উঠেছে যে এখন স্টালিন্ নির্দ্দিষ্ট আদর্শ ও পন্থা থেকে বিচ্যুত হচ্ছেন—এবার প্রধান অভিযোগকারী লেনিনের সহযোগী স্বয়ং ট্রট্‌স্কি। এ-তর্কবিতর্ক এখনও চলেছে, কিন্তু মার্ক্স্‌তত্ত্বে অভিজ্ঞ অধিকাংশের মতে স্টালিন্‌ই মার্ক্সের প্রকৃত শিষ্য। সাম্যবাদের চিন্তাধারার প্রকাশ বোঝাতে গেলে তাই মার্ক্স্-এঙ্গেল্‌স্-লেনিন্-স্টালিন্ এঁদেরই নির্দ্দেশ অনুসরণ করা সঙ্গত।

লেনিনের মৃত্যুর (১৯২৪) পর, তিনজন নেতার হাতে রাজ্যভার এসে পড়ে। তাঁরা তখন ত্রয়ী নামে খ্যাত হয়েছিলেন—সে-তিনজন জিনোভিয়েভ্, কামেনেভ্ এবং স্টালিন্। কিন্তু বহির্জগতে তখন লেনিনের সহকর্ম্মীদের মধ্যে বোধহয় সব চেয়ে খ্যাতি লাভ করেছিলেন—ট্রট্‌স্কি। বিপ্লবের সময় ট্রট্‌স্কির উপর নেতৃত্বের ভার অনেকখানি পড়ে এবং পরে নূতন লোহিত-বাহিনীর সৃষ্টিকর্ত্তা হিসাবে তিনি প্রসিদ্ধ হ'ন। কিন্তু ট্রট্‌স্কি বহুদিন পর্য্যন্ত মেন্‌শেভিক্ ছিলেন, লেনিন্-বিবৃত মার্ক্স্‌তত্ত্ব তাঁর ঠিক দুরস্ত ছিল না। থিওরির ব্যাপারে এখন পর্য্যন্ত তাঁর দুর্ব্বলতা থেকে গেছে, তাঁর লেখাতে তাই ডায়ালেক্‌টিক্ দৃষ্টিভঙ্গীর অভাব সুবিদিত। তাছাড়া তাঁর স্বভাব ছিল রোমান্টিক্ ধরণের, কমিউনিস্ট্-

দলের নেতৃত্বের তিনি ঠিক উপযোগী ছিলেন না। ট্রট্স্কির মনের গড়নই আদর্শবাদ, বিপ্লববিলাস ও নৈরাজ্যতন্ত্রের অনুকূল। লেনিনের ব্যক্তিত্ব তাঁকে কিছুদিন আচ্ছন্ন করে' থাকলেও, অবিসম্বাদী নেতার মৃত্যুর পর তাই কমিউনিস্ট্-দল ট্রট্স্কির উপর আর পূর্ণ আস্থা রাখতে পারে নি। নেতার পার্শ্বচর হিসাবে তিনি খ্যাত হ'লেও, লেনিনের যথার্থ মতবাদ হৃদয়ঙ্গম করে' প্রচার ট্রট্স্কি করেন নি—সে কাজ স্টালিনের। স্টালিন্ বিপ্লবের বহু পূর্ব্ব থেকে রাশিয়ায় দলের গুপ্ত প্রচার কার্য্যে জীবন সংশয় করে' পরিশ্রম করেছিলেন। বিপ্লবের পর তিনি নির্দ্দিষ্ট কাজ যোগ্যতার সঙ্গেই সম্পন্ন করতেন। বক্তৃতা ও লেখায় লেনিনের মতবাদ তিনিই পরিস্ফুট করেন। দলের কর্ম্মসচিব হিসাবে তিনি কমিউনিস্ট্দের শ্রদ্ধা ও প্রীতি আকর্ষণ করতে পেরেছিলেন।

লেনিনের মৃত্যুর সময় রাশিয়াতে নেপের আমল চল্ছিল। ট্রট্স্কি তার প্রকৃত রূপ বুঝতে না পেরে আপত্তি ও গণ্ডগোল আরম্ভ করলেন, নেপ্ আরম্ভ হবার এত পরে তাঁর এই অভিযান নূতন নেতাদের বিব্রত করবারই উপায় মনে হয়। বহির্জগতের অভিমত প্রতিধ্বনিত করে' ট্রট্স্কি এখন বল্লেন যে রাশিয়ায় বিপ্লবের আদর্শ ক্ষুণ্ণ হচ্ছে, ফরাসী-বিপ্লবে যেমন রোব্স্পিয়ারের মৃত্যুর পর থার্মিডরের প্রতিক্রিয়া এসেছিল এখন তেমনই রুষদেশেও বিপ্লবীদল পশ্চাদ্গমন করছে। তখন দলের মধ্যে তুমুল তর্ক উঠ্ল ভবিষ্যৎ কর্ম্মপদ্ধতি নিয়ে। ট্রট্স্কির মতে, শুধু একদেশে অর্থাৎ রাশিয়ায় নূতন-সমাজ গঠনের চেষ্টা পণ্ডশ্রম মাত্র, তার আগে পৃথিবীর নানা দেশে শ্রমিক-বিপ্লব সঙ্ঘটিত হওয়া প্রয়োজন। বিপ্লবকে

আগুনের মতন দেশ থেকে দেশান্তরে না নিয়ে যেতে পারলে সব ব্যর্থ হবে। শ্রমিক-বিপ্লব জগদ্ব্যাপী করা প্রথমেই আবশ্যক, তাই প্রধান কাজ হ'ল কমিন্‌টার্নের সাহায্যে এখনই সর্ব্বত্র বিপ্লব আনয়নের চেষ্টা। ট্রট্‌স্কির মতবাদে তাঁর অবাস্তবতা সুন্দরভাবে ফুটে ওঠে—মার্ক্স্‌তত্ত্বের জটিলতা আয়ত্ত না করে' তিনি তাকে মন্ত্রের রূপ দিতে এবং বিপ্লবপ্রচেষ্টাকে ছেলেখেলায় পরিণত করতে চাচ্ছিলেন। স্টালিনের মতে, সাম্যবাদীদের কর্ত্তব্য সর্ব্বদা পারিপার্শ্বিক অবস্থার বিচার। লেনিন্‌ও চিরদিন লক্ষ্য অবিচলিত রেখে স্থানকাল অনুসারে কর্ম্মপদ্ধতি পরিবর্ত্তিত করতেন। অধীর অবাস্তব আস্ফালনকে তিনি এক বিখ্যাত পুস্তিকায় শৈশবসুলভ ব্যাধি নাম দিয়েছিলেন। এরও বহু আগে স্বয়ং মার্ক্স্‌ ব্লাঙ্কির নির্ব্বিচার বিপ্লবোচ্ছ্বাস ও স্টার্ণার্‌-এর উগ্রপন্থার নিন্দা করেন। স্টালিনের মতে, দেশে নিশ্চেষ্টতা ও বিদেশে অযথা শক্তিক্ষয়ের মধ্য দিয়ে ট্রট্‌স্কির নীতি নামে চরমপন্থা হ'লেও কাজে পশ্চাদ্‌গমনে পর্য্যবসিত হবে। ১৯২৪এ স্পষ্টই দেখা যাচ্ছিল যে ধনতন্ত্র অনেকখানি টাল সামলেছে। এ-অবস্থায় রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ সংগঠনই দলের প্রধান কর্ত্তব্য। লেনিন্‌ নিজেই তার পথপ্রদর্শন করেছিলেন। রাশিয়ার মতন এক দেশেও নূতন-সমাজের প্রথম অবস্থায় পৌঁছানো সম্ভব—তার মূলসূত্র হচ্ছে যে প্রত্যেককে শ্রম করতে হবে এবং প্রত্যেকে শুধু শ্রমের উপযুক্ত মূল্যই পাবে। এই প্রথম অবস্থাকে সোশ্যালিজ্‌ম্‌ বা সমাজতন্ত্র নাম দেওয়া যায়। পূর্ণ সমানাধিকার অথবা কমিউনিজ্‌ম্‌ এর পরের অবস্থা —আর সে-অবস্থায় পৌঁছতে গেলে সম্ভবতঃ বিপ্লবের

সর্ব্বদেশে প্রসার প্রয়োজন। শ্রমিক-কর্ত্তৃত্ব জগদ্ব্যাপী হ'লেই নূতন শ্রেণীবিহীন সমাজের পূর্ণগঠন সম্ভব আর তখনই এঙ্গেল্সের প্রতিশ্রুত, স্টেটের নিষ্পেষক যন্ত্রের সম্পূর্ণ লোপ, আসতে পারবে। এই দ্বিতীয় অবস্থাকেই সাম্যতন্ত্র নাম দেওয়া হ'ল—এর মূলসূত্র হবে যে প্রত্যেকে শক্তি অনুসারে শ্রম করবে বটে, কিন্তু সমাজের কল্যাণে সে পাবে তার যা কিছু প্রয়োজন সমস্তই।

১৯২৬এ জিনোভিয়েভ্ ও কামেনেভ্ হঠাৎ পূর্ব্ববৈরী ট্রট্স্কির দলে যোগ দিলেন, অবশ্য এঁদের দুজনের মতিস্থির-তার অভাব বল্শেভিক্দের পূর্ব্ব ইতিহাসেও লক্ষ্য করা যায়। ১৯২৭এ বিস্তর আলোচনার পর কমিউনিস্ট্-দল স্টালিনের মতই গ্রহণ করল—আর সেই সময় ট্রট্স্কি, জিনোভিয়েভ্, কামেনেভ্, রাডেক্, রাকভ্স্কি বিরুদ্ধাচরণের জন্য দল থেকে বহিষ্কৃত হলেন। পরে অন্য সকলে ভুল স্বীকার করে' দলে ফিরে আসেন, কিন্তু ট্রট্স্কি নিজ মতে অবিচলিত থাকায়, তাঁর নির্ব্বাসন হয় (১৯২৯)। ১৯৩১এ দার্শনিক বিচারের ক্ষেত্রেও এর অনুরূপ সঙ্ঘর্ষ দেখা দিল। ডেবোরিন্, কারেভ্ প্রভৃতি দার্শনিকদের বিরুদ্ধে মিটিন্ ইত্যাদি তখন অভিযোগ আনেন যে তাঁরা চিন্তার রাজ্যে আদর্শবাদের দিকে ঝুঁক্ছেন। ট্রট্স্কির মতন ডেবোরিন্ও তর্কযুদ্ধে পরাস্ত হ'লেন।

মার্ক্স্ ও লেনিনের সময় সাম্যবাদকে দুই দিক থেকে বিকৃতির ঝোঁক সামলাতে হয়েছিল। এখনও ট্রট্স্কির পরাজয়ের সঙ্গে সঙ্গেই উল্টোদিকের চরমপন্থাকেও স্টালিন্ বর্জ্জন করেন। ১৯২৮এ বুকারিন্, টম্স্কি, রাইকভ্ প্রভৃতি নেতারা স্টালিনের নীতিকে অতিমাত্রায় দুঃসাহসিক মনে

করলেন। ট্রট্স্কির অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত, কিন্তু উভয়ক্ষেত্রেই বিপদ ছিল মার্ক্স্‌বাদের বিকৃতি। এবারও সাম্যবাদী-দল স্টালিন্‌কে সমর্থন করে। এই বাদানুবাদের সময়ই সুবিখ্যাত পঞ্চবার্ষিক-সংকল্পের আরম্ভ। ১৯২৮-এর পর থেকে রাশিয়া পর পর তিনটি পঞ্চবার্ষিক-সংকল্পের সাহায্যে দেশের মধ্যে নূতন-সমাজের প্রথম স্তর, অর্থাৎ সোশ্যালিজ্‌ম্‌, গড়ে' তুলবার উদ্যোগী হয়েছে।

১৯২৮-এর নবপদ্ধতির দুটি বৈশিষ্ট্য ছিল। প্রথম লক্ষ্য, যন্ত্রশিল্পের প্রভূত প্রসার, রাশিয়াকে এখন আমেরিকা বা জার্মানির মতন যন্ত্রপ্রধান দেশের পর্য্যায়ে উন্নীত করেছে। আজকের দিনের সোভিয়েট্‌-রাষ্ট্রের লোহা, ইস্পাত বা কেমিকালের কারখানা, কয়লার খনি কিম্বা বৈদ্যুতিক শক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা বিস্ময়ের বস্তু। আরও আশ্চর্য্য এই যে এত বৃহদায়তন যন্ত্রশিল্পের অভ্যুত্থান এদেশে আসলে জনসাধারণের সম্মিলিত চেষ্টার ফল—এর পিছনে স্বদেশী বা বিদেশী ধনিকের লাভের জন্য অর্থ নিয়োগের প্রাধান্য নেই। দ্বিতীয় লক্ষ্য, কৃষিকার্য্যে রাশিয়ার অনুন্নতির অপবাদ ঘোচানো। সমগ্র দেশ এতদিন লক্ষ লক্ষ কৃষকের খণ্ডসম্পত্তিতে বিভক্ত ছিল। বিপ্লবের পরও কৃষকদের জমির উপব অধিকার অটুট ছিল, এমন কি জমিদারদের জমিও তখন চাষীদের হাতে দেওয়া হ'ল কৃষকদের সহায়তালাভের জন্য। সামরিক-সাম্যতন্ত্রের যুগে কৃষকদের চেপে রাখার চেষ্টাটুকু নেপের আমলে বর্জ্জিত হয়, ফলে অবস্থাপন্ন কৃষক অথবা কুলাক্‌দের গ্রামে কিছুদিন যথেষ্ট সম্পদ ও শক্তিবৃদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু কুলাক্‌দের নীচে মধ্যবিত্ত কৃষক আর

তারও নীচে গরীব চাষীদের দুরবস্থা ও অসন্তোষ তখনও কমে নি। পঞ্চবার্ষিক-সংকল্পে এখন কুলাক্-শ্রেণীর উচ্ছেদের ব্যবস্থা হয়। দেশে স্টেট্-পরিচালিত কয়েক হাজার আদর্শ ফার্মের সৃষ্টি হ'ল, কিন্তু সব জমির হঠাৎ এভাবে সরকারী চাষ সম্ভব হয় নি। সুতরাং একত্রিক কৃষিকার্য্যের উদ্ভব হ'ল—অর্থাৎ স্থানীয় সব কৃষকদের জমি একত্র করে' চাষের ভার তাদেরই সম্মিলিত সমিতিদের হাতে দেওয়া হয়। একত্রিক চাষের সুবিধা সহজেই বোঝা যায়—সম্মিলিত কৃষিকার্য্যে যন্ত্রের সাহায্যে শ্রম-লাঘব চলে, স্বতন্ত্র চাষে যন্ত্রের বহুল ব্যবহার অসম্ভব। সরকারী চাষ ও একত্রিক কৃষিকার্য্য এইভাবে রাশিয়ার গ্রামে যুগান্তর আন্‌ল। এ-ব্যবস্থা সাম্যবাদের ইতিহাসে স্টালিনের এক প্রধান কীর্ত্তি হিসাবে স্থান পাবে। কৃষকেরা বরাবরই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় ও ভূমি সম্বন্ধে লোভী—সাধারণস্বত্বে বিশ্বাসী সোশ্যালিজ্‌মের বাধা হিসাবেই তাদের এতদিন দেখা হয়েছে। স্টালিনের নীতি মোটামুটি সফল হ'লেই সে-বাধা অপসারণের এক উপায় হবে।

নেপের আমলে রাশিয়ার বাইরে বিশ্বাস ছিল যে সেদেশে নূতন আর্থিক ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়বার উপক্রম হয়েছে। বিদেশী ধনিকদের লাভের জন্য টাকা খাটাবার সুযোগ কিন্তু নেপের সময়ও হয় নি। পঞ্চবার্ষিক-সংকল্পের সময়ও যন্ত্রনির্ম্মাণের টাকা আসতে লাগ্‌ল জনসাধারণ ও শ্রমিকদের আয় ও ব্যয়-সংকোচের মধ্যে। রাশিয়ায় তাই প্রচুর অভাব রইল, কিন্তু অভাবের ফলে শ্রমিক-অসন্তোষ প্রবল হ'য়ে ওঠে নি। তার কারণ অবশ্য সোভিয়েট্-রাষ্ট্র শ্রমিকদেরই নিজস্ব এই ধারণার অস্তিত্ব। সে-দেশের শ্রমিকেরা কষ্টস্বীকারে

প্রস্তুত আছে, যতদিন তাদের অভাবের ভিতর দিয়ে সঞ্চিত অর্থ অল্পসংখ্যক ধনিকের ভোগে না এসে দেশের উৎপাদিকা শক্তিবর্দ্ধনে নিয়োজিত থাকবে। অশেষ কষ্টের মধ্যে গোড়া-পত্তন এভাবে হবার পর দ্বিতীয় পঞ্চবার্ষিক-সংকল্প এল। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য, উৎপন্ন দ্রব্যের পরিমাণ বৃদ্ধি—আর তার মধ্যে যন্ত্র ইত্যাদি ছাড়াও নিত্যব্যবহার্য্য জিনিষের প্রাচুর্য্য এতদিনে স্থান পেল। ক্রমে রাশিয়াতে সাধারণ জীবনযাত্রা তাই স্বচ্ছলতর হ'য়ে এসেছে। বিদেশী পর্য্যটকেরা অনেকে সম্প্রতি এই পরিবর্ত্তনকে ধনতন্ত্রের প্রত্যাবর্ত্তন ভেবেছেন, কিন্তু রুষদেশে আর্থিক উৎপাদন-পদ্ধতিতে এ সিদ্ধান্তের অনুযায়ী পূর্ব্ব ব্যবস্থা অর্থাৎ ধনিক-কর্ত্তৃত্ব ফিরে আসার লক্ষণ দেখা যায় না। পণ্যোৎপাদন-প্রসার-চেষ্টার মধ্যে স্টাকানভ্-আন্দোলনের উল্লেখ করা উচিত। শ্রমিকদের মধ্যে কর্ম্মকুশলতা ও শ্রমশীলতার উৎসাহবিধান এর বৈশিষ্ট্য। সে-উৎসাহ প্রকাশ্য সম্মানের মধ্য দিয়েই বেশী আসে, তবে নির্দ্দিষ্ট কাজে কৃতিত্ব ও দক্ষতার জন্য আর্থিক পুরস্কারের ব্যবস্থাও হয়েছে। কিন্তু মার্ক্স্ নিজেই দেখিয়েছিলেন যে মাহিনার অসমতা আর ধনতন্ত্র এক কথা নয়। স্বতন্ত্র ধনিকশ্রেণীর অস্তিত্ব, তাদের উদ্বৃত্ত অর্থের লাভের জন্য খাটাবার সুবিধা, পণ্যোৎপাদনে ধনিকদের প্রভুত্ব, আর্থিক মূলধনের জন্য তাদের উপর নির্ভর—এইগুলি সব রুষদেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্য্যন্ত তাই বিপ্লবের আমলের অবসান হবে না।

নূতন রাশিয়ার বর্ণনা এখানে অসম্ভব। ওয়েব্-দম্পতির বিখ্যাত গ্রন্থে তার অনেক পরিচয় এখন সহজেই পাওয়া

যায়। কিন্তু কেবলমাত্র মূলনীতি ও বৈশিষ্ট্যের উল্লেখই স্বল্প-কলেবর আখ্যানে স্থান পেতে পারে। আর্থিক ব্যবস্থায় দেশব্যাপী প্ল্যানিং সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে—কিন্তু পৃথিবীর অন্যত্র এর যত অনুকরণ প্রস্তাবিত হয়েছে তার সঙ্গে এ-উদ্যমের মূলগত পার্থক্য হচ্ছে এই যে, এর পিছনে একটা বিশিষ্ট মতবাদের সাধনা রয়েছে যার সঙ্গে এ-সংকল্পের অঙ্গাঙ্গী যোগ। রাষ্ট্রিক ব্যাপারে প্রথমে শ্রমিকদের প্রতিভূ সাম্যবাদী-দলের অধিনায়কত্ব ছিল; বিরোধীদের যথেচ্ছ আচরণের স্বাধীনতা লোপ হয়েছিল, স্বীকার করতেই হবে। ১৯৩৬-এর নূতন শাসনপদ্ধতিতে কিন্তু গণতান্ত্রিক উদার-নীতি অনেক খানি ফিরে এসেছে শোনা যায়। সাম্যবাদের থিওরি এই যে বস্তুতঃ ধনিকশ্রেণীর উচ্ছেদসাধনের পরই কোনও দেশে উদার-নীতি প্রথম সার্থক হ'তে পারে, আর রাশিয়ায় সে-অবস্থা আগতপ্রায়। শিক্ষার ক্ষেত্রে নিরক্ষরতা দূর রাশিয়ার মত দেশে এক বিপুল কীর্ত্তি। রাষ্ট্রশক্তি তাদের নিজস্ব, এই বিশ্বাস শ্রমিক ও কৃষকদের মনে বিরাজ করছে। তাদের আর্থিক সুবিধাবিধান রুষ-স্টেটের এক প্রধান কর্ত্তব্য। সংস্কৃতির ক্ষেত্রে বিভিন্ন জাতির বৈশিষ্ট্য সাদরে রক্ষিত হচ্ছে—এদের পরস্পরের সদ্ভাব স্টালিনের আমলের আর একটি কীর্ত্তি।

কিন্তু বিরোধের অবসান এত সহজে হয় না। ট্রট্স্কির পরাজয়ের পরও তাঁর মতবাদ অসংখ্য লোকের মনে সন্দেহের কারণ হ'য়ে রইল। স্টালিনের মূল বিশ্বাসে ভুল থাকলে দেশও ভুল পথে চল্‌ছে বলতে হবে। আর্থিক উন্নতিকে অভ্যর্থনা করে' স্টালিন্ বলেছিলেন যে রাশিয়ায় এতদিনের

পরিশ্রমের পর জীবনে আনন্দ ফিরে আস্ছে। ট্রট্স্কির চোখে দেখলে সে-আনন্দ বিপ্লব-অবসানের মুখোস নয় ত? ১৯৩৩-এর পর বহির্জগতে পরিবর্ত্তনের ফলে সমস্যা উপস্থিত হ'ল। জার্ম্মানি বা জাপানের হাত থেকে আত্মরক্ষার উপায় উদ্ভাবনে স্টালিন্ যখন ব্যস্ত, তখন অনেক পূর্ব্বতন নেতা আবার ট্রট্স্কি-পন্থার দিকে গোপনে ঝুঁকলেন। তাঁদের ব্যবহারে পরস্পরবিরোধী আচরণ শুধু তাঁদের থিওরির দুর্ব্বলতাই প্রমাণ করে। কেউ কেউ ভাবলেন জার্ম্মানি ও জাপানকে কিছু রাজ্য ছেড়ে দিলেই গোল চুক্বে। অন্যদের মনে হ'ল এই সুযোগে ফাশিস্ট্দের সাহায্যে স্টালিন্কে ধ্বংস করা সম্ভব। কারো মতে যুদ্ধ এলে ভালই—তাতে বিপ্লবেরই সুবিধা। অন্যরা ক্রমাগতঃ বিদেশে গণ্ডগোল সৃষ্টির পক্ষপাতি ছিলেন। দু'টি বৈশিষ্ট্য এঁদের আচরণে ধরা পড়ে—ফাশিস্ট্-বিপদকে সামান্য জ্ঞানে তুচ্ছ করা এবং স্টালিনের পতনের জন্য ষড়যন্ত্র। গুপ্ত অভিসন্ধি প্রকাশ পাওয়াতে রাশিয়ায় এই ষড়যন্ত্রকারীদের বিচার ও দণ্ড-বিধান সম্প্রতি সমস্ত জগতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

১৯৩৪-এর ডিসেম্বরে অন্যতম সাম্যবাদী-নেতা কিরভ নিহত হ'লেন। তারপর স্টালিনের প্রাণনাশের চেষ্টা হয়, তাঁর প্রধান সহকর্ম্মীদের বিরুদ্ধেও ষড়যন্ত্র হয়েছিল। তাছাড়া দেশে নানা গণ্ডগোল সৃষ্টির প্রয়াসও দেখা গেল। মস্কোর বিচারে দণ্ডিত অপরাধীদের বিরুদ্ধে অভিযোগগুলির অধিকাংশই যে সাজানো নয়, বিচারের সম্পূর্ণ প্রতিলেখন-পাঠে এই ধারণাই বদ্ধমূল হয়। দণ্ডিত নেতারা অনেকে প্রায় গত দশবছর ধরে' সাম্যবাদী-দলের

নির্দ্দিষ্ট আচরণে সন্দেহ পোষণ করে' এসেছেন। তাঁরাই খাঁটি প্রাচীন বল্‌শেভিক্, এ-কথা প্রচলিত হ'লেও অমূলক। স্টালিনের প্রধান সমর্থক—কাগানোভিচ, ভোরোশিলভ, মোলোটভ্, লিট্‌ভিনভ্ প্রভৃতি সকলেই দলের বহুপুরাতন সভ্য। দণ্ডিত নেতারা কেউ কেউ লেনিনের সময়ও ভুল নীতির অনুসরণ করেন—লেনিনের সময় তাঁরা উচ্চপদে থাকলেও ট্রট্স্কি-স্টালিনের দ্বন্দ্বে তাঁরা স্টালিনের নেতৃত্বে অনেকটা সন্দিগ্ধ হ'য়ে পড়েছিলেন। ষড়যন্ত্রকারীদের তাই সাধারণ ভাবে ট্রট্স্কি-পন্থী বল্‌লে অন্যায় হবে না, তাঁদের পরস্পরবিরোধ সে-পন্থারই দৌর্ব্বল্যের পরিচায়ক। মতের কথা ছেড়ে দিলেও ষড়যন্ত্রের অভিযোগগুলি যে সম্ভবতঃ সত্য সে-সম্বন্ধে ক্রমশঃই জনমত প্রবল হচ্ছে।

মস্কোতে সম্প্রতি চারটি বড় বিচার হ'য়ে গিয়েছে। দণ্ডিত ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন—জিনোভিয়েভ্ ও কামেনেভ্ (অগাস্ট্, ১৯৩৬); রাডেক্, সকল্‌নিকভ্ ও পিয়াটোকভ্ (জানুয়ারি, ১৯৩৭); মার্শাল্ তুকাচেভ্‌স্কি ও অন্যান্য কয়েকজন সেনাপতি (জুন্, ১৯৩৭); বুকারিন্, য়াগোডা ও রাকভ্‌স্কি (মার্চ্চ্, ১৯৩৮)। রাডেক্ ও তুকাচেভ্‌স্কি ব্যতীত এঁদের প্রভাব বহুদিন আগেই রাশিয়াতে প্রায় ম্লান হ'য়ে এসেছিল। দেশের মধ্যে স্টালিনের সমর্থক যে অজস্র, সে-কথা ভোলাও উচিত না। অভিযুক্তেরা বিখ্যাত ও অভিযোগ অপ্রত্যাশিত হ'লেও, এক্ষেত্রে রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও ষড়যন্ত্রের অস্তিত্ব মেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত মনে হয়। উৎপীড়ন বা প্রলোভনের সাহায্যে যে বন্দীদের কাছ থেকে দোষস্বীকার আদায় করা হয়েছিল, এর কোন প্রমাণই নেই।

দোষস্বীকার অনিবার্য্য হ'য়ে পড়েছিল প্রমাণের প্রাচুর্য্যে, একথাই বরং বেশী বিশ্বাসযোগ্য।

পঞ্চবার্ষিক-সংকল্পের সাফল্য অপ্রত্যাশিত হওয়াতে রব উঠেছিল যে স্টেট্-কর্ত্তৃত্ব ও শ্রমিকদের দাসত্বের জন্যই এ-সংকল্প ব্যর্থ হয় নি। প্রচলিত অর্থনীতি কিন্তু বহুদিন বলে' এসেছে যে রাষ্ট্রশক্তি কখনও আর্থিক কর্ত্তৃত্ব সুচারুভাবে করতে পারে না এবং দাস-শ্রমে উৎপাদন কার্য্য ভাল চলে না। জগদ্ব্যাপী আর্থিক সঙ্কট রাশিয়াকে বিশেষ বিচলিত করল না, এটাও বিস্ময়ের কারণ। কিন্তু সোভিয়েট্-ইউনিয়ানের অগ্রগতি অবাধ বা নিরঙ্কুশ হয় নি। এর ভবিষ্যৎ আকাশ এখনও মেঘাচ্ছন্ন। যুদ্ধে পরাজয় হয়ত রাশিয়ার সকল প্রচেষ্টা একদিন ব্যর্থ করবে আর তখন সাম্যবাদীদের আবার প্রথম থেকে নূতন-সমাজ গঠনের পরিশ্রমে প্রবৃত্ত হ'তে হবে। ১৯৩৩এ হিট্‌লারের অভ্যুদয় এই বিপদের সূচনা করল। দুই প্রবল প্রতিপক্ষ—জার্মানি ও জাপান—রাশিয়ার দুই দিকে অবস্থান করছে। উভয়েই ফাশিস্ট্ ও সাম্যবাদের ঘোর শত্রু। উভয়েই সাম্রাজ্যবাদের অন্তর্নিহিত তাড়নায় প্রসারোন্মুখ। এরা পরিণামে রাশিয়াকে বিধ্বস্ত করতে পারবে কি না, আমাদের সমসাময়িক কালের প্রধান প্রশ্ন হ'য়ে দাঁড়িয়েছে এই সমস্যা। ট্রট্স্কি হয় এ-বিপদ বোঝেন না, নয়ত সোভিয়েটের পতন তাঁর কাছে তুচ্ছ ব্যাপার। কিন্তু রাশিয়ার আত্মরক্ষা সারা পৃথিবীর শ্রমিক-শ্রেণীর কাছে এত সামান্য কথা হ'তে পারে না। মার্ক্স্-পন্থা থেকে ট্রট্স্কির বিচ্যুতির এই হ'ল প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

লেনিনের আমলেও রাশিয়া আন্তর্জ্জাতিক শান্তিপ্রয়াসী

ছিল। তারপর অস্ত্রত্যাগের জল্পনার সময়ও রুষ-রাষ্ট্রের চেষ্টা ছিল সেইদিকেই। ১৯৩৩এ নাৎসি-বিপ্লবের পর শান্তি-সংরক্ষণ সোভিয়েট্ বৈদেশিক-নীতির মূলকথা হ'ল আত্মরক্ষার খাতিরেও। লিট্ভিনভ্ ১৯৩৪এ বৃথাই প্রস্তাব করলেন যে অস্ত্রত্যাগের আন্তর্জ্জাতিক-বৈঠককে শান্তিরক্ষক সভারূপে পুনর্গঠিত করে' আক্রান্ত যে কোন দেশের তৎক্ষণাৎ সাহায্যের জন্য সকলে অঙ্গীকারাবদ্ধ হোক। ১৯৩৪এ রাশিয়া বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগ দেয়—আর ১৯৩৫এ ফ্রান্স্ ও রাশিয়া অযথা আক্রান্ত হ'লে পরস্পরের সাহায্যের প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হ'ল। এই চুক্তিতে যোগ দেবার প্রস্তাব জার্মানি কিন্তু অস্বীকার করেছে। ফ্রান্স্ ও রাশিয়া উভয়েই চেকোস্লোভা-কিয়াকে রক্ষা করবার কথা দিয়েছে এবং সেইজন্যই হিট্লার্ এ-দেশ অধিকার করতে ইতস্ততঃ করছেন। অন্যদিকে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ বিকল হ'য়ে পড়াতে, সোভিয়েট্-রাশিয়াকে স্পেন্ ও চীনে ফাশিস্ট্-প্রগতি আটকাবার জন্য সাহায্য পাঠাতে হয়েছে। জগদ্ব্যাপী ফাশিস্ট্-বিরোধী আন্দোলন গড়ে' তোলাই এখন সাম্যবাদীদের প্রধান লক্ষ্য। ফাশিজ্‌মের অগ্রগতি আটকাতে পারলে অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের ফলে তার পতন হবে, এই বিশ্বাস সাম্যবাদের মজ্জাগত। পৃথিবীর সকল দেশের সাম্যবাদীদের উপস্থিত কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হ'ল ১৯৩৫এ কমিন্টার্নের অধিবেশনে। এই সভায় ডিমিট্রভ্ ইউনাইটেড্ ফ্রণ্ট্ অথবা একত্রীভূত দলসমষ্টির আদর্শ প্রচার করলেন। ইকনমিক্ প্ল্যানিং-এর মতন একথাটিও আজ সর্ব্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে অথচ এর প্রকৃত স্বরূপ সর্ব্বদা মনে রাখা হয় না। সম্মিলিত

গণশক্তি গঠনের একমাত্র উদ্দেশ্য ফাশিজ্‌মের প্রতিরোধ; ফাশিস্ট্-আমলের চাইতে উদার-গণতন্ত্রেও শ্রমিকদের সুবিধা এইজন্যই গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা রক্ষার চেষ্টা এই কর্ম্মপদ্ধতিতে স্থান পায়। শ্রমিকদের মধ্যে গৃহবিবাদ-বর্জ্জনই সাধারণ শত্রুকে আটকাবার উপস্থিত উপায়; তাই সোশ্যাল্-ডেমক্রাট্‌দের সঙ্গে অযথা কলহের অবসান এখন বিধেয়, কিন্তু তাই বলে' সাম্যবাদী-দলের পৃথক অস্তিত্বের প্রয়োজনীয়তা অথবা তাদের বিশিষ্ট মতবাদের সংরক্ষণ এই নূতন পদ্ধতিতে কোথাও অস্বীকৃত হয় নি। সাময়িক কারণে এমন কি উদারমতবাদীদের সঙ্গেও এখন সহযোগীতা আবশ্যক ও সম্ভব, এই বিশ্বাসও ইউনাইটেড্ ফ্রণ্টের উদ্ভাবনার অন্যতম কারণ। ফ্রান্সে, স্পেনে ও চীনদেশে পপুলার্ ফ্রণ্ট্ গঠন নূতন পদ্ধতির সাফল্যের প্রধান নিদর্শন।

১৭

সমরোন্মুখ ইউরোপ

ইতিহাসে মূলসূত্রের সন্ধান মানে বৈচিত্র্যকে অস্বীকার নয়। কিন্তু সমগ্রের একটা রূপ চোখের সামনে না থাকলে কোনও ঐতিহাসিক বিবরণ সম্ভব হয় না, অসংখ্য ঘটনার মধ্যে নির্ব্বাচন করতে গেলেই একটা দৃষ্টি-ভঙ্গী এসে পড়ে। স্বল্পাকার আখ্যায়িকায় আবার সেই মূলবস্তুর আলোচনাই সমস্ত স্থানটুকু জুড়ে থাকে। ইউরোপের সাম্প্রতিক ইতিহাসে নানা ঘটনার আবর্ত্তকে ছাপিয়ে উঠেছে দু'টি মূল ধারা এবং তাদের মধ্যেও সংযোগ রয়েছে; প্রথমটির থেকেই দ্বিতীয়ের উদ্ভব। ধনতন্ত্রের পরিণতি গত ষাট বছরের ইতিবৃত্তের প্রধান বৈশিষ্ট্য। যন্ত্রশিল্পের বিপ্লবাত্মক প্রসার গত শতকে ধনিক-প্রভুত্বের স্বর্ণযুগ এনেছিল, কিন্তু অন্তর্নিহিত ঝোঁকের আবেগে তারপর এল সাম্রাজ্যতন্ত্রের দ্বন্দ্ব আর সেই সঙ্ঘর্ষের ফল গত মহাযুদ্ধে রূপ নিল। সাম্রাজ্যবাদের বহির্মুখীন প্রসার-প্রবৃত্তিই তারপর শ্রমিকবিপ্লবের আশঙ্কা-দমনরূপ আভ্যন্তরীণ-নীতির সঙ্গে মিলিত হ'য়ে আধুনিক ফাশিজ্‌মের সৃষ্টি করেছে। যুদ্ধান্তের দ্বিতীয় ধারার উদ্ভব শ্রমিক-অসন্তোষ ও মার্ক্স্‌বাদের মিলনে; সে-ধারা আবার সোভিয়েট্-ইউনিয়ানে রূপ নিয়েছে। সাম্রাজ্যতন্ত্রের ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্যে শ্রেণীবর্জ্জিত নূতন সমাজ-গঠনের ভিত্তি-স্থাপন তার মূল কথা।

মূলধারার বিশ্লেষণ ঐতিহাসিকের প্রধান কাজ হ'লেও, নৈতিক বিচার অথবা মূল্য নির্দ্ধারণের বেলায় আমরা সাধারণতঃ অন্যের শরণাপন্ন হই। সুতরাং ইতিহাসের গণ্ডির মধ্যে মূল্য-বিচারের বিশেষ কোন স্থান নেই। ধনতন্ত্রের ক্ষয়োন্মুখ অবস্থা উল্লাসের কথা না আশঙ্কার কারণ, সমাজতন্ত্রের সম্ভাবনা মঙ্গলজনক না অমঙ্গলের আকর, শ্রেণীবিহীন সমাজ পরিণামে বাঞ্ছনীয় কি না—এ সকল প্রশ্ন হয়ত ইতিহাস-লেখকের এলাকার বাইরে। কিন্তু সাম্প্রতিক ইউরোপে মূল সমস্যার একটি অঙ্গ সম্বন্ধে নির্ব্বিকার থাকা অসম্ভব, কারণ ইতিহাস- চর্চ্চাও বর্ত্তমানকে উপেক্ষা করতে পারে না। সে-ভাবনা অবশ্য মহাযুদ্ধের পুনরাগমনের ভয়। এ-সম্বন্ধে নির্লিপ্ত নিরপেক্ষ ভাব অসম্ভব, আজকের দিনে শিল্পী ও সাহিত্যিক সম্প্রদায়ও তাই এর বিভীষিকায় ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছেন। তার কারণ স্পষ্টই প্রতীয়মান—আজকালকার যুদ্ধ মানে শত সহস্র নিরপরাধ লোকের প্রাণনাশ, এমন কি এতে সভ্যতার প্রদীপ নির্ব্বাপিত হওয়াও বিচিত্র নয়। মহাযুদ্ধের বৈনাশিক রূপ তাই বিপ্লবের চাইতেও ভয়াবহ।

যুদ্ধ প্রাকৃতিক নিয়ম মাত্র এ-কথা বলার বিশেষ সার্থকতা নেই—সহযোগ ও বাঁচার ইচ্ছা প্রবলতর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। ব্যক্তি বা জাতিবিশেষের চাইতে সমস্ত সমাজের আর্থিক ও রাষ্ট্রিক ব্যবস্থার উপর যুদ্ধের জন্য বেশী দায়িত্ব আরোপ করাই সঙ্গত। কিন্তু এ-কথাও অস্বীকার করা যায় না যে কিছুদিন থেকে সারা জগতকে যুদ্ধের দিকে টান্‌ছে তিনটি প্রবল মহাশক্তির প্রসার-স্পৃহা। জার্মানি

দক্ষিণ ও পূর্ব্ব-ইউরোপে, ইটালি ভূমধ্য ও লোহিত-সাগরে এবং জাপান চীন-অঞ্চলে প্রভুত্ব স্থাপনে এখন উদ্যত। চাপের ফলে ব্রিটিশ্ ও ফরাসী-সাম্রাজ্য বিপন্ন হ'তে বাধ্য ; কারণ উভয়ের হাতেই এমন বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড রয়েছে যার উপর প্রতিদ্বন্দ্বীদের লোভ থাকা আশ্চর্য্য নয়। শেষোক্ত কারণে এবং পৃথিবীর একমাত্র শ্রমিকরাষ্ট্রের উচ্ছেদসাধন-আশায় সোভিয়েট্-ইউনিয়ানের বিরুদ্ধে ফাশিস্ট্-রাজ্যগুলির অভিযানও স্বাভাবিক। তাই ঠিক আজকের দিনে শান্তি-ভঙ্গের হেতু ফাশিস্ট্-নীতি। দেশে দেশে ফাশিস্ট্-প্রবৃত্তির জাগরণ ও প্রাবল্য শান্তিপ্রিয় সকল লোকের ভীতির কারণ। পোল্যাণ্ডে পিল্‌সুড্‌স্কির শিষ্যস্থানীয় সেনানীরা জার্মানির সাহায্যে প্রতিবেশীদের নিগ্রহ করবার স্বপ্ন দেখ্‌ছেন। রোমানিয়ায় ফাশিস্ট্-ভাবাপন্ন আয়রণ্‌গার্ড্-দল সম্প্রতি পরাভূত হ'লেও দেশের মধ্যে তাদের প্রচুর সমর্থক রয়েছে। রাজা আলেক্‌জাণ্ডার্ নিহত হ'বার পর থেকে, যুগোস্লাভিয়া ফ্রান্সের চাইতে জার্মানির দিকেই বেশী ঝুঁক্‌ছে। হাঙ্গারি বহুকাল ধরে' ত্রিয়াননের সন্ধির সংস্কার দাবী করে' এসেছে, কাজেই ইউরোপে গণ্ডগোল উপস্থিত হ'লে তার সুবিধারই কথা। হিট্‌লারের কর্ত্তৃত্ব-প্রসারের সুযোগ এইভাবে বেড়েই চলেছে। অস্ট্রিয়া-অধিকারের পর চেকোস্লোভাকিয়ার উপর চাপ পড়ছে—ফ্রান্স্ ও রাশিয়া চেক্‌দের সাহায্য করতে প্রতিশ্রুত বলে' এই উপলক্ষ্যে মহাসংগ্রাম আরম্ভ হ'তে পারে। সুদেৎবাসী জার্মান্‌দের স্বরাজ পাবার আকাঙ্খা থাকতে পারে, কিন্তু পৃথিবীতে তেমন দাবীর অন্ত নেই, সুতরাং যুদ্ধ এলে তার প্রকৃত কারণ কখনই এ-জাতীয় দাবী

নয়, এ একটা উপলক্ষ্য মাত্র। সুদেতীয় জার্মান্‌দের অধিকার রক্ষার জন্য চেক্‌জাতির স্বাধীনতা লোপ যুক্তি হিসাবে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য। হিট্‌লারের চোখে চেক্‌দের প্রধান অপরাধ অবশ্য ফরাসী ও রুষদের সঙ্গে সদ্ভাব। মাসারিক্‌-প্রতিষ্ঠিত বেনীশ্‌-অধিষ্ঠিত চেক্‌-রাজ্যের আর্থিক সম্পদের দিকেও জার্মান্‌দের নজর আছে। ওদিকে ইটালি ফ্রাঙ্কোর সাহায্যে স্পেন্‌কে করায়ত্ত করতে চায়। জাপান চীনবিজয়ে বদ্ধ-পরিকর হয়েছে। পর্টুগাল্‌ ও বেল্‌জিয়ামেও ফাশিস্ট্‌-প্রতিপত্তি বেড়েছে আর জার্মানির দৃষ্টি পশ্চিমে পড়লে হল্যাণ্ড্‌ বা সুইট্‌জার্‌ল্যাণ্ডের মত ক্ষুদ্র রাজ্য তৎক্ষণাৎ বিপন্ন হ'য়ে পড়বে। ইউরোপ্‌কে ও সারাজগতকে তাই এখন সমরোন্মুখ আখ্যা দেওয়া খুবই স্বাভাবিক।

কথা উঠতে পারে যে ভের্সায়ির ব্যবস্থা সংশোধন করলেই ত' গোলযোগ দূর হয়। কিন্তু বস্তুতঃ সে-ব্যবস্থার কতটুকু এখনও কার্য্যকরী রয়েছে ? তার বন্ধনগুলি খসে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে জার্মানির যুদ্ধলিপ্সা কমছে না বাড়ছে ? ভের্সায়ির নির্দ্দিষ্ট সীমান্ত-নির্দ্ধারণের বেশী সংস্কার এখনও হয় নি বটে, কিন্তু সকলকে তৃপ্তি দিতে পারে এমন সীমা টানা কি সম্ভব ? কোন দেশ প্রবল হ'লেই তার দাবী বেশী ন্যায্য হয় না, সুতরাং ন্যায়ের দোহাই এখানে সম্পূর্ণ অসঙ্গত। ফাশিস্ট্‌ শক্তিগুলি বঞ্চিত, এ-কথার সার্থকতাও নেই। এ নিতান্ত আপেক্ষিক বিচার, আর প্রকৃতপক্ষে বৈদেশিক-নীতি নির্ভর করে আভ্যন্তরীণ আর্থিক গঠনের উপর। তা'ছাড়া এই কারণে প্রকৃত বঞ্চিত অনুন্নত দেশের উপর অত্যাচার কোন ক্রমেই সমর্থন করা যায় না। বঞ্চিত না বলে'

জার্মানি প্রভৃতিকে আজকাল অনেক সময় অতৃপ্ত বলা হয়। এর অর্থ এই যে কিঞ্চিৎ লাভেই অতৃপ্তিকে তৃপ্তিতে আনবার আশা আছে। কিন্তু সে-আশা কতটুকু? দেখা যায় শক্তি থাকলেই অতৃপ্তি বেড়ে চলে। মহাযুদ্ধের আগে ব্রিটেনের তৃপ্ত বলে' খ্যাতি ছিল, জয়লাভের পর তাতে ত' তার রাজ্যবিস্তারের কোন বাধা হয় নি। প্রসার-প্রবৃত্তি আর্থিক ব্যবস্থার প্রাণ হ'লে বিস্তারেরও সীমা থাকবে না। আসলে বিবাদ পৃথিবীকে ভাগ করা নিয়ে। ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কোন ভাগই স্বভাবতঃ সকল মহাশক্তিকে সমান সন্তুষ্টি দেবে না। সাম্রাজ্যগুলির পরস্পরের সম্বন্ধ এক অবস্থায় থাকতে পারে না, কোনও এক সাম্রাজ্য বেশীদিন অন্যদের দাবিয়ে রাখতেও পারবে না। আর্থিক তাড়নায় শক্তিশালী রাজ্য মাত্রই আবার সাম্রাজ্য হ'তে চায়, পোল্যাণ্ড্ পর্য্যন্ত এখন যেমন উপনিবেশ চাচ্ছে। এই জন্য মনে হ'তে পারে যে সংগ্রাম অনিবার্য্য, উদ্ধার পাবার কোনই উপায় নেই। কিন্তু আর্থিক ব্যবস্থার আমূল পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়ে সে-উদ্ধারের সন্ধানও আজকের দিনে অত্যন্ত স্বাভাবিক।

ভবিষ্যতের কথা বাদ দিলেও শান্তিরক্ষার চেষ্টা এখন অধিকাংশের পক্ষে আত্মরক্ষারই সামিল। কিন্তু তার উপযুক্ত উপায় কি? উপনিবেশের পুনর্বণ্টনে সকল সাম্রাজ্যকে তৃপ্ত করা যাবে না। ব্রিটিশ্ মন্ত্রী হোর্ প্রস্তাব করেছিলেন (১৯৩৫) যে অত্যাবশ্যক কাঁচামাল ক্রয়ের পূর্ণ স্বাধীনতা সকলকে দেওয়া হোক। সাম্রাজ্যবাদীরা কিন্তু ক্রয়বিক্রয়ের স্বাধীনতার চাইতে নূতন নূতন ভূখণ্ডের উপর পূর্ণকর্ত্তৃত্ব চায়

—আর্থিক শোষণের রূপ বহুধা ও বিচিত্র। একমাত্র ফাশিস্ট্-নীতির আমূল পরিবর্ত্তনেই তাই বর্ত্তমান সঙ্কট অবসান হ'তে পারে এবং তার অন্যতম উপায় সঙ্ঘবদ্ধভাবে তার হাত থেকে আত্মরক্ষার চেষ্টা। যুদ্ধান্তের সমবেত সহযোগের আদর্শ আজ ভেঙ্গে পড়লেও তার পুনর্গঠনের জন্য প্রবল জনমত উদ্দীপ্ত করা সম্ভব। এই উদ্যম এখন প্রকারান্তরে ইউনাইটেড্ ফ্রণ্টেরই কর্ম্মপদ্ধতি।

সোভিয়েট-রাশিয়ার আত্মরক্ষার শক্তি আজকে বৃদ্ধি পেলে একদিক থেকে ফাশিস্ট্-প্রগতি বাধা পাবে। সুতরাং রুষজনগণ স্টালিন্-পন্থায় অবিচলিত থাকলে পৃথিবীরই মঙ্গল। ফ্রান্সে ফাশিস্ট্-ঝোঁক প্রবলভাবে বিদ্যমান, ১৯৩৪এ ফরাসী-গণতন্ত্র নিতান্ত বিপন্ন হয়েছিল। সে-বিপদ থেকে দেশকে রক্ষা করে পপুলার্ ফ্রণ্ট্। কিন্তু ব্লুমের প্রধান-মন্ত্রীত্বের অবসানের পর ফাশিস্ট্ শক্তি ফ্রান্সে আবার মাথা তুল্ছে, সুতরাং এখানে সম্মিলিত গণশক্তির পুনরুত্থান প্রয়োজন। ব্রিটেনে মহা আড়ম্বরে সমরসজ্জা চলেছে, কারণ আবিসিনিয়ার ব্যাপারে দেখা গিয়েছিল যে ইংল্যাণ্ড্ যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত নয়। কিন্তু শুধু সমরসজ্জা কখনও শান্তি রাখতে পারে না। ব্রিটিশ্ বৈদেশিক-নীতি ইংরাজ সমালোচকদেরই বিদ্রূপের বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। চেকোস্লোভাকিয়া নিয়ে আজকের অশান্তি ইংরাজদের এ-রাজ্য রক্ষার একটা প্রতিশ্রুতি স্পষ্ট থাকলে কখনই এতদূর এগোতে পারত না। লোকার্নোর সময় থেকে ইংল্যাণ্ড্ সে-অঙ্গীকার সযত্নে এড়িয়ে চলেছে। ইংল্যাণ্ডে এখন একমাত্র প্রবল জনমত সৃষ্টিই সুবিধাবাদী বৈদেশিক-

নীতির পরিবর্ত্তন করতে পারে। আমেরিকায় আন্দোলনের লক্ষ্য হওয়া উচিত বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘে যোগদান, তাতেই যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থান্বেষী সাম্রাজ্যবাদ আংশিক ভাবে শৃঙ্খলাবদ্ধ হ'য়ে পড়বে। জনমত এসব দেশে প্রবল হ'য়ে উঠলে বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘের পুনর্গঠন সম্ভব হ'তে পারে—সম্মিলিতভাবে আত্মরক্ষার বন্দোবস্তই তার যথাযোগ্য ভিত্তি। সে-আত্মরক্ষা কার্য্যকরী হ'লে, ফাশিস্ট্ দেশগুলির আমূল আর্থিক সংস্কারও অপরিহার্য্য হ'য়ে পড়বে। প্রগতির পথে এখন এই প্রথম সোপান মনে হয়।

জুন্, ১৯৩৮

পরিশিষ্ট (১)

১৯৩৮-এর জুন্ থেকে ডিসেম্বর্ এই ছ'মাসের মধ্যে ইউরোপের রাষ্ট্রিক অবস্থানের চেহারা অনেকখানি বদ্‌লেছে বটে, কিন্তু সে-পরিবর্ত্তন কিছু অভিনব ব্যাপার নয়, সে-ঘটনামালা সাম্প্রতিক ইউরোপের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের এক নূতন প্রকাশমাত্র। বর্ত্তমান যুগের ক্রমবিকাশ স্বভাবতঃই নানা বিচিত্র রূপ নিতে পারে, কাজেই এক্ষেত্রে ঐতিহাসিকের প্রধান কর্ত্তব্য হচ্ছে মূলধারার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ এবং তার স্বরূপ উদ্ঘাটনের চেষ্টা। উপরের আখ্যায়িকায় তাই সেইদিকেই লক্ষ্য রাখা হয়েছে।

অস্ট্রিয়া-দখলের পর হিট্‌লার্ চেকোস্লোভাকিয়ার অঙ্গচ্ছেদে মনোনিবেশ করলেন। স্থদেৎ-প্রদেশে অবশ্য প্রায় ত্রিশ লক্ষ জার্মান্-ভাষী লোক আছে; তাদের স্থানীয় স্বায়ত্বশাসনের দাবী সত্যই প্রবল, এবং সে-অধিকার চেক্-রাষ্ট্রপতি বেনীশ্ পর্য্যন্ত মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু হিট্‌লার্ যখন এই জনসমূহকে চেক্-শাসন থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত করবার জন্য জার্মানিকে উত্তেজিত করতে লাগ্‌লেন, তখন নাৎসিদের চিরাচরিত পন্থানুসারে নানা অবান্তর কথা প্রকৃত অবস্থাকে আচ্ছন্ন করে' ফেল্‌ল।

হেন্‌লাইন্-এর নেতৃত্বে অকস্মাৎ যে-স্থদেতীয় আন্দোলন ইউরোপ্‌কে যুদ্ধের কিনারায় টেনে আন্‌ল, তার মূল দাবীর সমর্থকদেরও জানা উচিত যে অন্ততঃ সে-আন্দোলনের পদ্ধতিটুকু দোষাবহ হয়েছিল। স্বকর্ত্তৃত্বের দাবী পৃথিবীতে অসংখ্য সম্প্রদায়ের আছে, তাই নিয়ে যুদ্ধে নামতে হ'লে মঙ্গলের চেয়ে অমঙ্গলের সম্ভাবনাই অনেক বেশী। পিছনে যথেষ্ট সামরিক শক্তি থাকলেই কোন দাবী বেশী ন্যায্য হ'য়ে পড়ে না। তাছাড়া স্থদেতীয়দের মুক্ত করতে গিয়ে তাদের প্রতিবেশী চেক্‌দের পরাধীন করে' ফেলা সঙ্গত হ'লে মান্‌তে হয় যে স্বাধীনতা

শুধু জার্মান্ জাতির ভগবৎদত্ত অধিকার। অনেকেই জানেন না যে সুদেৎ-প্রদেশ কখনও জার্মানির অন্তর্গত ছিল না, ভৌগোলিক সীমা অনুসারে মধ্যযুগ থেকে এ-অঞ্চল বোহেমিয়া নামে এক স্বতন্ত্র দেশের অন্তর্গত। এখানকার জার্মান্ অধিবাসীরা আসলে স্বদেশের বাইরে এসে বহুকাল ধরে' বোহেমিয়ায় বসতি করেছে মাত্র। বস্তুতঃ যে-যুক্তিতে সুদেৎ-প্রদেশ জার্মানির অংশ বলে' দাবী করা হয়েছে, তদনুসারে রোমানিয়া, হাঙ্গারি, পোল্যাণ্ড্, বাল্টিক্-রাজ্যগুলি, ইটালি, সুইট্জার্ল্যাণ্ড্, বেল্জিয়াম্, হল্যাণ্ড্, ডেন্মার্ক্ প্রত্যেকেরই কোন কোন জেলা জার্মানির মধ্যে আসা উচিত। এ-সব দাবী গ্রাহ্য হ'লে সহস্র সহস্র বিদেশীও জার্মানির প্রজা হ'য়ে পড়বে এবং অন্য সকল জাতির অধিকার জার্মান্দের তুলনায় নিকৃষ্ট বলে' স্বীকার করতে হবে। আসলে আত্মকর্তৃত্বেরও একটা স্বাভাবিক সীমা আছে। প্রতি গ্রাম, নগর ও জনপদের আত্মকর্তৃত্ব স্বীকৃত হ'লে মধ্য-ইউরোপের মতন যেখানে নানা জাতির মিশ্র বসতি আছে, সেখানে রাষ্ট্রগঠন অসম্ভব হ'য়ে পড়ে।

একথা তাই সহজেই বোঝা যায় যে সুদেতীয়দের মুক্তিসাধন হিট্লারের উদ্দেশ্য ছিল না, জার্মান্-রাইশের শক্তিবৃদ্ধিই তাঁর প্রকৃত লক্ষ্য। নাৎসিরা আসলে চেয়েছিল চেক্-রাষ্ট্রকে রাশিয়ার দল থেকে পৃথক করা, সুদেৎ-প্রদেশ থেকে চার লক্ষ নূতন সৈন্য সংগ্রহ, বোহেমিয়ার আর্থিক সম্পদ করায়ত্ত করে' জার্মান্ ব্যবসাবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধি, এবং বিদেশস্থিত জার্মান্দের উদ্ধারের ফলে হিট্লারের প্রতিপত্তি বাড়ানো। আত্মকর্তৃত্বের প্রোপাগাণ্ডায় মুগ্ধ হ'য়ে ভুললে চলবে না যে মধ্য-ইউরোপে কর্তৃত্ববিস্তারই নাৎসিদের দৃঢ়সংকল্প। চেকোস্লোভাকিয়াকে পদানত করে' ফেলতে পারলে এদিককার খণ্ড রাজ্যগুলি আত্মরক্ষার খাতিরে জার্মানির ছায়াশ্রিত হ'য়ে পড়বে। এদের করায়ত্ত করলে নাৎসি-অভিযান রাশিয়ার প্রত্যন্তে পৌঁছবে, তারপর শস্যসম্পদশালী রুষ-প্রদেশ উক্রেন্ জার্মানির দখলে আসতে পারে। এইভাবে একদিক থেকে সোভিয়েট্-রাশিয়াকে বিপন্ন করা সম্ভব;

অন্যদিকে নাৎসি-কর্তৃত্ব বিস্তার জার্মানির মুহ্যমান আর্থিক অবস্থার ভার লাঘব করবে এবং দেশের আভ্যন্তরীণ অসন্তোষকে ঢেকে রাখবে বৈদেশিক-নীতির সাফল্য।

সুদেৎ-অভিযানের স্বরূপ এই হ'লে ফাসিস্ট্‌বিরোধী সকলেরই কর্তব্য ছিল সমবেত ভাবে এর গতিরোধ। প্রথমে কিছুদিন তার সম্ভাবনাও দেখা গেল। মনে হ'ল যে মুসোলীনি হিট্‌লারকে সমর্থন করলেও ইংল্যাণ্ড্, ফ্রান্স্‌ ও রাশিয়ার সম্মিলিত শক্তি চেক্‌দের রক্ষা করতে পারবে। শেষোক্ত দল দৃঢ় থাকলে শেষ পর্য্যন্ত হিট্‌লার্‌ যুদ্ধ করতে সাহস পেতেন কিনা সন্দেহ আছে। কিন্তু সেপ্টেম্বর্‌ মাসে (১৯৩৮) কিছুদিন মহাযুদ্ধ আসন্ন বোধ হ'লেও, সহসা মিউনিকের চুক্তিতে ইংল্যাণ্ড্‌ ও ফ্রান্স্‌ হিট্‌লারের সকল দাবী মেনে নিল।

ইংরাজ ও ফরাসী মন্ত্রী চেম্বার্‌লেন্‌ ও দালাদিয়ের এই আকস্মিক আত্মসমর্পণের স্বপক্ষে অনেক যুক্তির অবতারণা করা হয়েছে, কিন্তু তার প্রত্যেকটিই নিতান্ত দুর্ব্বল ও কষ্টকল্পিত। সমরসজ্জার অসম্পূর্ণতা হিট্‌লার্‌কে পথ ছেড়ে দেবার প্রধান কারণ নয়, কেননা সে-অভাব মেটাবার কোন চেষ্টা-ও ইংরাজ ও ফরাসী সরকার মিউনিকের আগে করেন নি। পক্ষান্তরে জার্মানি বা ইটালির পক্ষে দীর্ঘকাল যুদ্ধ চালানোর সুবিধা আছে কিনা সন্দেহের কথা। অসম্পূর্ণ অস্ত্রসজ্জা নিয়েও স্পেন্‌ ও চীনে জনসাধারণ যে-অসাধারণ বীরত্ব মাসের পর মাস দেখিয়েছে, ফাশিস্ট্‌দের গতিরোধে সেই উৎসাহের সাহায্য এক্ষেত্রেও পাওয়া যেত। অপর দিকে জার্মানির জনসাধারণ যুদ্ধের জন্য খুব ব্যগ্র ছিল মনে হয় না, ইটালিও সংগ্রামের জন্য বিশেষ কোন আয়োজন করে নি। সোভিয়েট্‌-রাশিয়া চেক্‌দের সাহায্য পাঠাতে উদ্যত ছিল না, একথাও মিথ্যা অপবাদ মাত্র। চেম্বারলেন্‌ বলেছেন যে যুদ্ধ এসে পড়লে, চেক-রাষ্ট্র সাহায্য পৌঁছবার আগেই বিধ্বস্ত হ'য়ে যেত, কিন্তু গত মহাসমরে বেল্‌জিয়ামের প্রথমে সে-অবস্থা হ'লেও পরিণামে তার পুনরুদ্ধার সহজেই সম্পন্ন হয়েছিল। চেক্‌দের রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ করতে হ'লে, ইংরাজ বা ফরাসী জনসাধারণের সমর্থন পাওয়া যেত না,

একথাও অসার। হিট্‌লারের আনুগত্যের সংকল্প ডেমক্রাটিক্ দেশ-গুলির জনগণের দিক থেকে আসে নি, নেতৃস্থানীয়েরাই এই নীতি অবলম্বন করেছেন এবং ধনিক-শ্রেণীই তাঁদের সমর্থক বলা যায়। যুদ্ধ সম্বন্ধে বিতৃষ্ণা ও বিভীষিকা স্বাভাবিক, সেই মনোভাবকেই ইংরাজ ও ফরাসী মন্ত্রীরা নিজ অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ব্যবহার করেছেন। এই উপলক্ষ্যে সংগ্রাম ঠেকিয়ে রাখার মঙ্গলময়তা সম্বন্ধে যত নীতিকথা শোনা গেছে, তা' শোভা পায় শুধু পরিপূর্ণ শান্তিবাদীদের মুখে—বলা বাহুল্য যে চেম্বার্‌লেন্ ও দালাদিয়ে একেবারেই সেজাতীয় লোক নন।

ইংরাজ ও ফরাসী রাষ্ট্রের সাম্প্রতিক আচরণের প্রকৃত ব্যাখ্যা বামপন্থী লেখকেরা কিছুদিন ধরে' করে' এসেছেন, মিউনিকের চুক্তি বস্তুতঃ সে-ব্যাখ্যার যাথার্থ্যই প্রমাণ করল। উভয়দেশে শাসকশ্রেণী প্রচ্ছন্ন-ফাশিস্ট্ হ'য়ে পড়ছে, সঙ্কটের সময় শুধু তাদের স্বরূপ প্রকাশিত হ'য়ে পড়ল। প্রতিপত্তি বজায় রাখার জন্য হিট্‌লার্‌কে বাধ্য হ'য়ে উগ্রনীতি অবলম্বন করতে হচ্ছে; তাঁকে সবলে বাধা দিলে যে-সংগ্রাম উপস্থিত হবে তাতে নাৎসিদের পরাজয় হ'লে জার্মানিতে শ্রমিক-বিপ্লব অনিবার্য্য; চেম্বার্‌লেন্ প্রমুখ ফাশিস্ট্-মিত্রদের আন্তরিক ভয় হ'ল বল্‌শেভিজ্‌ম্-এর প্রসারলাভের এই সম্ভাবনা; সুতরাং ফাশিস্ট্‌দের সঙ্গে সদ্ভাবের প্রয়োজন এদের দিক থেকে বাঞ্ছিত হ'য়ে পড়েছে। কিছুকাল ধরে' বারবার ফাশিস্ট্ অগ্রগতির সামনে পথ ছেড়ে দেবার আর কোন বৈধ ব্যাখ্যা খুঁজে পাওয়া কঠিন বলে'ই মনে হয়। তাই আবিসিনিয়ার বেলায় শেষ পর্য্যন্ত ইটালিকে শাস্তি দেওয়া চলেনি, স্পেনে গণতন্ত্রকে বিনষ্ট করবার আয়োজনে বাধা সম্ভব নয়, চীনকে আত্মরক্ষায় সাহায্য করার উপায় নেই, চেকোস্লোভাকিয়ার স্বাতন্ত্র্য-লোপকেও মেনে নিতে হবে। সোভিয়েট্-রাশিয়াকে একঘরে অবস্থায় অসহায় করে' ফেলার যে-চক্রান্ত কিছুদিন ধরে' চল্‌ছে, রাষ্ট্রনীতির ভাষায় তার নাম পশ্চিমের চার মহাশক্তির মৈত্রীবন্ধন।

মিউনিকের ব্যাপারে ইংল্যাণ্ডের জনমত ক্ষুব্ধ হওয়াতে চেম্বার্‌লেন্, হ্যালিফ্যাক্স্ প্রভৃতি মন্ত্রীরা বারবার আশ্বাস দিয়েছেন যে হিট্‌লার্

ও মুসোলীনির সঙ্গে বন্ধুভাবে কথাবার্ত্তার ফলে তাঁরা ইউরোপে শান্তি সুদৃঢ়ভাবে স্থাপিত করতে পারবেন। মিউনিক্-চুক্তির আগেই, ইটালির সঙ্গে স্পেন্ নিয়ে একটা বন্দোবস্ত হয়েছিল; সম্প্রতি ইংরাজ মন্ত্রীরা আবার রোমের দ্বারস্থ হয়েছেন। ফ্রান্সে-ও পপুলার্-ফ্রণ্টের পতনে ফাশিস্ট্দের সঙ্গে মৈত্রীর সম্ভাবনা বেড়েছে। কিন্তু গত কয়েকমাসের ঘটনাবলী থেকে মনে করা কঠিন যে মিউনিক্-চুক্তির পরবর্ত্তী যুগে ইউরোপের দুরবস্থা কাটবার উপস্থিত কোন উপক্রম দেখা গেছে।

সুদেৎ-প্রদেশ ও আরও কিছু ভূখণ্ড জার্মানির অধিকৃত হবার পর, চেকোস্লোভাকিয়ার কোন কোন অংশ পোল্যাণ্ড্ ও হাঙ্গারি দখল করল। বাকী রাজ্যটুকু এখন সম্পূর্ণ জার্মানির আশ্রিত হ'য়ে পড়েছে। সম্প্রতি হাঙ্গারি কমিন্টার্ণের বিরোধী সঙ্ঘে যোগ দিয়ে নাৎসি-নেতৃত্ব মেনে নিয়েছে। পোল্যাণ্ড্, রোমানিয়া ও যুগোস্লাভিয়া আত্মরক্ষার জন্য জার্মানিকে খুসী রাখতে চায়। হিট্লারের মূললক্ষ্য উক্রেন্-বিজয়, কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে ঠিক কোনদিকে প্রথম তাঁর চোখ পড়বে বলা যায় না। মেমেল্, ডান্সিগ্, দক্ষিণ-সিলেসিয়া, শ্লেস্উইগ্—এ সমস্তই জার্মানি দাবী করতে পারে। সুইট্জার্ল্যাণ্ড্, বেল্জিয়াম্, হল্যাণ্ড্ প্রভৃতি সকল ছোট দেশই আজ কিছু সন্ত্রস্ত। ওদিকে অস্ট্রিয়া ও চেকোস্লোভাকিয়ার বেলায় মুসোলীনি জার্মানিকে যেভাবে সমর্থন করেন, তার পুরস্কার হিসাবে ভূমধ্য-সাগরে ইটালির অভিযান হিট্লারের সাহায্য পাচ্ছে। স্পেনে তথাকথিত নিরপেক্ষ-নীতি প্রথম থেকে আন্তর্জ্জাতিক বিধান অবহেলা করে' ফাশিস্ট্-বিদ্রোহীদের সাফল্যের পথে এগিয়ে দিয়েছিল। ফ্রাঙ্কো আজ গণতান্ত্রিক দলের প্রায় শেষ আশ্রয় ক্যাটালোনিয়া-প্রদেশ জয়ে উদ্যত। ইটালির সাহায্য তিনি এখনও পাচ্ছেন, এবং নিরপেক্ষ মুসোলীনি প্রকাশ্যে বলেছেন যে ফ্রাঙ্কোর জয়লাভ ছাড়া স্পেনের সমস্যার অন্য কোন সমাধান তিনি হ'তে দেবেন না। মিউনিক্-চুক্তি শান্তির আবাহনরূপে অভিনন্দিত হয়েছিল। কিন্তু তারপর

ইটালি সুয়েজ্-খালের কর্তৃত্ব নিয়ে গোলযোগ করছে, আবিসিনিয়ার প্রত্যন্তস্থিত ফরাসী-বন্দর জিবুটির উপর তার চোখ পড়েছে, ফ্রান্সের কাছ থেকে টিউনিস্, কর্সিকা, ও নীস্ জেলা ফেরৎ পাবার ইটালীয় দাবীও শোনা গেছে। জার্মানি ও ইটালির পরম মিত্র জাপান অন্যদিকে চীনের অনেকখানি জয় করে' দুটি উদ্যমে ব্রতী হয়েছে—রেপাব্লিকের অখণ্ডতা ভেঙ্গে খণ্ডরাজ্যের সৃষ্টি, এবং চীন থেকে সাম্যবাদী প্রভাবের বহিষ্কৃতি।

মিউনিকে ফাশিস্ট্ অগ্রগতি বাধাপ্রাপ্ত হওয়ার স্তোক বাক্য তাই সর্ব্বৈব মিথ্যা। বরং এখন ইংল্যাণ্ড্ ও ফ্রান্সের মন্ত্রিসভা অর্দ্ধফাশিস্ট্ হ'য়ে পড়েছে বলা যায়। অশান্তির প্রকোপ বিস্তার লাভই করছে এবং নানাদেশের জনসাধারণ আজ তাই ফাশিস্ট্দের হাতে নির্য্যাতনলাভের পথে চলেছে। জনৈক য়িহুদি যুবক এক জার্মান্ কর্ম্মচারীকে হত্যা করাতে, নাৎসিরা জার্মান্ য়িহুদিদের উপর সম্প্রতি যেভাবে অত্যাচার করেছে, তার থেকে ফাশিস্ট্-শাসনের মাত্র একটা দিক বোঝা যায়। শ্রমিক-দমন ও আর্থিক সংস্কারের সকল প্রচেষ্টারোধই কিন্তু ফাশিস্ট্-আমলের প্রধান কথা। তাই প্রশ্ন ওঠে যে এভাবে দিন কতকাল কাটবে আর এর ভবিষ্যৎই বা কি?

ইতিহাসের গতি পর্য্যবেক্ষণ করলে মনে হয় না যে বামপন্থার এখন সম্পূর্ণ পরাজয় বা অবসান হবে। মানুষের পতন-অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থার মধ্যেও প্রায় সর্ব্বদা একটা ঝোঁক বা বিশেষ লক্ষ্যের দিকে স্বাভাবিক গতি ঐতিহাসিকের চোখে পড়ে। ফাশিস্ট্-অভিযান আজকের দিনে সে-গতির পথে বাধা হিসাবেই উত্থিত হচ্ছে মনে হওয়া অন্যায় নয়। তাই ইংল্যাণ্ড্ ও ফ্রান্সে জনমত মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে সংগঠিত হচ্ছে, আমেরিকাতেও প্রেসিডেণ্ট্ রুজ্ভেল্ট্ ফাশিস্ট্বিরোধী হ'য়ে পড়ছেন। আসলে সাম্রাজ্যতন্ত্রের আওতার মধ্যে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলির দ্বন্দ্ব অনিবার্য্য, ধনতন্ত্রের মধ্যেও বারবার বিরোধ ফুটে বের হ'তে বাধ্য। সুতরাং ফাশিস্ট্-নেতৃত্ব দীর্ঘস্থায়ী হবার সম্ভাবনা কম। পক্ষান্তরে আর্থিক বিরোধ যদি চিরন্তনী না হয়, তবে সোভিয়েট্-রাশিয়ার

সাফল্যের উপর মানবসমাজের ভবিষ্যৎ অনেকখানি নির্ভর করছে। ইতিহাসলেখক সে-ভবিষ্যতের সঠিক নির্দ্দেশ দিতে পারেন না, কিন্তু বর্ত্তমান যুগের অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্বের দিকে সকলের চোখ ফেরানো তাঁর কর্ত্তব্য।

জানুয়ারি, ১৯৩৯

পরিশিষ্ট (২)

এই বইখানিতে প্রচলিত ইংরাজি কথার বদলে যে-সব প্রতিশব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, পাঠকদের সুবিধার জন্য নীচে তার একটি তালিকা দেওয়া হ'ল।

অতিরিক্ত সম্পদ—surplus value

অদূর-প্রাচ্য—the Near East

অধিনায়ক—leader, dictator

অনুপাত—ratio

অনুপ্রবিষ্ট—inter-penetrated

অবরুদ্ধ—blockaded

অবরোধ—blockade

অবস্থান—situation

অবাধ-রাজতন্ত্র—autocratic monarchy

অবাধ-বাণিজ্য—free trade

অর্থদণ্ড—indemnity, Reparations

অর্দ্ধদাস—serf, servile

অস্ত্রসজ্জা—armament

আত্মকর্ত্তৃত্ব—self-determination

আদর্শবাদ—philosophic idealism

আন্তর্জ্জাতিক—international

আন্তর্জ্জাতিক-বাহিনী—International Force

আর্থিক—economic

আর্থিক-পরিষদ }
আর্থিক-সংসদ } —Economic Council

আর্থিক-সাম্রাজ্যতন্ত্র—economic imperialism

ইউটোপীয়—utopian

ইতিহাসের বাস্তব-ব্যাখ্যা—materialistic interpretation of history, Historic Materialism

উত্তর-সামরিক—post-war

উদার-গণতন্ত্র—liberal democracy

উদার-নীতি—liberalism

উদার মতবাদী—liberals

উল্লম্ফন—leap (in evolution)

উর্দ্ধতন পরিচালনা—High Command

এককর্ত্তৃত্ব—dictatorship, concentration (in industry)

একত্রিক চাষ—collective farming (in Russia)

একনায়কত্ব—dictatorial rule

একাধিপত্য—supremacy, dictatorship

ঐতিহ্য—tradition

কাঁচা মাল—raw materials

ক্ষতিপূরণ—Reparations

গণতন্ত্র—democracy

ঘোষণা-পত্রিকা—manifesto

চণ্ডনীতি—repressive policy

চরম-পন্থী—extremist (in politics)

চিরনিরপেক্ষ—neutralised

চুক্তি—pact, treaty

জড়বাদ—philosophic materialism

জড়বস্তু—matter

জড়দর্শন—philosophic materialism

জাতীয়তাবোধ—national consciousness

-বাহিনী—the Storm Troopers (in Germany)

দক্ষিণ-পন্থা }
দক্ষিণ-মার্গ } —politics of the Right

দমন-নীতি—policy of repression

ধনতন্ত্র }
ধনিকতন্ত্র } —capitalism, capitalist theory

নিরপেক্ষ—neutral

নিরপেক্ষতা—neutrality

নিরপেক্ষ-নীতি—policy of neutrality

নিরস্ত্রীকরণ—disarmament

নিয়মতন্ত্র—constitutional government

নীতি—policy

নৈরাজ্যবাদ—Anarchism

পঞ্চবার্ষিক সংকল্প—the Five Years' Plan (in Russia)

পরমমন—the Absolute Mind

পশ্চিম-পন্থী—the Westerners (in Russia)

প্রতিফলন—reflection

প্রতিবিপ্লব—counter-revolution

প্রতিলেখন—report

প্রাক্-সামরিক—pre-war

পুনরুজ্জীবন আন্দোলন—the Risorgimento (in Italy)

বস্তু, বস্তুবাদ—matter, philosophic materialism

বাম-পন্থা }
বাম-মার্গ } —politics of the Left

বাস্তব-পন্থী—realist, realistic

বিশ্বরাষ্ট্র—World-State

বিশ্বরাষ্ট্রসঙ্ঘ—the League of Nations

বুদ্ধিবাদী—intellectual, the intelligentsia

ব্যবস্থা-পরিষদ }
ব্যবস্থা-সভা } —legislative assembly

ভাববাদী—idealist

ভারসাম্য—balance of power, balance

মধ্য-পন্থা }
মধ্য-মার্গ } —politics of the Centre

মধ্য-প্রাচ্য—the Middle East

মধ্যযুগ—the Middle Ages

মধ্য-শ্রেণী—the middle class, the bourgeois

মহাশক্তি—Great Power

মিত্রশক্তিবর্গ—the Allied and Associated Powers

মূলধন—capital

যন্ত্রশিল্প—machine production

যান্ত্রিক—mechanistic (in philosophy)

যুক্তিবাদ—intellectualism, rationalism (the Enlightenment of the 18th century)

যুদ্ধক্ষান্তি }
যুদ্ধবিরতি } —the Armistice, truce

রাষ্ট্র—state

রাষ্ট্রকেন্দ্র—headquarters or capital of a state

রাষ্ট্রনেতা—leader of a state, the Führer (in Germany)

রাষ্ট্রপতি—the chief of the state, the President (in republics)

রাষ্ট্রশক্তি—the government of the state

রাষ্ট্রশাস্ত্র—political science

রাষ্ট্রসঙ্ঘ—League of Nations

রাষ্ট্রসঙ্ঘের চালকসমিতি—Council of the League

রাষ্ট্রসঙ্ঘের বিধানপত্র—Covenant of the League

রাষ্ট্রিক—political

লিপি পত্রিকা—charter

লোহিত-বাহিনী—the Red Army (in Russia)

লৌহশিরস্ত্রাণ-বাহিনী—the Steel Helmets (in Germany)

শক্তি—a Power, a State

শান্তিবাদী—pacifist

শান্তিসভা—peace conference

শাসন-পত্রিকা—constitution

শুভবাদী—optimist

শোষণ—exploitation

শ্রমিক—labour, the proletariat

শ্রেণী—class

শ্রেণীপ্রত্যয়—class-consciousness

শ্রেণীবর্জিত }
শ্রেণীবিহীন } —classless

শ্রেণীভেদ—class differences

শ্রেণীশূন্য—classless

শ্রেণীসঙ্ঘর্ষ—class-war

শ্রেণীসম্বন্ধ—class-relations

শ্রেণীস্বার্থ—class-interests

সনাতনী গ্রীক্—Orthodox Greek (Church

সন্ত্রাসবাদ—terrorism

সন্ধিসভা—peace conference

সমগ্রগ্রাসী—totalitarian

সমরসজ্জা—arming, armaments

সমরোত্তর—post-war

সমাজতন্ত্র—socialism, socialist theory

সর্বব্যাপী—totalitarian

সংখ্যালঘু—minority (community)

সংরক্ষণ—protection (in economics)

সংহত-রাষ্ট্র—federal union, federation

সাধারণতন্ত্র—republic

সাধারণ স্বত্ব—collective ownership

সাম্প্রতিক—recent

সামরিক সাম্যতন্ত্র—War Communism (in Russia)

সাম্যতন্ত্র—communism (in practice)

সাম্যবাদ—communism (in theory)

সাম্রাজ্যতন্ত্র—imperialism

সাম্রাজ্যবাদ—theory of imperialism

সার্বভৌম সাম্রাজ্যতন্ত্র—ultra imperialism

সুদূর-প্রাচ্য—the Far East

সৈন্যসমাবেশ / সৈন্যসংযোজন —general mobilisation

স্বতন্ত্র—independent (in politics)

স্বর্ণমান—the Gold Standard

স্বেচ্ছাসৈনিক—volunteers

পরিশিষ্ট (৩)

এই বই-এর কোন কোন অংশ ইতিপূর্বে চতুরঙ্গ এবং শ্রীহর্ষ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। মানচিত্রখানি আঁকতে শ্রীযুক্ত অশোক মিত্র আমাকে সাহায্য করেছেন। পুস্তকখানির পরিকল্পনা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষদের। গ্রন্থখানি বের করবার ভার নিয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের [illegible]-বই প্রকাশের বিভাগ।

NABADWIP SADHARAN GRANTHAGAR ★ (P.O. NABADWIP) NADIA ★
ESTD.
1907